সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

Marine Fisheries Resource Management

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স মডিউল-১

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল-১

তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন

ড. মঈন উদ্দিন আহমদ
অধীর চন্দ্র দাস
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
শওকত কবির চৌধুরী
মোঃ মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী
মোঃ ফারহান তাজিম
আল মামুন
মোহাম্মদ রাশেদ পারভেজ
রনি সাহা

উপদেষ্টা

খঃ মাহবুবুল হক
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক
সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ

বিপ্লব দাস
অধ্যাপক সাইদুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল আবছার খান
এস. এম. মহিব উল্যাহ
ড. মোহাম্মদ শরীফুল আজম
মনিষ কুমার মন্ডল
মোঃ আমিনুল ইসলাম
হারুন অর রশিদ
মোঃ মঈনুল ইসলাম
তাছলিমা আকতার

প্রকাশনায়

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০২৩

Marine Fisheries Resource Management Training Module
A Five Days TOT Course Manual for DoF Officials

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণ মডিউল এর মূল বিষয়বস্তু

মডিউল এর শিরোনাম	মূল বিষয়বস্তু
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: মডিউল-১	• মেরিটাইম জোন এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ • সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা • পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি • সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ ব্যবস্থাপনা
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: মডিউল-২	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় আইনগত কাঠামো: • জাতীয় আইনগত কাঠামো • আন্তর্জাতিক আইনগত দলিলাদি
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: মডিউল-৩	• ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা • সহ-ব্যবস্থাপনা • কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: মডিউল-৪	• সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ • পরিবেশগত বিপর্যয়, সামুদ্রিক দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন • সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তা (SOLAS) • সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা: মডিউল-১

প্রশিক্ষণ মেয়াদ: ৫ দিন

সময় / দিন	৯.০০-৯.৩০	৯.৩৫-১০.৩৫		১০.৫০-১১.৫০	১১.৫৫-১২.৫৫		১৪.০০-১৫.০০		১৫.১৫-১৬.১৫	১৯.০০-২০.০০
দিন - ১	নিবন্ধন, উদ্বোধন ও কোর্স পরিচিতি	প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং সুনীল অর্থনীতি	চা বিরতি	মেরিটাইম জোন ও মেরিন জিওগ্রাফি	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: জোন ভিত্তিক	মধ্যাহ্ন বিরতি	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: মৎস্য গ্রুপভিত্তিক	চা বিরতি	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: অপ্রচলিত	সান্ধ্য সেশন ও প্রতিভাব
দিন - ২	পূর্ব দিনের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও উপস্থাপনা	মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও মৎস্য নৌযান		মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি	এসডিজি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ		সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-১)		সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-২)	সান্ধ্য সেশন ও প্রতিভাব
দিন - ৩	পূর্ব দিনের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও উপস্থাপনা	এমসিএস: পদ্ধতি ও প্রয়োগ		বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমসিএস	এমসিএস বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম		আইইউইউ ফিশিং নিয়ন্ত্রণ		জেলে এবং মৎস্য নৌযান নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং	সান্ধ্য সেশন ও প্রতিভাব
দিন - ৪	পূর্ব দিনের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও উপস্থাপনা	সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট ও জয়েন্ট মনিটরিং		ক্যাচ ডকুমেন্টেশন ও উপাত্ত সংগ্রহ	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ: ফিশারি ইনডিপেন্ডেন্ট		সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ: ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট		জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস	সান্ধ্য সেশন ও প্রতিভাব
দিন - ৫	পূর্ব দিনের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও উপস্থাপনা	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ		জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: বয়স নিরূপণ	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ		উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা		কোর্স পুনরালোচনা ও প্রতিভাব; প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী	

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	কোর্স পরিচিতি	৩
২.	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং সুনীল অর্থনীতি	১৬
৩.	মেরিটাইম জোন ও মেরিন জিওগ্রাফি	২০
৪.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: জোনভিত্তিক	২৬
৫.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: মৎস্য গ্রুপভিত্তিক	৩১
৬.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: অপ্রচলিত	৪২
৭.	মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও মৎস্য নৌযান	৫৩
৮.	মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি	৬৩
৯.	এসডিজি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	৭১
১০.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-১)	৮০
১১.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-২)	৯২
১২.	এমসিএস: পদ্ধতি ও প্রয়োগ	১০২
১৩.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমসিএস	১০৭
১৪.	এমসিএস বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম	১১৭
১৫.	আইইউইউ ফিশিং নিয়ন্ত্রণ	১২২
১৬.	জেলে এবং মৎস্য নৌযান নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং	১২৮
১৭.	সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট ও জয়েন্ট মনিটরিং	১৩৮
১৮.	ক্যাচ ডকুমেন্টেশন ও উপাত্ত সংগ্রহ	১৪০
১৯.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ: ভেসেল বেজড সার্ভে	১৪৫
২০.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ: ল্যান্ড বেজড সার্ভে	১৫০
২১.	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস	১৫৪
২২.	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ	১৬২
২৩.	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: বয়স নিরূপণ	১৬৯
২৪.	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ	১৭৫
২৫.	উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৭৯

প্রথম দিন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন: ১.১	সময়: ০৯.০০-০৯.৩০	মেয়াদকাল: ৩০ মিনিট

শিরোনাম: **নিবন্ধন, কোর্স পরিচিতি এবং কোর্স উদ্বোধন**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কোর্সে নিবন্ধন করা হবে, তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা গ্রহণ করা হবে, কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কোর্স পরিচিতি প্রদান করা হবে এবং কোর্স উদ্বোধন করা হবে যাতে তাঁরা এই কোর্সে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করাতে পারেন, নিজেদের মধ্যে পরিচিত হতে পারেন, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা জানাতে পারেন এবং কোর্স সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম, পদবী, ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারবেন।
- নিজেদের মধ্যে পরিচিত হতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা জানাতে পারবেন।
- কোর্সের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী গ্রহণ করতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**২ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • পরিচয়পর্ব	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**২৫ মিনিট**
	• সুনির্দিষ্ট ফরমে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন • প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ • অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা লিপিবদ্ধকরণ ও উপস্থাপনা • প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা • কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান • প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরি ও উপস্থাপন • গ্রাফিটি বোর্ড এবং মুড মিটার তৈরি ও উপস্থাপন • অতিথিবৃন্দের বক্তব্য প্রদান এবং কোর্সের শুভ উদ্বোধন	বক্তৃতা, একক কাজ, ছোট দলীয় কাজ ও প্রশ্নোত্তর	
সারসংক্ষেপ			**৩ মিনিট**
	• সকল প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ • প্রশিক্ষণার্থীরা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছেন কিনা তা যাচাইকরণ • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: নিবন্ধন ফর্ম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, কোর্সের সময়সূচি, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি।			

কোর্স পরিচিতি

প্রশিক্ষণ কোর্সের শিরোনাম: সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা: মডিউল-১

কোর্সের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এবং এর ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্লু ইকনোমিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অবদান অনুধাবন করতে পারবেন;
- মেরিটাইম জোন এবং বাংলাদেশের ফিশিং গ্রাউন্ড সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী, নৌযান এবং মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও ক্ষতিকারক সরঞ্জামাদি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- এস.ডি.জি অর্জনে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ যেমন জেলে এবং মৎস্য নৌযান নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং, ইফোর্ট কন্ট্রোল, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (এমপিএ/এমআর) ব্যবস্থাপনা, ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (এমসিএস) পদ্ধতি, এর গুরুত্ব এবং এমসিএস বাস্তবায়নে আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আইইউইউ ফিশিং এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং আইইউইউ ফিশিং নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট ও জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টারের গুরুত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ কার্যক্রম এবং ক্যাচ ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ট্যাক্সোনমিক স্টাডি, গোনাডাল স্টাডি ও বয়স নিরূপণ কার্যক্রমের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় দুর্যোগকালীন করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক চেকলিস্ট

নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে প্রদর্শনের পর টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১.	প্রশিক্ষণ নোট ব্যবহার	
২.	উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদ	
৩.	ভালভাবে অভীষ্ট দলকে বুঝতে পারা	
৪.	উপযোগী প্রশিক্ষণ স্থান নির্বাচন	
৫.	প্রশিক্ষণার্থীদের কল্যাণে কিছু করা	
৬.	বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা	
৭.	ভাল ভূমিকার অবতারণা করা	
৮.	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন	
৯.	প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ	
১০.	অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	
১১.	ধৈর্যশীল আচরণ	
১২.	অধিক কর্মশক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহী	
১৩.	খোলামেলা মনের	
১৪.	বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা	
১৫.	প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা	
১৬.	সময় নিয়ন্ত্রণ	
১৭.	পরিষ্কার কণ্ঠস্বরের ব্যবহার	
১৮.	সঠিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার	
১৯.	প্রশ্ন-উত্তর কৌশল ব্যবহার	
২০.	প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	
২১.	দলীয় সদস্য ব্যবস্থাপনা	
২২.	প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যবস্থাপনা	
২৩.	বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার	
২৪.	সঠিকভাবে দর্শনীয় সহায়ক সামগ্রী প্রদর্শন	
২৫.	আস্থাশীল হওয়া	
২৬.	আদর্শ ব্যবহারিক অধিবেশন প্রদর্শন	
২৭.	প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক কাজে অনুশীলন করানো	
২৮.	প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক কাজ পর্যবেক্ষণ	
২৯.	উদ্দেশ্য নিরীক্ষা	
৩০.	হ্যান্ডআউট বিতরণ	
৩১.	মূল বিষয়ের সার-সংক্ষেপকরণ	
৩২.	পরবর্তী অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন	
৩৩.	আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো	
৩৪.	প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কারকরণ	

একক অনুশীলনী

গ্রাফিটি বোর্ড (Graffitti Board)

একক কাজ

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো কোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রমের এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন ও প্রতিভাবের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে প্রশিক্ষক স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে সফলভাবে কোর্স পরিচালনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় মতামু পেতে পারেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

১. কোর্সের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা Graffitti Board-এ লিপিবদ্ধ করুন। প্রশিক্ষক এবং কোর্স সমন্বয়কারী প্রতিদিন গ্রাফিটি বোর্ড দেখবেন এবং উল্লিখিত মতামতের প্রতিভাব দেবেন।

মুড মিটার

প্রতিদিনের অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের মনোভাব অর্থাৎ তাঁরা প্রতিদিনের অধিবেশনসহ সামগ্রিকভাবে তাঁদের সন্তুষ্টির বিষয়টি ‘মুড মিটারের’ মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। সহায়তাদানকারী আর্ট পেপার শীটে ছবির মাধ্যমে তিন ধরনের সন্তুষ্টির বিষয় উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রত্যেকে প্রতিদিন অধিবেশন শেষে সঠিক কলামে টিক (√) চিহ্নের মাধ্যমে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করবেন।

দিন	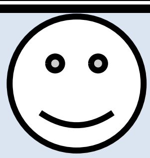	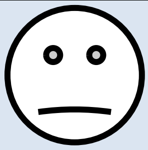	
১ম			
২য়			
৩য়			
৪র্থ			
৫ম			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন: ১.২	সময়: ০৯.৩৫-১০.৩৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন, প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং সুনীল অর্থনীতি**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: কোর্সের বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাথমিক ধারণা যাচাই করা হবে, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা হবে এবং সুনীল অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যাতে তাঁরা এই কোর্সের বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা লিপিবদ্ধ করতে পারেন, প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সুনীল অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- সুনীল অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন • প্রকল্প পরিচিতি • সুনীল অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অবদান	একক কাজ বক্তৃতা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ও প্রশ্নোত্তর	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• সকল প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ • সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয় পুনরালোচনা • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: প্রাক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র, প্রকল্প ব্রিফ, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা: প্রশিক্ষণ মডিউল-১

প্রাক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

সকল প্রশ্নের মান সমান। সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ২০ মিনিট

নাম: ....পদবী: ....

কর্মস্থল: ....

১) ব্লু ইকোনমি বলতে কি বুঝায়?

ক) মৎস্যভিত্তিক অর্থনীতি খ) কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গ) নীল অর্থনীতি ঘ) সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতি

২) মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত একটিভ গিয়ার নয় কোনটি?

ক) শ্রিম্প ট্রলিং খ) পার্স সেইনিং গ) লং লাইনার ঘ) বটম ট্রলিং

৩) ট্রান্সবাউন্ডারি প্রকৃতির মাছ কোনটি?

ক) পোয়া খ) রূপচাঁদা গ) টুনা ঘ) হাউস মাছ

৪) বাংলাদেশের সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous zone) বেইজলাইন থেকে কত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত?

ক) ১২ ন. মাইল খ) ২৪ ন. মাইল গ) ১৮ ন. মাইল ঘ) ২০ ন. মাইল

৫) নিচের কোন উপাদানের কারণে পটকা মাছ খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ?

ক) মাইকোটক্সিন খ) সায়ানোটক্সিন গ) টেট্রোডোটক্সিন ঘ) সিগোয়াটক্সিন

৬) গভীর সমুদ্রে টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ আহরণে কি ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়?

ক) Long line খ) Purse seine গ) Pole and line ঘ) উপরের সবগুলো

৭) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG তে কয়টি Goal এর উল্লেখ রয়েছে?

ক) ১৫ টি খ) ১৭ টি গ) ১৬৯ টি ঘ) ১২ টি

৮) নিচের কোনটি সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার কৌশল নয়?

ক) ইফোর্ট কন্ট্রোল খ) এমপিএ গ) এমসিএস ঘ) আইইউইউ ফিশিং

৯) নিচের কোনটি সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা (marine spatial planning) এর বিবেচ্য বিষয় নয়-

ক) সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্থানিক সুষম বন্টন

খ) এমএসপি তে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নাই

গ) ইকোসিস্টেম এবং অঞ্চল ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা

ঘ) এমএসপি এর একাধিক উদ্দেশ্য থাকে

১০) পরিবীক্ষণ (Monitoring) বলতে বুঝায়?

(ক) তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ এবং তথ্য বিশ্লেষণ

(খ) সাগরে অবজার্ভার হিসেবে গমন

(গ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন প্রয়োগ

(ঘ) কোনটিই নয়

১১) MCS বাস্তবায়নে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি কোনটি?

ক) Vessel Monitoring System (VMS)

খ) Automatic Identification System (AIS)

গ) Global Positioning System (GPS)

ঘ) সব কয়টি

১২) কোনটি MCS কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্তরায়?

ক) নৌযানের রেজিস্ট্রেশন এবং ফিশিং লাইসেন্স না থাকা

খ) সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন

গ) নৌযানে আধুনিক সরঞ্জামাদি সংযুক্তকরণ

ঘ) সব কয়টি

১৩) কোনটি বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক সংগঠিত নন-কমপ্লায়েন্স?

ক) ৪০ মি. এর কম গভীরতায় মৎস্য/চিংড়ি আহরণ

খ) মৎস্য আহরণে ট্রল জালের কড এন্ডের মেস সাইজ ৬০ মি.মি. এর কম হওয়া

গ) জাটকা আহরণ করা

ঘ) সব কয়টি

১৪) IUU এর পূর্ণরূপ লিখুন?

....

১৫) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় কোনটি?

ক) নৌ বাণিজ্য দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন

খ) মৎস্য অধিদপ্তরের ফিশিং লাইসেন্স

গ) জীবন রক্ষাকারী সামগ্রীসমূহের উপস্থিতি

ঘ) সব কয়টি

১৬) সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন (COI) প্রদান করে কোন দপ্তর?

ক) সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর খ) নৌ বাণিজ্য দপ্তর

গ) বন্দর কর্তৃপক্ষ ঘ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ

১৭) JMC এর পূর্ণ রূপ কি ?

ক) Joint Meeting Center খ) Joint Monitoring Committee

গ) Joint Monitoring Center ঘ) Joint Monitoring Cell

১৮) মাছের ল্যান্ড-বেজ্‌ড বা অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ বলতে বুঝায়-

ক) অবতরণকেন্দ্রের অবস্থান ও সংখ্যা জানা খ) অবতরণকৃত মাছের পরিমাণ জানা

গ) অবতরণকৃত মাছের প্রজাতি ও আকারভিত্তিক পরিমাণ জানা ঘ) সবগুলো

১৯) বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র সক্রিয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজের নাম কি?

ক) আরভি অনুসন্ধানী খ) এফভি মীন সন্ধানী

গ) আরভি মাছরাঙা ঘ) আরভি মীন সন্ধানী

২০) বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় ল্যান্ড বেইজড সার্ভে বলতে কী বোঝায়?

ক) ভূমিভিত্তিক জরিপ খ) এলাকাভিত্তিক জরিপ

গ) মৎস্য অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক জরিপ ঘ) বাজারভিত্তিক জরিপ

২১) জেনেটিক্যাল বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় ?

ক) ৭০% ইথানল খ) ১০% ফরমালিন গ) ৯৫% ইথানল ঘ) ৫০% ইথানল

২২) অটোলিথ কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

ক) লিঙ্গ নির্ধারণে খ) পুষ্টিকর খাবার হিসেবে গ) বয়স নিরূপণে ঘ) কোন কাজে লাগে না

২৩) ওসাইট ডেভেলপমেন্টের ধাপ কয়টি?

ক) ৬টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৮ টি

২৪) আবহাওয়া পূর্বাভাস শোনার টোল ফ্রি নম্বর কত?

ক) ০০০৯ খ) ১০৯০ গ) ১০৩০ ঘ) ৯৯৯

২৫) সমুদ্রবন্দরের জন্য আবহাওয়া সতর্ক সংকেত নয় কোনটি ?

ক) দূরবর্তী/স্থানীয় সতর্ক সংকেত খ) দূরবর্তী/স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত

গ) ঘূর্ণিঝড়ের হুঁশিয়ারি সংকেত ঘ) মহাবিপদ সংকেত

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন পরিকল্পনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নিম্নের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন পরিকল্পনার ছকটি নমুনা মাত্র। প্রশিক্ষক বা সহায়ক নীচের ছকে দেয়া মুল বিষয়ের আলোকে নিজের মত করে পরিপূর্ণ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনাটি তৈরি করে নেবেন।

পৃষ্ঠা-১ **এসসিএমএফ প্রকল্প পরিচিতি**	পৃষ্ঠা-২ **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**
পৃষ্ঠা-৩ **প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ও কার্যক্রম**	পৃষ্ঠা-৪ **প্রকল্প এলাকা**
পৃষ্ঠা-৫ **প্রকল্পের অভীষ্ট জনগোষ্ঠী**	পৃষ্ঠা-৬ **প্রকল্পের সেবা ও সীমাবদ্ধতা**

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট পরিচিতি

সাধারণ তথ্য:

১। প্রকল্পের নাম	:	সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট
২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মৎস্য অধিদপ্তর
৪। প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত
৫। প্রকল্প ব্যয়:	:	মোট- ১৬৫১.৭৯ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১৫০০.১৯ কোটি ও জিওবি- ১৫১.৬০ কোটি টাকা)
৬। প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	বিশ্বব্যাংকের আইডিএ সহায়তা
৭। প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৭৫টি উপজেলা (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ভোলা)

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা

নিম্নোক্ত বিষয়ের আলোকে প্রকল্প এলাকাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে:

- উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উচ্চ সম্ভাবনা;
- বিদ্যমান জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উৎপাদনের নিবিড়তা এবং বৈচিত্র্য আনার ব্যাপক সুযোগ;
- নিবিড় চাষ পদ্ধতি চালু করে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির উচ্চ সম্ভাবনা;
- প্রান্তিক জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ;
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টির ঘাটতি কমানো এবং জীবনমান উন্নয়নে তাদের ব্যাপক আগ্রহ;
- অনুন্নত ও অর্পযাপ্ত সুযোগ সুবিধা সংবলিত এলাকা; এবং
- ইকোলজিক্যাল সমস্যাগ্রস্ত ও জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি প্রয়োগের সুযোগ।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক. সামুদ্রিক একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEZ) মৎস্য জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে চিংড়ি, তলদেশীয় এবং ভাসমান প্রজাতি মৎস্যের মজুদ নিরূপণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;

খ. সুনীল অর্থনীতি জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধিপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই মৎস্য মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;

গ. বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (এমসিএস) পদ্ধতির বাস্তবায়ন;

ঘ. উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য আহরণ ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নকরত আহরিত ও উৎপাদিত মৎস্যের ভ্যালু চেইন উৎকর্ষ ও গুণগতমান উন্নয়ন ও অপচয় হ্রাস করা;

ঙ. উপকূলীয় জেলাসমূহে ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চিংড়ির উৎপাদনশীলতা ও চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধি করা;

চ. মৎস্য মজুদ পুনরুদ্ধার এবং উপকূলীয় মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী কর্তৃক চালিত (Community Driven Development) তাঁদের নেতৃত্বে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ-এর টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা করা; এবং

ছ. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর টেকসই আহরণ ব্যবস্থাপনায় 'জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা।

৯. প্রকল্পের কার্যক্রম (৪টি কম্পোনেন্ট)

কম্পোনেন্ট-০১: মৎস্যখাতে টেকসই বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বঙ্গোপসাগরে নিয়মিত বিজ্ঞানভিত্তিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ
- নিরূপিত মজুদের ভিত্তিতে ন্যাশনাল ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন
- মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য মজুদ নিরুপণ ও জরিপ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ
- ৫টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট নির্মাণ
- ৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স পন্টুন স্থাপন
- বেইজ লাইন সার্ভে করে মৎস্য আহরণে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং পদ্ধতি চালু করা
- বাণিজ্যিক ট্রলারে (৫টি) ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করে মনিটরিংকে জোরদার করণ পাইলটিং
- যান্ত্রিক নৌকায় (১৫০০টি) AIS (Automatic Identification System) সংযোগ করে মনিটরিং জোরদার করা
- ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট মনিটরিং পদ্ধতির উন্নয়ন ও সফটওয়্যার তৈরি
- সমুদ্রে নিয়মিত Monitoring Control & Surveillance (MCS) কার্যক্রম জোরদারকরণ পাইলটিং করা
- মৎস্য সেক্টরের বিদ্যমান আইনি কাঠামো যুগোপযোগীকরণ
- ভ্যালু চেইন ম্যাপিং ও এতদসংক্রান্ত ব্যবসার সুযোগ চিহ্নিতকরণ
- অনবোর্ড অবজারভার মোবিলাইজেশন
- মৎস্য অধিদপ্তরকে ডিজিটালাইজেশন করার মাধ্যমে অন-লাইন সেবা প্রদান
- নিয়মিত মৎস্য ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রকাশ
- মৎস্য নৌযান ও আহরণ-সরঞ্জাম ড্যাটাবেজ হালনাগাদকরণ
- মৎস্যখাতে Grievance Redress মেকানিজম চালু করে দ্বন্দ্ব নিরসন

- কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- জনসচেনতা বৃদ্ধিকরণ (ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সভা ও র‍্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ায় প্রচার)।

কম্পোনেন্ট -০২: অবকাঠামোগত ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন (মৎস্য অধিদপ্তর পার্ট)

-১০টি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার/ফিশ হারবার নির্মাণ/সংস্কার, ফিশ মার্কেট পুনবার্সন ও আধুনিকায়ন, হার্ভেস্ট লস কমানো

-৩টি ফিশ কোয়ারেন্টাইন ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ

-৩টি ফিশ ডায়াগনোস্টিক ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ

-৩টি পিসিআর ল্যাব নবায়ন/আধুনিকায়ন

-১টি Quarantine রেফারেন্স ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ

-১২৯টি উপকূলীয় খাল (৫০০ হেক্টর) পুনবার্সন/খনন

-সিবাস/মুলেট চাষ প্রদর্শনী সেন্টার উন্নয়ন

-স্যালানাইজেশন ম্যাপিং; হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে এবং খাল পুনর্বাসন;

-একশন রিসার্চ, মেরিকালচার ও ভ্যালুচেইন উন্নয়নে কন্ডিশনাল ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান;

-চিংড়ি উৎপাদনে ক্লাস্টার ব্যবস্থা (৩০০টি, ৭৫০০ জন প্রান্তিক চাষি) উন্নয়ন, গ্রান্ট, ই-ট্রেসিবিলিটি পদ্ধতি উন্নয়ন।

-মেরিন স্প্যাশাল প্ল্যান প্রণয়ন।

কম্পোনেন্ট -০৩: মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও জীবিকায়নে বিকল্প পেশায় রূপান্তর

-উপকূলীয় ৪৫০টি মৎস্যগ্রামে কমিনিউনিটি সেভিংস গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা

-১০০টি মডেল জেলে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মধ্য থেকে ৬০% সুবিধাভোগীকে অর্থ সহায়তা প্রদান

-১০০টি মডেল জেলে গ্রামে ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা

-মডেল গ্রামের ১৮,০০০ যুবক-যুব মহিলাকে ভকেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

-১০০টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি এবং নিবন্ধন করা

-৯০টি ইউথ ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রাম ও ৬টি জব ফেয়ার আয়োজন করা

-৪৫টি উপজেলা জেলে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করা

এসব কার্যক্রমে সর্বমোট ৫৪,০০০ জন জেলে সরাসরি সুবিধা পাবে।

কম্পোনেন্ট-০৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১ জন প্রকল্প পরিচালক, ৬ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক (৩ জন সদর দপ্তরে, ০৩ জন আঞ্চলিক অফিসে), ৭ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক (৪ জন সদর দপ্তরে, ০৩ জন আঞ্চলিক অফিসে), ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সহকারী প্রকৌশলী ও ৭৮ জন মেরিন ফিশারিজ কর্মকর্তাসহ ২৪১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত হবেন।
- প্রকল্প কার্যক্রম দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য দেশি-বিদেশি পরামর্শক সমন্বয়ে ১টি Project Management Consultant (PMC) ফার্ম নিয়োগ করা হবে ।
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি, একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পটি নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও মনিটর করবে।
- এ প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য মৎস্য সেক্টরে বিশেষজ্ঞ, একাডেমিয়া, সরকারি কর্মকর্তাসহ এনজিও প্রতিনিধির সাথে প্রতি ৬ মাস অন্তর বৈঠক করার জন্য একটি নলেজ প্লাটফরম (Citizen Engagement Platform)-এর সংস্থান রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে একটি জয়েন্ট মনিটরিং সেল (JMC) গঠন করে সমন্বয় কার্যকর করার প্রস্তাব রয়েছে।

প্রকল্পটি ঢাকাস্থ মৎস্য ভবন থেকে বাস্তবায়ন করা হবে; উপকূলীয় এলাকায় ৩টি আঞ্চলিক অফিস, ১৬ জেলা অফিস ও ৭৫টি উপজেলা অফিস এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) বা সমুদ্রসম্পদ নির্ভর অর্থনীতি বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি বহুল আলোচিত বিষয় যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপ্লবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১১৮৮১৩ বর্গকিলোমিটার। উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবী পরিবারের কমপক্ষে ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা এই বিশাল সামুদ্রিক জলরাশি এবং এর মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় আহরণযোগ্য ও নবায়নযোগ্য বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের সমুদ্রসীমা থেকে বাৎসরিক মোট আহরিত মাছের পরিমাণ ৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন (২০১৭-১৮ অর্থ বৎসর) যা মোট মৎস্য উৎপাদনের (৪২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন) প্রায় ১৫.৩১ শতাংশ। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষে প্রয়োজনীয় চিংড়ির পিএল উৎপাদনে প্রায় শতভাগ মা চিংড়ি সামুদ্রিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনায় এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিল্প উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কেবল মৎস্যসম্পদই নয়, ব্লু ইকোনমিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড যেমন মেরিন টুরিজম, সমুদ্র তলদেশ হতে তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য খনিজসম্পদ আহরণ, বন্দরভিত্তিক অর্থনীতি, পরিবহণ খাতভিত্তিক অর্থনীতি, বায়ু ও স্রোতভিত্তিক নবায়নযোগ্য শক্তি, সমুদ্রভিত্তিক গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি। এই অধিবেশনে আমরা সুনীল অর্থনীতিতে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করবো।

সুনীল অর্থনীতি এবং এসডিজি অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রয়েছে জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল সমাহার। দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন বিভিন্ন প্রজাতির একুরিয়াম মৎস্যসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক চারণ ক্ষেত্র, যা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের নিকট মনোরম বিনোদন কেন্দ্র। অন্যান্য দ্বীপসমূহসহ সুন্দরবন এবং এর পারিপার্শ্বিক লবণাক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত (ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম) অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং জীববৈচিত্র্য বঙ্গোপসাগরকে করেছে বিশ্বের নজরকাড়া মৎস্য ভান্ডার।

বাংলাদেশ সামুদ্রিক জলরাশিতে বিরাজমান জীবকূল এবং এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে সর্বোত্তম লাগসই পদ্ধতিতে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণে বহুদূর এগিয়ে যেতে পারে। বর্তমান সরকার সুনীল অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে ব্লু ইকোনমি সেল। সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট ২১টি মন্ত্রণালয়ে ব্লু ইকনোমি সেল গঠন করেছে যা জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়।

সমুদ্রসম্পদ নির্ভর অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে এবং এসডিজি গোল ১৪ (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর যথাক্রমে লিড মিনিস্ট্রি ও অধিদপ্তরের দায়িত্ব পালন করছে। এ লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- মৎস্য অধিদপ্তর সমুদ্রের সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের নিমিত্ত কাজ করে যাচ্ছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.২**)।

- ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতিআহরণ, অবৈধ, অপ্রকাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাছের মজুদ পুনরুদ্ধার এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে কাজ করছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৪**)।
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে আরভি মীন সন্ধানী নামক জরিপ জাহাজ সংগ্রহ করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় প্রায় ৮১০১.১৭ বর্গ কিলোমিটার (লক্ষ্যমাত্রা: প্রায় ১২০০০ বর্গ কিলোমিটার, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার ন্যূনুম ১০ শতাংশ) মোট ৫টি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়েছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৫**)।
- মাছ ধরার ট্রলারগুলোর অতিসক্ষমতা বা ধারণক্ষমতা অর্জনে ও অতিআহরণ সহায়ক সকল প্রকার ভর্তুকি নিষিদ্ধ করাসহ অবৈধ, অপ্রকাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৬**)।
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার (টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ) নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৭**)।
- সামুদ্রিক স্বাস্থ্যের (ocean health) উন্নতিকল্পে জীববৈচিত্র্যের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি, গবেষণা সক্ষমতা বিকাশ ও সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.ক**)।
- সনাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য আহরণকারী জেলেদের (Artisanal fisher) সামুদ্রিক সম্পদের ওপর অধিকার সুরক্ষা (right on marine resources) ও বাজারে প্রবেশাধিকার (market access) সুবিধাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.খ**)।
- সমুদ্র আইন বিষয়ে জাতিসংঘ কনভেনশনে (UNCLOS) অনুস্বাক্ষর এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে (**লক্ষ্যমাত্রা ১৪.গ**)।

বাংলাদেশের মৎস্যখাতে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ

মৎস্যখাতের মাধ্যমে সূনীল অর্থনীতি সম্প্রসারণে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে যা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলো:

- নিয়মিত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে মাছের মজুদ পুনরুদ্ধার এবং সর্বোচ্চ টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত হবে।
- মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধ, অপ্রকাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং সকল বাণিজ্যিক ট্রলারকে পর্যায়ক্রমে IUU কমপ্লায়েন্সের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাদামাছ রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হবে।
- মাছের ল্যান্ডিং এবং বাজার ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আহরণোত্তর পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত করা হলে এ খাতে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য বৃদ্ধি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- বায়োটেকনোজি এবং ফার্মাকোলজিক্যাল জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ি ও কাঁকড়ার খোলস হতে কাইটিন, কিটোসান, কিটোবায়োস এবং এন-এসিটাইল গ্লুকোসামাইন তৈরি, ঔষধশিল্পে ব্যবহার ও রপ্তানি করা সম্ভব হবে।
- ম্যাক্রো অ্যালজি বিশেষ করে ব্রাউন অ্যালজি হতে ফাংশনাল ফুড, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং ড্রাগ ডিসকভারির মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব হবে।
- ম্যাক্রো অ্যালজি হতে আগার, ক্যারাগিনান, এলজিনেট উৎপাদন ও রপ্তানি করা সম্ভব।
- মাছের চামড়া, হাড় এবং আঁইশ হতে কোলাজেন ও জিলাটিন তৈরি ও রপ্তানি করা সম্ভব।
- এছাড়া, মাছ হতে রেটিনল, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন হাইড্রোলাইজেট, এনজাইমসহ নানাবিধ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য তৈরি ও রপ্তানি করা সম্ভব যা দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তি দিতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক বিশেষ করে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ক্রমাগতভাবে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা যথা: অতিআহরণজনি কারণে সম্পদের ক্রমহ্রাসমানতা, ভূমি ও সমুদ্র হতে সৃষ্ট দূষণ, সর্বোপরি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মৎস্যকূলের প্রাচুর্য, বিস্তৃতি ও প্রজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজেই, সমুদ্রসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা, কার্বন নিঃসরণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামুদ্রিক জীবকূলের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন: ১.৩	সময়: ১০.৫০-১১.৫০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **মেরিটাইম জোন ও মেরিন জিওগ্রাফি**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের UNCLOS অনুযায়ী এবং বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলকে উদাহরণ হিসেবে প্রয়োগ করে বিভিন্ন মেরিটাইটম জোন এবং এসকল জোনের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন মেরিটাইম জোন সম্পর্কে জানতে পারে এবং মেরিটাইম জোনের টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনায় অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- UNCLOS অনুযায়ী সাগরের বিভিন্ন মেরিটাইম জোন এবং সেখানে রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে বলতে পারবে।
- UNCLOS অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন মেরিটাইম অঞ্চলের সীমারেখা এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে।
- বাংলাদেশের মেরিটাইম অঞ্চলের ভেতরে কোন অঞ্চলে সম্পদ আহরণের কতটুকু অধিকার রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে সে সম্পর্কে বলতে পারবে।

	আলোচ্য বিষয়	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• মেরিটাইম জোন ও বাংলাদেশের সমুদ্রঅঞ্চল • উপকূলীয় রেখা/বেইজলাইন/তটরেখা (Baseline) • রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Territorial Sea) • সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous zone) • একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) • মহীসোপান (Continental shelf) • গভীর সমুদ্র (High seas)	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হ্যান্ডআউট, আলোকচিত্র, মানচিত্র, পোস্টার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

মেরিটাইম জোন ও মেরিন জিওগ্রাফি

১. ভূমিকা

সারাবিশ্বে সুনীল অর্থনীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। একবিংশ শতাব্দীর ক্ষুধা, দারিদ্র্য নিরসনে এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণে সুনীল অর্থনীতিকেই অনেকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটির মু তখন পৃথিবীর সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের চাহিদা পুরু খুবই কষ্টসাধ্য ব্যপার হবে। তাই ধারণা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে মানুষের খাদ্যের একটি বড় অংশ আসবে সমুদ্র থেকে। তাই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী দেশসমুহের মধ্যে সমুদ্র অঞ্চল নিয়ে হচ্ছে বিরোধ এবং এর নিস্পন্নের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার এবং আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হচ্ছে। বিশ্বে সমুদ্রের এই বিশাল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ও সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন অপরাধ দমনে এবং সমুদ্র তীরবর্তী দেশসমুহের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন প্রণীত হয় যা United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) হিসেবে পরিচিত। UNCLOS অনুযায়ী কোন দেশের সমুদ্র অঞ্চল তার সার্বভৌম্ন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং এর সম্পদ আহরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন মেরিটাইম জোনে বিভক্ত। সুষ্ঠু এবং টেকসইভাবে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এসব মেরিটাইম জোন বিষয়ে আমাদের পরিস্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে মেরিটাইম জোন এবং মেরিন জিওগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

২. মেরিটাইম জোন ও বাংলাদেশের সমুদ্রঅঞ্চল

২০১২ সালে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের (PCA-Permanent Court of Arbitration) রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ-মিয়ানমার এর মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তি এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অর্জন করে এক বিশাল সমুদ্র এলাকা। বাংলাদেশের বর্তমানে মোট সমুদ্র অঞ্চলের পরিমাণ ১১৮৮১৩ বর্গকি.মি.। এই বিশাল জলরাশি এবং এর অভ্যন্তরের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরাও সুনীল অর্থনীতির সুফল ভোগ করতে পারি। এছাড়াও এর মাধ্যমে আমাদের গভীর সমুদ্রের সম্পদ আহরণের পথ উন্মোচিত হয়েছে।

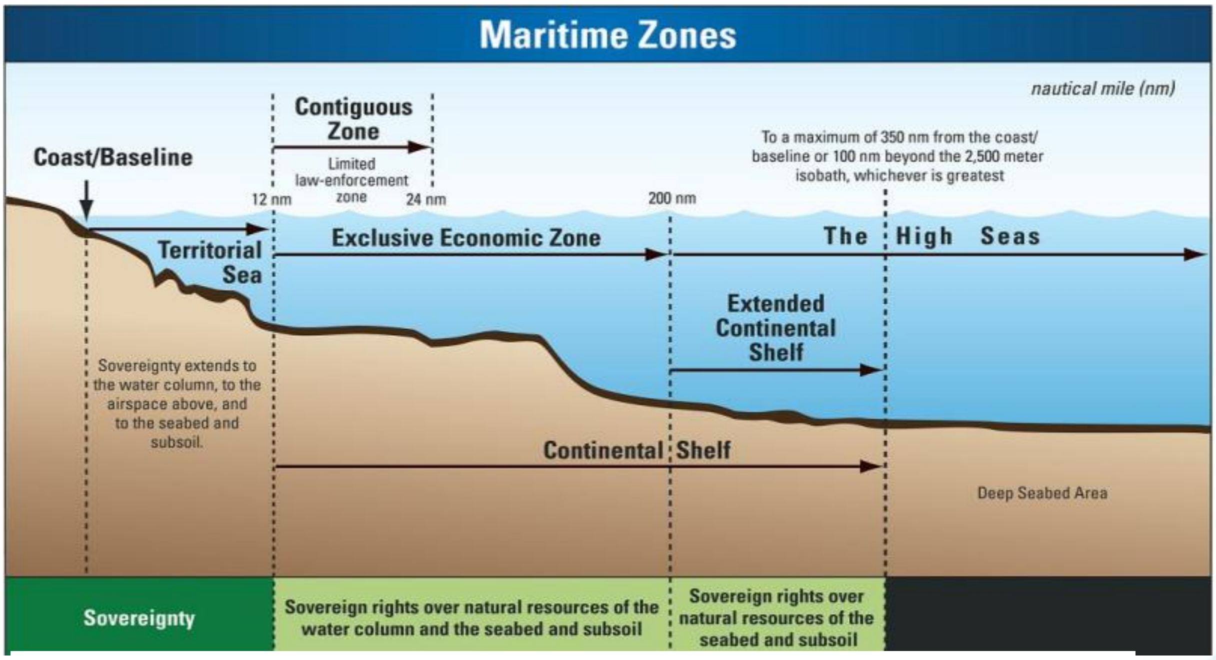

চিত্র ১: মেরিটাইম জোন

২.১ উপকূলীয় রেখা/বেইজলাইন/তটরেখা (Coast line/Baseline)

সাধারণত কোন দেশের সমুদ্র অঞ্চল এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জলসীমা পরিমাপের জন্য একটি লাইনের বা বেইজলাইনের প্রয়োজন। UNCLOS এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন দেশের বেইজলাইন বলতে সেই দেশের উপকূল বরাবর ভাটার শেষ অবস্থান সীমারেখার (Low water mark) সংযোগলাইন কে বোঝায় যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং ঘোষিত। পরিমাপের সুবিধার্থে সাধারণত বেইজলাইন সরলরেখা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাই একে স্ট্রেট বেইজলাইন (Straight Baseline) বলা হয়। স্ট্রেট বেইজলাইন নির্ণয়ের জন্য সাধারণত একটি দেশের সমুদ্রাভিমুখে ভাটার শেষ অবস্থান সীমারেখার কতগুলো পয়েন্ট বা বেজ পয়েন্ট ধরা হয় যা সংযোগ করে স্ট্রেট বেইজলাইন অংকিত হয়। বাংলাদেশের বেইজলাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৪ টি বেইজ পয়েন্ট যথা: ল্যান্ড বাউন্ডারি টার্মিনাল, পুটনি দ্বীপ, দক্ষিণ ভাষাণ চর এবং কক্সবাজারে ৪ টি পয়েন্ট এর সংযোগ রেখা এবং বেজপয়েন্ট ৪ থেকে টেকনাফের সর্বদক্ষিণে ছেড়া দ্বীপ এর ভাটার শেষ অবস্থান সীমারেখাকে বোঝান হয়। বাংলাদেশের সকল মেরিটাইম অঞ্চল এই বেইজলাইন থেকে নির্ণয় করা হয়।

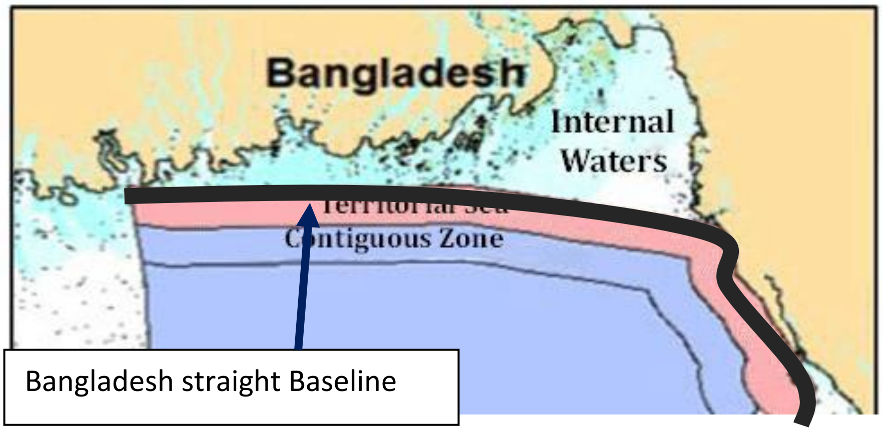

চিত্র ২: বাংলাদেশের বেইজলাইন

২.২ অভ্যন্তরীণ জলসীমা (Internal Waters)

UNCLOS এর আর্টিকেল ৮ অনুযায়ী কোন দেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমা বলতে সেই দেশের বেইজলাইন হতে স্থলাভিমুখী সকল ধরনের জলরাশিকে বুঝায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমার ব্যাপ্তি বোঝাতে এর বেইজলাইন হতে স্থলাভিমুখী সকল ধরনের জলরাশি, তলদেশ, অন্তমৃত্তিকাসহ উপকূলের সকল নদী, ঐতিহাসিক জলরাশি, বন্দর, পোতাশ্রয় এর সীমানা পর্যন্ত অংশকে বোঝায়। কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় তার অধিকার দেশের অভ্যন্তরীণ ভূখন্ডের সার্বভৌম ক্ষমতার অনুরূপ। অর্থাৎ এই সীমায় বাংলাদেশ তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার রাখে এবং এই অঞ্চলে বৈদেশিক জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধ করার এখতিয়ার রাখে। অভ্যন্তরীণ জলসীমা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির প্রধান প্রজনন এলাকা এবং নার্সারি গ্রাউন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

২.৩ রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Territorial Sea)

কোন দেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা তার বেইজলাইন হতে সমুদ্রাভিমুখে সর্বোচ্চ ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত UNCLOS, আর্টিকেল-৩। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা বেইজলাইন হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত জলরাশি, এর মধ্যকার সমুদ্রের তলদেশ এবং এর জলরাশির উপরিভাগের আকাশসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাষ্ট্রীয় জলসীমায় উপকূলবর্তী দেশ UNCLOS এর অধীনে তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার রাখে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জলসীমায় সমুদ্রসম্পদ আহরণে উপকূলবর্তী দেশ পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশে বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ অভ্যন্তরীণ জলসীমা এবং এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়।

২.৪ সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous Zone)

কোন রাষ্ট্রের সন্নিহিত অঞ্চল বেইজলাইন হতে UNCLOS এর আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারবে। এই অঞ্চলে রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় জলসীমায় অপরাধ দমনে বিদেশি জাহাজ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারবে। বাংলাদেশের সন্নিহিত অঞ্চল বেইজলাইন হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলে সামুদ্রিক জলরাশি সহ তলদেশীয় সকল ধরনের সম্পদ আহরণে বাংলাদেশের সাবভৌম্ন থাকবে। তবে পার্শ্ববর্তী দেশ এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল এবং পাইপলাইন নিতে পারবে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের জন্য এই অঞ্চল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫ একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ)

UNCLOS এর বিধান অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল তার বেইজলাইন হতে সর্বোচ্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এমন এক সমুদ্রাঞ্চলকে বোঝায় যা বেইজলাইন হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমারেখা ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ। এই অঞ্চলে UNCLOS অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ আহরণে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে তবে এই অঞ্চলে পাইপলাইন বা সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনে UNCLOS অনুযায়ী সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এই অঞ্চলে সকল জাহাজ নিরপরাধ অতিক্রমণ (Innocent passage) করতে পারবে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এই পুরো সমুদ্রাঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত না হলেও বিভিন্ন ধরনের পেলাজিক মৎস্য আহরণ এইসব অঞ্চলে সম্ভাবনা যাচাই করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলে প্রাণিজ সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

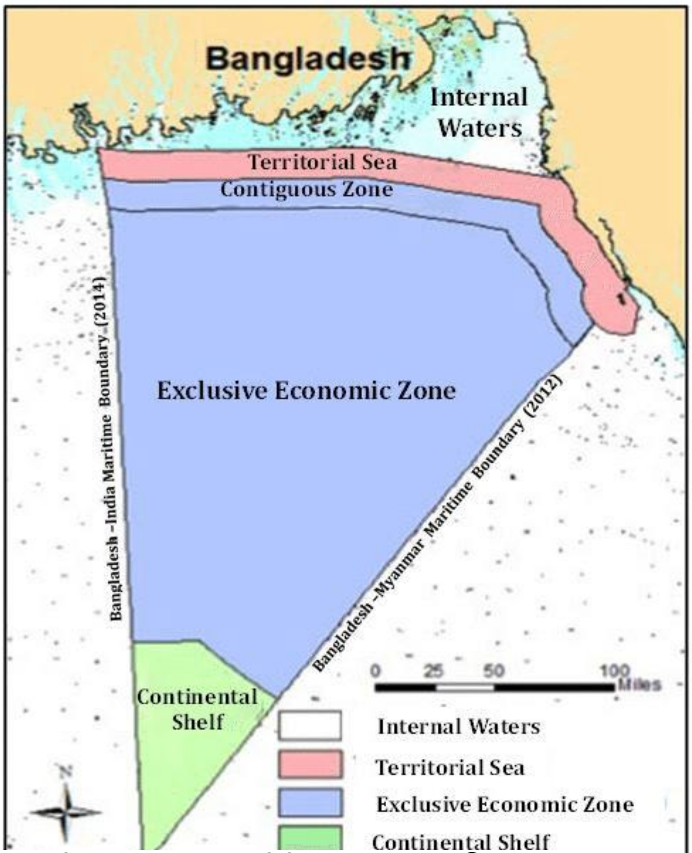

চিত্র ৩: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমুদ্রসীমা

২.৬ মহীসোপান (Continental shelf)

কোন রাষ্ট্রের মহীসোপান অঞ্চল বলতে মহাদেশীয় প্রান্তদেশের (Continental margin) বিস্তৃত সীমা যা বেইজলাইন হতে সমুদ্রাভিমুখে বিস্তৃত এবং যার বহি:সীমা, UNCLOS অনুযায়ী বেইজলাইন হতে সর্বোচ্চ ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারবে। কোন রাষ্ট্রের মহীসোপান অঞ্চল EEZ হতে বর্ধিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মহীসোপানের বহি:সীমা বেইজলাইন হতে সর্বোচ্চ ৩৫০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে। মহীসোপানের যে সমুদ্রাঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে বর্ধিত সেই অঞ্চলের সমুদ্রের তলদেশ এবং তলদেশীয় সম্পদের ওপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের মহাদেশীয় প্রান্তদেশের বহি:সীমা বেইজলাইন হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল এর বাহিরের সমুদ্রাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে বাংলাদেশের মহীসোপানের বহি:সীমা এখনও নির্ধারণ করে সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হয়নি। বাংলাদেশের মহীসোপান অঞ্চলে ২০০ নটিক্যাল মাইল EEZ এর বাইরে মিয়ানমার ও ভারতের ২ টি গ্রে এরিয়া থাকার কারণে মহীসোপান অঞ্চলের বহি:সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

২.৬.১ গ্রে এরিয়া (Grey area)

বাংলাদেশের ২০০ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রাঞ্চলের বাইরে মহীসোপানের অভ্যন্তরে ভারত ও মিয়ানমারের ২টি অঞ্চল আছে যা তাদের EEZ এর মধ্যে অবস্থিত এবং একটি তাদের EEZ অঞ্চলের মধ্যে ওভারল্যাপিং অঞ্চল আছে। তাই এই অঞ্চলসমূহকে ভারত ও মিয়ানমারের গ্রে এরিয়া বলা হয়। এসব গ্রে এরিয়াতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের EEZ অঞ্চলের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

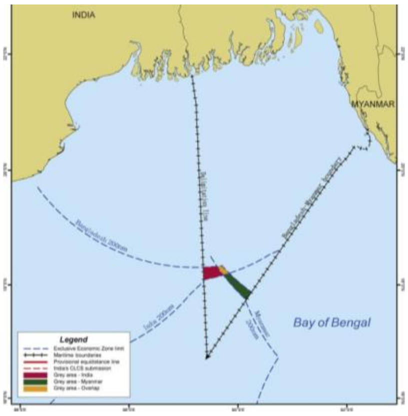

চিত্র ৪: বাংলাদেশের মহীসোপানে ভারত ও মিয়ানমারের গ্রে এরিয়া

২.৭ গভীর সমুদ্র (High seas)

গভীর সমুদ্র বলতে বাংলাদেশের EEZ এর বাইরের আন্তর্জাতিক সমুদ্রাঞ্চল যেখানে বাংলাদেশসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পদ আহরণে সমঅধিকার আছে। এই অঞ্চলে নৌচলাচল, বিমান উড্ডয়ন, সাবমেরিন ক্যাবল পাইপলাইন স্থাপন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মৎস্যশিকারসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সকল রাষ্ট্রের সমঅধিকার আছে। তবে এই অঞ্চলে তলদেশীয় সম্পদ আহরণের জন্য আন্তর্জাতিক সীবেড কর্তৃপক্ষের (ISA) নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশাল সমুদ্র অঞ্চল লাভ করলেও মৎস্যসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে আমরা এখনও উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুনীল অর্থনীতির সুফল পুরোপুরি লাভ করতে হলে আমাদের অন্যান্য সমুদ্র অঞ্চল থেকে সম্পদ আহরণের কার্যকরি নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অধিবেশন: মেরিটাইম জোন ও মেরিন জিওগ্রাফি

ছোট দলীয় কাজ

কাজের ধারা: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশিক্ষণার্থীগণ ৪টি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিম্নের অনুশীলনীর সমাধান করবেন।

অনুশীলনী:

১) প্রতিটি দল একটি পোস্টার পেপারে মেরিটাইম জোনসমূহের তালিকা তৈরি করবে।

২) প্রতিটি দল পোস্টার পেপারে প্রশিক্ষক প্রদত্ত একটি জোন অংকন করে তার বিস্তৃতি প্রদর্শন করবে এবং উক্ত জোনে রাষ্ট্রের অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন: ১.৪	সময়: ১১.৫৫-১২.৫৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: জোনভিত্তিক

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের জোনভিত্তিক বিভিন্ন সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এবং ফিশিং প্রাকটিস সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা সাগরের জোনেশন এবং বাংলাদেশের জোনভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এই অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জোনভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সাগরের বিভিন্ন জোনেশন এবং এর বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সাগরে জোনভিত্তিক মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জোনভিত্তিক প্রচলিত এবং বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• সাগরের জোনেশন (Zonation at sea) • উপকূলবর্তী মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস • পেলাজিক মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস • ডিমার্সাল মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস • গভীর সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস • মেসোপেলাজিক মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস • অতিপরিযায়ী এবং ট্রান্সবাউন্ডারি মৎস্যসম্পদ	বক্তৃতা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরু • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হ্যান্ডআউট, আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: জোনভিত্তিক

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদে, সমুদ্র অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই সমুদ্রাঞ্চলকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়। সমুদ্রের এই সকল জোনে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। সাগরের যেমন খুবই উৎপাদনশীল অঞ্চল রয়েছে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ, এবং নিউট্রিয়েন্ট এর পরিমাণ পর্যাপ্ত যার ফলে সেখানে প্রজাতির বৈচিত্র্য অত্যধিক, পাশাপাশি এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে প্রাণিকূলের টিকে থাকার জন্য পরিবেশ খুবই প্রতিকূল যেখানে সূর্যের আলোর অনুপ্রবেশ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি এবং অক্সিজেনের পরিমাণ একেবারেই অল্প। সাগরের এসব প্রতিকূল অঞ্চলেও অনেক প্রাণী টিকে আছে যাদের কে নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার আগ্রহ অনেক বেশি। মৎস্যজীবীরা সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের এসব প্রাণিজ সম্পদ আহরণের জন্য তাই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে। সাগরে মৎস্যসম্পদ আহরণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জোনভিত্তিক মৎস্যসম্পদ এবং এসব জোনে প্রচলিত মৎস্য আহরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

২. সাগরের জোনেশন (Zonation at sea)

সাগরের বাস্তুসংস্থান একটি জটিল এবং বৃহৎ বাস্তুসংস্থানের অন্তর্গত। সাগরের বাস্তুসংস্থানকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়েছে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এবং একে সাগরের জোনেশন বলা হয়। এসব জোনে প্রজাতির ভিন্নতা এবং পরিবেশের বিভিন্ন সূচকের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সাগরের গভীরতা, আলোর অনুপ্রবেশ, জোয়ার-ভাটার অবস্থান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সাধারণত সাগরের জোনেশন করা হয়ে থাকে। সাগরের পরিবেশকে বৃহৎ আকারে দুটি অঞ্চল বা জোনে ভাগ করা যায়-

১. পেলাজিক জোন (Pelagic zone)
২. বেনথিক জোন (Benthic zone)

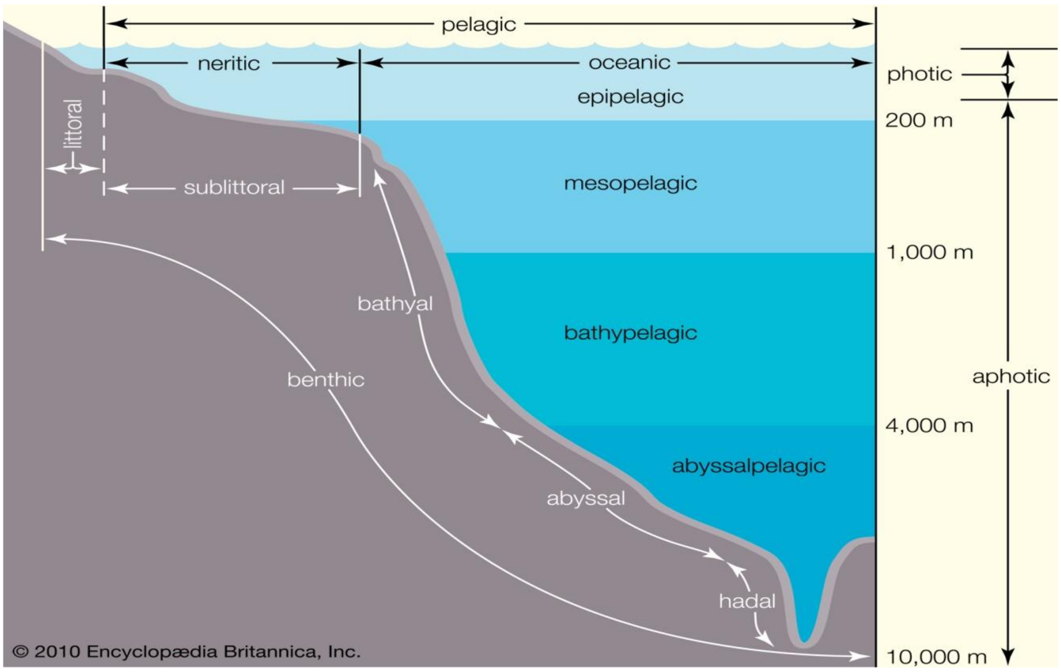

চিত্র ১: সাগরের জোনেশন

১। পেলাজিক জোন: সাগরের সকল জলরাশি বা জলস্তম্ভ হচ্ছে এই জোনের অন্তর্গত। সাগরের পেলাজিক জোনকে গভীরতা এবং সূর্যালোকের অনুপ্রবেশের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়।

গভীরতার ভিত্তিতে

1. এপিপেলাজিক (Epipelagic-upto 200 m)
2. মেসোপেলাজিক (Mesopelagic- 200m to 1000 m)
3. বেথিপেলাজিক (Bathypelagic- 1000m to 4000m)
৪. এবিস্যাল পেলাজিক (Abyssal- 4000 to 10000m)

সূর্যালোকের অনুপ্রবেশের ভিত্তিতে

1. ফোটিক জোন (Photic zone- High sunlight penetration zone)
২. ডিসফোটিক জোন (Disphotic zone- Low sunlight penetration)
3. এফোটিক জোন (Low or no sunlight penetration zone)

২। বেনথিক জোন: সমুদ্রের তলদেশীয় অঞ্চল সীবেড/ওসেনফ্লোর (Seabed/Oceanfloor) এবং এর সংযুক্ত জীববৈচিত্র্য নিয়ে বেনথিক জোন গঠিত। সমুদ্রের বেনথিক জোন উপকূলীয় জোয়ারের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রাভিমুখে তলদেশীয় মহীসোপান (Continental shelf), মহাদেশীয় ঢাল (Continental slope) এবং এর পরবর্তীতে উন্মুক্ত সাগরের (Open sea) তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সাগরের এপিপেলাজিক জোনকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ইন্টারটাইডাল জোন (Intertidal zone): সাগরের যে অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার পানি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ জোয়ারের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে ভাটার সর্বোচ্চ পর্যায়ের পানির উপরিভাগের পর্যন্ত অঞ্চল।
২. তীরবর্তী অঞ্চল (Littoral zone): সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল যা উপকূল থেকে সমুদ্রাভিমুখে বিস্তৃত যার সুনির্দিষ্ট কোন সীমা নেই তবে উপকূলবর্তী অগভীর অঞ্চল এই জোনের অন্তর্গত।
৩. ওশেনিক জোন (Oceanic zone): তীরবর্তী অঞ্চলের পরবর্তী এলাকা যা উন্মুক্ত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

সাগরের এসকল জোনে পরিবেশের তারতম্যের জন্য মৎস্যসম্পদের ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। এসব সম্পদ আহরণে প্রচলিত ফিশিং অনুশীলন তাই ভিন্ন পর্যায়ের এবং জোনভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনাও ভিন্নরকম। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জোনভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা আছে। বাংলাদেশের প্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সাধারণত দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত যথা:

১. আর্টিসানাল ফিশারি (Artisanal fishery)
২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশারি (Industrial fishery)

মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং প্রজাতির ওপর ভিত্তি করে এদের আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে জোনভিত্তিক এসকল মৎস্য আহরণ অনুশীলন বা ফিশিং প্রাকটিস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

৩. উপকূলবর্তী মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্র্যাকটিস (Littoral fishery and fishing practice)

সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল সাধারণত সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল (Productive) হয়ে থাকে । এই অঞ্চলে তাই জীববৈচিত্র্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণত উপকূল থেকে ১০ মি. গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রাঞ্চল এর আওতাভুক্ত। এই অঞ্চলে নদীর মোহনা সংযোগস্থল হওয়ায় প্রচুর পলিযুক্ত এবং পর্যাপ্ত নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ। এই অঞ্চল সাধারণত বেশিরভাগ মৎস্য প্রজাতি এবং শ্রিম্প ও কাঁকড়া প্রজনন এলাকা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এর মাঝে ইলিশের প্রজনন এলাকাও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অঞ্চলে মৎস্য আহরণ থেকে বিরত থাকে। বাংলাদেশে এই অঞ্চলে প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস সাধারণত আর্টিসানাল ফিশারি দ্বারা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন প্রকার গিল নেট, ইএসবিএন (উপকূলীয় বেহুন্দী জাল), চিংড়ি ও কাঁকড়ার পিএল সংগ্রহ ইত্যাদি এসব অঞ্চলের প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস। বর্তমানে প্রচলিত এই অঞ্চলে প্রচলিত বেশিরভাগ ফিশিং প্রাকটিস মৎস্যসম্পদের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৪. পেলাজিক মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্র্যাকটিস (Pelagic fisheries and fishing practice)

সাগরের উপরিস্তরের মৎস্যসম্পদ পেলাজিক মৎস্যসম্পদ হিসেবে পরিচিত। আমাদের সমুদ্রে পেলাজিক মৎস্যসম্পদের মধ্যে রয়েছে সার্ডিন, ম্যাকেরেল, টুনা ও টুনাজাতীয় মাছ, হাঙ্গর, উড়ুক্কু, ছুরিমাছ, পমফ্রেট, মৌরিমাছ (Carangid), ওলুয়া, ইলিশ, ইত্যাদি। এই সম্পদ আহরণের জন্য সারাবিশ্বে প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস হচ্ছে পেলাজিক ট্রলিং, মিডওয়াটার ট্রলিং, সেইনিং, লংলাইনার। আমাদের দেশে কিছু মিডওয়াটার ট্রলার থাকলেও লংলাইনার এবং পার্সসেইনার এখনও প্রচলিত হয়নি। এছাড়াও কিছু আর্টিসানাল ফিশারি এই অঞ্চল থেকে মৎস্যসম্পদ আহরণ করে থাকে।

৫. ডিমার্সাল বা তলদেশীয় মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্র্যাকটিস (Demersal fisheries and fishing practice)

সাগরের তলদেশীয় মৎস্যসম্পদ খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাণিজ্যিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি যেমন এখানে বিদ্যমান তেমনি কিছু অপ্রচলিত এবং বাণিজ্যিকভাবে নিম্নপর্যায়ের মৎস্য প্রজাতির সংখ্যাও এই অঞ্চলে অধিক । আমাদের দেশের ডেমার্সাল মৎস্যসম্পদ বলতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ থ্রেডফিন (লাক্ষা,তাইল্ল্যা), ইল, সি ক্যাটফিস, থ্রেডফিন ব্রিম, গোটফিস (সোনালি বাটা), ফ্ল্যাটফিস, ক্রোকার (পোয়া) বা হাউসপাতা, গ্রুপার (বোল মাছ), স্ন্যাপার (লাল কোরাল), স্কেটস হাঙ্গর, ইত্যাদি এবং সকল প্রকার চিংড়ি, লবস্টার, কাঁকড়া, সেফালোপড, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রধান ফিশিং প্রাকটিস হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার কর্তৃক ডেমার্সাল বা তলদেশীয় ট্রলিং এবং শ্রিম্প ট্রলিং। আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু ডেমার্সাল ট্রলার এবং কিছু শ্রিম্প ট্রলার এসব মৎস্যসম্পদ আহরণ করছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে তলদেশীয় ট্রলিং কে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে সাগরের তলদেশের পরিবেশের ওপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কারণে। আমাদের দেশেও বটম ট্রলিংকে মিডওয়াটার ট্রলিংয়ে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চলছে।

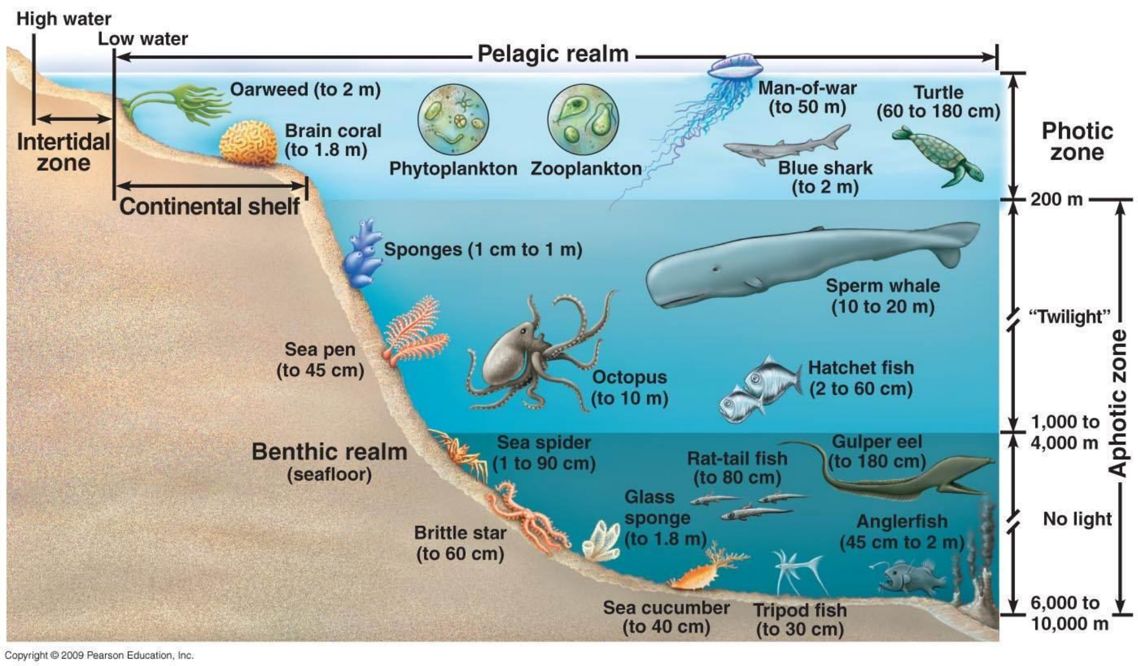

চিত্র ২: সাগরে জোনভিত্তিক জীববৈচিত্র্য

৬. গভীর সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্রাকটিস (High seas fisheries and fishing practice)

সাধারণত উন্মুক্ত সাগরের মৎস্যসম্পদসমূহ এর অন্তর্গত। সারাবিশ্বে গভীর সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ বলতে সাধারণত টুনা এবং টুনাজাতীয় মৎস্যসম্পদকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া কিছু কিছু অঞ্চলে হাঙ্গর আহরণ করে থাকে। এসব মৎস্যসম্পদ আহরণ পদ্ধতি লংলাইনার হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০০ মি. গভীরতার বাইরে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং তার পরবর্তী গভীর সমুদ্রে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ফিশিং প্রাকটিস প্রচলিত নেই। তবে এসব অঞ্চলে জরিপের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের পরিমাণ এবং তার আহরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করে বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের নতুন দ্বার উন্মোচন করা যেতে পারে।

৭. মেসোপেলাজিক সম্পদ এবং প্রচলিত ফিশিং প্র্যাকটিস (Mesopelagic fisheries and fishing practice)

সাগরের ২০০ মি. গভীরতা থেকে ১০০০ মি. গভীরতা পর্যন্ত অঞ্চলকে মেসোপেলাজিক অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে সূর্যালোক কিছুটা অনুপ্রবেশ করতে পারে তাই এই অঞ্চলকে ডিসফোটিক জোন বলা হয়ে থাকে। নিউট্রিয়েন্ট এবং অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য এই অঞ্চলে খুব বেশি মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না তবে কিছু কিছু মৎস্য প্রজাতি এই অঞ্চলে বসবাস করে যাদের মেসোপেলাজিক মাছ বলা হয়। এসব মাছের গঠন একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয় এদের কিছু কিছু প্রজাতির মধ্যে লাইট ওরগান থাকে। খাদ্য হিসেবে বিশ্বব্যাপী গৃহীত না হলেও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষ করে ফিসমিল ইন্ডাস্ট্রিতে এদের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। মেসোপেলাজিক মৎস্য আহরণ বিভিন্ন দেশে এখন খুব প্রচলিত ফিশমিল ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহারের জন্য এবং আমাদের দেশেও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ৩: বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত মেসোপেলাজিক মাছ *Lestrolepis japonica*

চিত্র ৪: বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত মেসোপেলাজিক মাছ *Cubiceps pauciradiatu*

৮. অতিপরিযায়ী এবং ট্রান্সবাউন্ডারি মৎস্যসম্পদ (Highly migratory and trans-boundary fish species)

সমুদ্রের অনেক মাছ আছে যারা পরিযায়ী (Migratory) প্রকৃতির হয়ে থাকে। জৈবিক বিভিন্ন প্রয়োজনে এরা এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে অভিপ্রয়াণ করে থাকে। কিছু কিছু মৎস্য প্রজাতির অভিপ্রয়াণের সীমা এণটাই দীর্ঘ হয় যে তারা একাধিক উপকূলীয় রাষ্ট্রের EEZ অতিক্রম করতে পারে। এসকল প্রজাতিসমূহকে ট্রান্সবাউন্ডারি প্রজাতি (trans-boundary fish species) বলা হয়। ইলিশ, টুনা ও টুনা জাতীয় মাছসমূহ এ গ্রুপের অন্তর্গত। এসব প্রজাতির মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার জন্য আন্ত:দেশীয় বিভিন্ন সংগঠন এবং কমিশন কাজ করছে যেমন টুনা জাতীয় মাছের কমিশন হচ্ছে IOTC (Indian Ocean Tuna Commission)

জোনভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ভিন্নতার কারণে এর আহরণের পদ্ধতিতেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্নতা দেখা যায় তাই এসব সম্পদের টেকসই আহরণের জন্য জোনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন: ১.৫	সময়: ১৪.০০-১৫.০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: মৎস্য গ্রুপভিত্তিক

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন ফিনফিশ ও ক্রাস্টাশিয়ান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা বঙ্গোপসাগরে এদেশের সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন ফিনফিশের এবং ক্রাস্টাশিয়ান গ্রুপ ও প্রজাতি সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত ফিনফিশ ও ক্রাস্টাশিয়ান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন ফিনফিশের এবং ক্রাস্টাশিয়ান গ্রুপ ও প্রজাতিসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য • বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ফিনফিশের গ্রুপ ও প্রজাতিসমূহ • বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ক্রাস্টাশিয়ান প্রজাতিসমূহ	বক্তৃতা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ	
সারসংক্ষেপ			৭ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: পোস্টার পেপার, আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: মৎস্য গ্রুপভিত্তিক

সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার আয়তন মূল-ভূখন্ডের প্রায় সমান। ভৌগোলিক অবস্থান, মৌসুমি জলবায়ু ,অধিক বৃষ্টিপাত, নদীবিধৌত পানি ও পলি এদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশকে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। সমুদ্রসীমায় জীববৈচিত্র্যের এ মহাসমারোহের মধ্যে রয়েছে নানা প্রজাতির অস্থিময় মাছ (সকল কঙ্কালযুক্ত মাছ), তরুণাস্থিময় মাছ (হাঙ্গর, রে ও স্কেট), চিংড়ি, লবস্টার, কাঁকড়া, শামুক, সেপালেপোড, কচ্ছপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, প্রবাল ও শৈবাল ইত্যাদি (টেবিল ০১)। তরুণাস্থিময় (Cartilaginous fishes) ও অস্থিময় (Bony fishes) মাছসমূহকে ফিনফিশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

টেবিল ০১ : বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য

ক্যাটাগরিসমূহ	প্রজাতির সংখ্যা
অস্থিময় মাছ	৪৭৫
তরুণাস্থিময় মাছ (হাঙ্গর, রে ও স্কেট)	৫১
চিংড়ি	৩৬
লবস্টার	৮
কাঁকড়া	১৫
ডলফিন/তিমি*	১১
সামুদ্রিক কচ্ছপ*	০৫
সাপ*	০৪
পাখি* (অভিপ্রয়াণশীল উপকূলীয় পাখিসহ)	৯৮

ক্যাটাগরিসমূহ	প্রজাতির সংখ্যা
মলাস্ক (শামুক ও ঝিনুক)	৩০১
সেফালোপোড	০৭
স্টার ফিশ/ একাইনোডার্ম**	০৩
শৈবাল	১৬৮
প্রবাল**	১৩
স্পঞ্জ **	০৩
ওয়েস্টার	০৬
সজারু**	০১
সাগর শশা**	০১

* সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

** বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদ হিসেবে প্রচলিত নয়

১. তরুণাস্থিময় মাছ (Cartilaginous fishes):

তরুণাস্থিময় মাছের কঙ্কাল কোমল বা নরম অস্থি (হাড়) দিয়ে গঠিত। তাদের কানকো থাকে না তবে ফুলকাছিদ্র থাকে। হাঙ্গর, করাতিমাছ, হাতুড়িমাছ ও রে সমূহ তরুণাস্থিময় মাছ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত ৫১ প্রজাতির তরুণাস্থিময় মাছের মধ্যে ২২ প্রজাতির হাঙ্গর তথা শার্ক ও ২৯ প্রজাতির হাউস রয়েছে।

১.১ হাঙ্গর (Sharks)

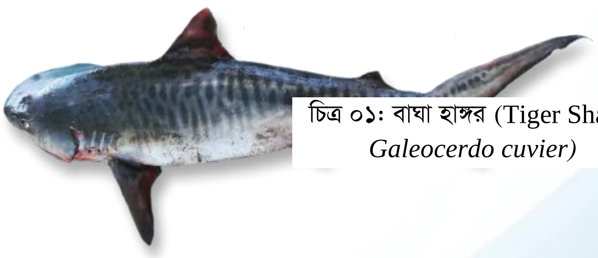

চিত্র ০১: বাঘা হাঙ্গর (Tiger Shark, *Galeocerdo cuvier)*

হাঙ্গর খাদ্য শৃঙ্খলের সর্বোচ্চ শিকারী হিসেবে সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে ভারসাম্য রক্ষা করে। হাঙ্গরকে সমুদ্র স্বাস্থ্যের নির্দেশক (Indicator of Ocean Health) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ২৫ প্রজাতির হাঙ্গর রয়েছে। যার মধ্যে তিমি হাঙ্গর (Whale Shark, *Rhincodon typus*), বাঘা হাঙ্গর (Tiger Shark, *Galeocerdo cuvier*), করাতি হাঙ্গর (Family-Pristidae), হাতুরি হাঙ্গর (Family-Sphyrinidae) ও রেশমী হাঙ্গর (Silky Shark, *Carcharinus falciformis*) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১.২ হাউস/শাপলাপাতা (Rays and Batoids)

শাপলাপাতা মাছ বিপন্ন প্রাণীসমূহের মধ্যে অন্যতম। সমুদ্র স্বাস্থ্যের (Ocean Health) ভারসাম্য রক্ষায় এ মাছসমূহের ভূমিকা অপরিহার্য। বাংলাদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলে ২২ প্রজাতির হাউস/শাপলাপাতা ও ০৪ প্রজাতির পীতাম্বরী মাছ রয়েছে। যার মধ্যে চিত্রা হাউস (Honeycomb Stingray, *Himantura uarnak*), নীলফোঁটা শাপলাপাতা (Blue-spotted stingray, *Neotrygon kuhlii*), প্রজাপতি শাপলাপাতা (Long-tailed butterfly ray, *Gymnura poecilura*), কালো বিদ্যুৎ মাছ (Spotted numbfish, *Narcine timlei*) , চোখানাক পিতাম্বরী (Granulated guitarfish, *Glaucostegus granulatus*), ধনুকমুখী পিতাম্বরী (Bowmouth guitarfish, *Rhina ancylostoma*) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

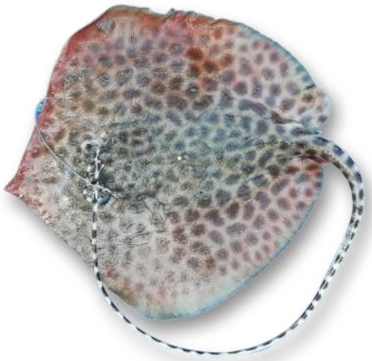

চিত্র ০২: চিত্রা হাউস (Honeycomb Stingray, *Himantura uarnak*)

চিত্র ০৩: প্রজাপতি শাপলাপাতা (Long-tailed butterfly ray, *Gymnura poecilura)*

চিত্র ০৪: ধনুকমুখী পিতাম্বরী (Bowmouth guitarfish, *Rhina ancylostoma)*

২. অস্থিময় মাছ (Bony fishes)

অস্থিময় মাছের কঙ্কাল শক্ত হাড় দ্বারা গঠিত। ফুলকা কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। বিশ্বে মেরুদণ্ডী প্রাণীর গ্রুপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রুপ হচ্ছে অস্থিময় মাছ যা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রায় অর্ধেক। কোরাল, রূপচাঁদা ও পোয়া ইত্যাদি অস্থিময় মাছের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ৪৭৫ প্রজাতির অস্থিময় মাছসমূহ ১৩৩ টি গোত্রের (Family) অন্তর্ভুক্ত। সাগর বা উপকূলীয় এলাকায় প্রচলিত কিংবা বাণিজ্যিকভাবে আহরিত মাছের মধ্যে সব প্রজাতিই জেলেদের কাছে কাঙ্ক্ষিত বা লক্ষিত (Targated) প্রজাতি নয়। সাধারণত বাজারে চাহিদাসম্পন্ন মাছের প্রজাতি আহরণে বাণিজ্যিক বা আর্টিসানাল নৌযানসমূহ সদা তৎপর থাকে। বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্যের গ্রুপভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নে বর্ণিত হলো:

২.১ কাঁটা মাছ (Catfish)

Ariidae I Plotosidae গোত্রের মাছসমূহকে কাঁটা মাছ বা সী ক্যাটফিশ নামে অবহিত করা হয়। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলে ২০ প্রজাতির কাঁটা মাছ বা ক্যাটফিশ রয়েছে। বাজারদর এবং চাহিদার কারণে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ Ariidae পরিবারভুক্ত কাঁটা মাছের দিকে জেলেদের আকর্ষণ বেশি। যার মধ্যে কাঁটা মাছ (Soldier Catfish, *Osteogeneiosus militaris*), কাঁটা মালা *(Spotted catfish, Arius maculatus)*, কাঁটা ভেদি *(Veined catfish, Arius venosus)* ও কাঁটা মাছ *(Threadfin Catfish, Arius arius)* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ০৫: কাঁটা মাছ (Threadfin Catfish, *Arius arius*)

২.২ পোয়া মাছ (Croaker/Jew)

মূলত *Scianidae* গোত্রের মাছসমূহ পোয়া বা ক্রোকার নামে পরিচিত। বাংলাদেশে সমুদ্রসীমায় ২০ প্রজাতির পোয়া মাছ বা ক্রোকার রয়েছে। পোয়া মাছ বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অগভীর অঞ্চলে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন এ মাছসমূহ বর্তমানে অতি আহরণের শিকার হচ্ছে। পোয়া মাছের মধ্যে দাঁত পোয়া *(Tigertooth croaker, Otolithes ruber)*, লাল পোয়া *(Silver croaker, Pennahia argentata)*, গুটি পোয়া *(Blotched tiger-toothed croaker, Pterotolithus maculatus)*, সাদা পোয়া *(Donkey croaker, Pennahia anea)*, লেইজ্যা পোয়া *(Donkey croaker)* ও লম্বু পোয়া *(Bronze Croaker, Otolithoides biauritus)* বাজারে যথেষ্ট চাহিদা সম্পন্ন।

চিত্র ০৬: দাঁত পোয়া (Tigertooth croaker, *Otolithes ruber*)

২.৩ হুন্দ্রা ও লেডি ফিস (Sillago, Whitings)

Sillaginidae গোত্রের বাইলা মাছ সমূহ বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অগভীর অঞ্চল ও মোহনায় পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ০২ প্রজাতির সিলাগো /বাইলা মাছ মাছ পাওয়া যায় যার মধ্যে তুলার ডান্ডি, হুন্দ্রা বাইলা *(Flathead sillago, Sillaginopsis panijus)* বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন।

চিত্র ০৭: হুন্দ্রা বাইলা, তুলার ডান্ডি (Flathead sillago, *Sillaginopsis panijus*)

২.৪ ছুরি মাছ (Ribbon fish)

ছুরি মাছ *(Ribbon fish) Trichuridae* গোত্রের মাছ। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের জলসীমায় ০৩ প্রজাতির ছুরি মাছ পাওয়া যায়। মূলত ছুরি মাছ শুঁটকির জন্য বিখ্যাত ও বর্তমানে রপ্তানিপণ্য হিসেবে সম্ভাবনাময়। উপকূলীয় অঞ্চলে ছুরি মাছের দুইটি প্রজাতি *(Lepturacanthus savala* ও *Trichiurus lepturus)* শুঁটকি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ০৮: ছুরি মাছ (Largehead hairtail, *Trichiurus lepturus*)

২.৫ লইট্টা (Bombay Duck)

লইট্টা মাছ (Bombay duck, *Harpadon nehereus*) Harpadontidae গোত্রভুক্ত মাছ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অগভীর অঞ্চল ও মোহনায় এ মাছটি পাওয়া যায়। বাজারে ফ্রেশ অবস্থায় ও শুঁটকি হিসেবে লইট্টা মাছের অধিক চাহিদা রয়েছে। এ মাছ যুক্তরাজ্য, সিংগাপুর ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হচ্ছে।

চিত্র ০৯: লইট্টা মাছ (Bombay duck, *Harpadon nehereus*)

২.৬ ইলিশ মাছ (Shad)

বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছ ইলিশ (Hilsa shad, *Tenualosa ilisha*) Clupidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একক মৎস্য প্রজাতি হিসেবে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে এবং জিডিপিতে যার অবদান প্রায় ০১ শতাংশ। বিশ্বে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় যার ফলে এ মাছ এদেশের ভৌগলিক পণ্য (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইলিশের বর্তমান উৎপাদন প্রায় ৫ লাখ টন যার ৫৫ শতাংশ আসে সামুদ্রিক জলাশয় থেকে। এদেশের প্রায় ২০ লাখ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইলিশের সাথে জড়িত মধ্যে ৫ লাখ মৎস্যজীবী।

চিত্র ১০: ইলিশ (Hilsa shad, *Tenualosa ilisha*)

২.৭ টুনা (Tuna)

টুনা জাপানসহ সারা বিশ্বে মূল্যবান মাছ হিসেবে সমাদৃত। টুনা Scombridae গোত্রভুক্ত মাছ। এদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ০৫ প্রজাতির টুনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে টুনা আহরণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ মাছ গভীর সমুদ্রে বিচরণ করে। বাংলাদেশের একচ্ছত্র জলসীমায় টুনা এবং টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণের কার্যক্রম হিসাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ টি লংলাইনার ও ০৭টি পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলার আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাজারে সচরাচর বোম মাইট্টা (Kawakawa, *Euthynnus affinis*) ও টুনা (Longtail tuna, *Thunnus tonggol*) নামের প্রজাতিসমূহ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ১১: টুনা, বোম মাইট্টা (Longtail tuna, *Thunnus tonggol*)

২.৮ ম্যাকারেল (Mackerel)

ম্যাকারেল বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও চাহিদাসম্পন্ন মাছ যা Scombridae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অবতরণকেন্দ্র ও বাজারসমূহে ০৩ প্রজাতির ম্যাকারেল পাওয়া যায়। ম্যাকারেলসমূহের মধ্যে আইলা মাছের (Indian Mackerel, *Rastrelliger kanagurta*) প্রাচুর্য সর্বাধিক। অন্য দুইটি প্রজাতি সুরমা (Narrow-barred Spanish mackerel, *Scomberomorus commerson*) ও সুরমা/ মাইট্যা (Indo-Pacific king mackerel, *Scomberomorus guttatus*) প্রায়শ বাজারে পাওয়া যায়।

চিত্র ১২: আইলা মাছ (Indian Mackerel, *Rastrelliger kanagurta*)

২.৯ সার্ডিন (Sardine)

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সার্ডিন মাছ Clupidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ০৭ প্রজাতির সার্ডিন মাছ শনাক্ত করা হয়েছে। বড় আকারের মাছের আধিক্য হ্রাস পেতে থাকায় সার্ডিন বর্তমানে লক্ষিত প্রজাতিতে (Target Species) পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ট্রলার কর্তৃক আহরণে *Sardinella fimbriata*, *Sardinella longiceps* ও *Dussumieria elopsoides* ইত্যাদি সার্ডিন বেশি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ১৩: খইরা, সারডিন (Fringescale sardinella, *Sardinella fimbriata*)

২.১০ চাঁদা মাছ (Pomfret)

পমফ্রেট (চাঁদা) Stromateidae গোত্রের মাছ। এ চাঁদামাছ বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রাপ্ত মাছের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ মাছ হিসেবে সর্বজনবিদিত। অতি আহরণের ফলে চাঁদা মাছ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বাজারে ফলিচাঁদা (Silver Pomfret, *Pampus argenteus*), রূপচাঁদা (Chinese Pomfret, *Pampus chinensis*), কালা চাঁদা/হালিচাঁদা (Black Pomfret, *Parastromateus niger*) ও মাখন চাঁদা (Indian drift fish, *Ariomma indicum*) প্রভৃতি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

চিত্র ১৪: ফলিচাঁদা (Silver Pomfret, *Pampus argenteus*)

২.১১ গ্রুপার (Groupers)

Serranidae গ্রুপভুক্ত গ্রুপার বা বোল বড় মুখবিশিষ্ট স্থুলকায় (Stout) মাছ। গ্রুপার মূলত মাংশাসী (Carnivore) মাছ। বাংলাদেশে এ গোত্রের ১০ টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। গ্রুপার বা বোল মাছ Protogynous hermaprodite অর্থাৎ স্ত্রী গ্রুপার জীবনের কোন এক পর্যায়ে সেক্স পরিবর্তন করে পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। গ্রুপার বিশ্বে উপাদেয় ও সুস্বাদু মাছ হিসেবে সমাদৃত।

চিত্র ১৫: গুঁড় বোল (Orange-spotted grouper, *Epinephelus coioides*)

বাজারে গুঁড় বোল (Orange-spotted grouper, *Epinephelus coioides*), দাগী বোল (Striped grouper, *Epinephelus latifasciatus*) ও দাড়ি বোল (Bluelined Hind, *Cephalopholis formosa*) ইত্যাদি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।

২.১২ স্ন্যাপার (Snappers)

সারা বিশ্বে প্রায় ১০৫ প্রজাতির স্ন্যাপার রয়েছে যারা মূলত Lutjanidae গোত্রভুক্ত মাছ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় এপর্যন্ত ১২ প্রজাতির স্ন্যাপার পাওয়া যায়। স্ন্যাপার বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান ও চাহিদা সম্পন্ন মাছ হিসেবে পরিচিত। মাংশাসী (Carnivore) মাছ হিসেবে স্ন্যাপার ক্রাস্টাসিয়া ও অন্যান্য ছোট মাছ শিকার করে থাকে। বাংলাদেশে উপকূলীয় মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও বাজারসমূহে স্ন্যাপার লাল কোরাল, রাঙ্গা কৈ, রাঙ্গা চৌক্কা ও রাঙ্গা চৈ নামে বিক্রয় হয় । বাজারে প্রাপ্ত স্ন্যাপারসমূহের মধ্যে রাঙ্গা চৌক্ষা, রাঙ্গা কৈ (John's Snapper/ Red Snapper, *Lutjanus johnii*), রাঙ্গা কৈ (Crimson Snapper, *Lutjanus erythropterus*), চেম্বালি কোরাল, রাঙ্গা কৈ (Mangrove Red Snapper, *Lutjanus argentimaculatus*) ও লাল মাছ (Yellowstreaked Snapper, *Lutjanus lemniscatus*) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১৬: রাঙ্গা চৌক্কা (John's Snapper, *Lutjanus johnii*)

২.১৩ থ্রেডফিন (Threadfin)

থ্রেডফিন গ্রুপের মাছসমূহ Polinemidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে ০৭ প্রজাতির থ্রেডফিন পাওয়া যায়। থ্রেডফিন গ্রুপের মাছসমূহ বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অগভীর অঞ্চলে, মোহনা ও তৎসংলগ্ন নদীসমুহে পাওয়া যায়। অতি আহরণের ফলে থ্রেডফিন গ্রুপের মাছগুলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ গ্রুপের মাছগুলোর মধ্যে তাইল্যা (Fourfinger Threadfin, *Eleutheronema tetradactylum*), লাক্ষা (Indian Threadfin, *Leptomelanosoma indicum*), রিকশা মাছ/তাপসে মাছ (Paradise Threadfin, *Polynemus paradiseus*) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১৭: তাইল্যা (Fourfinger Threadfin, *Eleutheronema tetradactylum*)

২.১৪ জ্যাক, ট্র্যাভেলী ও স্ক্যাড (Jacks, Travelly and Scads)

জ্যাক, ট্র্যাভেলী ও স্ক্যাড মাছসমূহ Carangidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বে এ গোত্রের ২০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ৩০ টি প্রজাতি পাওয়া যায়। এ গ্রুপের মাছসমূহ দ্রুতগামী মাংশাসী (Carnivore) প্রকৃতির হয়ে থাকে। এগ্রুপের মাছসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও চাহিদা সম্পন্ন মাছ হিসেবে মোরী (Bumpnose trevally, *Carangoides hedlandensis*), পেখম মৌরী (Indian Threadfish, *Alectis indica*), পেখম মৌরী (African Pompano, *Alectis ciliaris*), বড় চৌক্ষা (Bigeye Trevally, *Caranx sexfasciatus*) ও বাংগাদা (Cleftbelly Trevally, *Atropus atropos*) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১৮: বড় চৌক্ষা (Bigeye Trevally, *Caranx sexfasciatus*)

২.১৫ গ্রান্টস (Grunts)

Haemulidae গোত্রভুক্ত মাছসমূহকে গ্রান্টস বলা হয়। এ গ্রুপের মাছসমূহ দাঁতের সাহায্যে শব্দ উৎপাদন করতে পারে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ০৮ প্রজাতির গ্রান্টস শনাক্ত করা হয়েছে। গ্রান্টস সমূহের মধ্যে উপকূলীয় মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও বাজারসমূহে গুটি দাতিনা (Cock Grunter, *Pomadasys maculatus*) ও নাক কোরাল (Javelin Grunter, *Pomadasys kaakan*) মাছের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যদিও অতি আহরণের ফলে মাছগুলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

চিত্র ১৯: নাক কোরাল (Javelin Grunter, *Pomadasys kaakan*)

২.১৬ টেরাপন পার্চ (Terapon Perch)

টেরাপন পার্চ Teraponidae গোত্রভুক্ত মাছ। বাংলাদেশে ০৩ প্রজাতির টেরাপন পার্চ পাওয়া যায়। উপকূলীয় প্রবাল ও পাথুরে এলাকা, প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ) ও নদীসমূহে পাওয়া যায়। এ গ্রুপের মাছগুলো সর্বভূক (Omnivore) ও দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। এরা শব্দ তৈরি করতে পারে। বাজারে বারগুনি (Largescaled terapon, *Terapon theraps*) টেরাপন পার্চ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

চিত্র ২০: বারগুনি (Largescaled terapon, *Terapon theraps*)

২.১৭ থ্রেডফিন ব্রিম (Threadfin breams)

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় Nemipteridae গোত্রের ০৬ প্রজাতির থ্রেডফিন ব্রিম মাছ পাওয়া যায়। এ গ্রুপের মাছগুলো সমুদ্রের কাঁদা ও বালুময় তলদেশে বসবাস করে। রূপবান/লাল মাছ (Japanese Threadfin Bream, *Nemipterus japonicus*) থ্রেডফিন ব্রিম গ্রুপের সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ মাছ যা ট্রল ক্যাচে বেশি পাওয়া যায়।

চিত্র ২১: রূপবান মাছ (Japanese Threadfin Bream, *Nemipterus japonicus*)

২.১৮ গোটফিশ (Goatfish)

চিত্র ২২: সোনালি বাটা (Longfin goatfish, *Upeneus supravittatus*)

Mullidae গোত্রের মাছসমূহ গোটফিস নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ০৭ প্রজাতির গোটফিশ রেকর্ড করা হয়েছে। এ মাছগুলো উপকূলীয় অগভীর এলাকা ও মোহনায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ গোটফিশ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় রঙের হয়ে থাকে। গোটফিস সোনালি বাটা নামে (Sulphur Goatfish, *Upeneus sulphureus*) ও সোনালি বাটা (Goldband Goatfish, *Upeneus moluccensis*)

২.১৯ ফ্ল্যাটফিস (Flatfish)

Cynoglossidae, Bothidae ও Soleidae ইত্যাদি গোত্রের মাছগুলো ফ্ল্যাটফিস নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ২২ প্রজাতির ফ্ল্যাটফিশ শনাক্ত করা হয়েছে। তলদেশীয় (Demarsal) গ্রুপের এ মাছগুলো বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গোপসাগরে প্রায় সর্বোত্র এই মাছের বিস্তৃতি এবং ডেমার্সাল ও শ্রিম্প ট্রলার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে আহরিত হয়। ফ্ল্যাটফিশসমূহ ফিশমিল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। হেলিবাট (Indian halibut, *Psettodes erumei*), লম্বু কুকুরজিব (Long tongue sole, *Cynoglossus lingua*) সেরবতি/পাতা মাছ (Commerson's sole, *Synaptura commersonnii*) ও সেরবতি/চ্যাপ্টা মাছ (Deep Flounder, *Pseudorhombus elevatus*) ইত্যাদি ফ্ল্যাটফিশের অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র ২৩: সেরবতি/পাতা মাছ (Commerson's sole, *Synaptura commersonnii*)

২.২০ পটকা (Puffers)

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Tetraodontidae গোত্রের ১০ প্রজাতির পটকা মাছ পাওয়া যায়। পটকা মাছ প্রয়োজনে পানি ও বাতাস পূর্ণ করে এদের ইলাস্টিক পাকস্থলী বড় করতে পারে। পটকা মাছে টেট্রাডোটক্সিন (TTX) নামক বিষ থাকে। এ মাছের বিষাক্ততা স্থান, ঋতু ও প্রজাতিভেদে ভিন্নতর হয়। জাপানীদের নিকট পটকা মাছ সু-স্বাদু ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল খাবার। পটকার বিষের মৌলিক উপাদান "TTX" এ্যানেসথেসিয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয় যার বাজারমূল্য অনেক। বাজার ও অবতরণকেন্দ্র সমূহে সামুদ্রিক পটকা (Oceanic puffer, *Lagocephalus lagocephalus*), রূপালি পটকা (Lunartail puffer, *Lagocephalus lunaris*) ও ডোরা পটকা (Lattice blaasop, *Takifugu oblongus*) ইত্যাদি বেশি চোখে পড়ে।

চিত্র ২৪: ডোরা পটকা (Lattice blaasop, *Takifugu oblongus*)

৩. ক্রাস্টাশিয়ান

৩.১ চিংড়ি (Shrimp)

চিত্র. Metapenaeus monoceros

চিত্র. Penaeus monodon

বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চল থেকে মোট ৩৬ প্রজাতির চিংড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এসব চিংড়ি প্রজাতির আহরণের জন্য মোট ৩৫ টি বাণিজ্যিক ট্রলার এবং অসংখ্য আর্টিসানাল বোট বঙ্গোপসাগরে নিয়োজিত। অধিক মূল্য এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য হওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের বিস্তার লাভ করেছে। বঙ্গোপসাগরে আহরিত চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে বাগদা চিংড়ি বা Tiger Shrimp (*Penaeus monodon*), **হরিণা চিংড়ি** (*Metapenaeus monoceros*), সাদা চিংড়ি (*P. indicus*), বাঘাতারা চিংড়ি (*P. semisulcatus*), কোলা চিংড়ি (*Penaeus merguiensis*), ডোরাকাটা চিংড়ি (*P. japonicus*), ইচা (*Acetis sp.*), কুচো চিংড়ি (*M. brevicornis*) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপকূলীয় অঞ্চলের আর্টিসানাল আহরণের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আসে চিংড়ি হতে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সামুদ্রিক জলাশয় হতে ৪৮৮৪৭ মে.টন চিংড়ি আহরিত হয় এবং ৩৬১৬৮ মে.টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করা হয় যার মূল্য ৩৫২৭.০৭ কোটি টাকা (তথ্যসূত্র: জাতীয় মৎস্য সংকলন, ২০১৯)। বঙ্গোপসাগরের উপকূলের তীরবর্তী অঞ্চল, নদীর মোহনা, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন এবং সুন্দরবন অঞ্চলের কাছাকাছি, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (ফিশিং গ্রাউন্ড) অঞ্চল চিংড়ি প্রধান প্রাপ্তিস্থান।

৩.২ লবস্টার (Lobstar)

চিত্র. *Panulirus versicolor*

লবস্টার ক্রাস্টাসিয়ানদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী। লবস্টার অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বিশ্বজুড়ে সমাদৃত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হওয়ায় অর্থনীতিতে এর ভূমিকা অপরিহার্য। বাংলাদেশে ৮ প্রজাতির লবস্টার এর অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে *Panulirus polyphagus, P. versicolor, P. homarus homarus, P. ornatus এবং Thenus orientalis* বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশ ইতোমধ্যে লবস্টার চাষ শুরু করেছে। বাংলাদেশেও এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। লবস্টার বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং সাধারণত শ্রিম্প ট্রলার এর দ্বারা আহরিত হয়। লবস্টার সাগরে ৩০ থেকে ৫০ মি. গভীরতায় এবং ৩৩ থেকে ৩৬ পিপিটি লবণাক্ততায় পাওয়া যায়।

৩.৩ কাঁকড়া (Crab)

কাঁকড়া, লবস্টার ও চিংড়ির ন্যায় ডেকাপড বর্গের অন্তর্গত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত সমুদ্রে প্রাপ্ত কাঁকড়ার মধ্যে ১৫ প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাঁকড়া প্রজাতি হল মাড ক্রাব বা জাত কাঁকড়া (*Scylla olivacea*) এবং নীল সাতাড়ু কাঁকড়া (*Portunus pelagicus*). অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে বাণিজ্যিক ভাবে আহরিত কাঁকড়ার প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Scylla serrata, *Calappa lophos Matuta lunaris Charybdis feriatus*, *Charybdis hellerii Portunus sanguinolentus* ইত্যাদি।

চিত্র. *Neptunus sangulnolentus*

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাঁকড়া ও ইল রপ্তানি করা হয় ১১৪৩৫ মে.টন এবং এর মূল্য ছিল ২১৭.৫৩ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়ার চাষ ইতোমধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়েছে। বাংলাদেশে খাঁচায় এবং পেনে কাঁকড়া চাষের প্রসার হচ্ছে তবে কাঁকড়ার পোনা (জুইয়া) এর উৎসের জন্য এখনও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল। হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে এখনও আশানুরূপ সফলতা পাওয়া যায়নি।

অধিবেশন: বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: মৎস্য গ্রুপভিত্তিক

ছোট দলীয় কাজ

কাজের ধারা: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশিক্ষণার্থীগণ ৪টি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিম্নের অনুশীলনীর সমাধান করবেন।

অনুশীলনী:

১) প্রতিটি দল একটি পোস্টার পেপারে ইকোসিস্টেমের জন্য এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ৫টি তরুণাস্থিময় মাছ/অস্থিময় মাছ (২ দল)/ক্রাস্টাশিয়ান প্রজাতির অগ্রাধিকার তালিকা (বাজারমূল্য, উৎপাদন এবং চাহিদার ভিত্তিতে) তৈরি করবে।

২) প্রতিটি দল স্ব স্ব গ্রুপের মাছ/ক্রাস্টাশিয়ান সমূহের আবাসস্থল (জোন) এবং প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন: ১.৬	সময়: ১৫.১৫-১৬.১৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: অপ্রচলিত

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে প্রাপ্ত অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ বিশেষভাবে সি-উইডের প্রজাতিসমূহ, পুষ্টিগুণ, চাষের উপযুক্ত স্থান, চাষের সময় ও পদ্ধতি, আহরণ, বাজারজাতকরণ ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা সী উইডসহ এদেশের সমুদ্রে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- বাংলাদেশে প্রাপ্ত সীউইডের প্রজাতিসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সীউইড চাষের উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সীউইড আহরণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সীউইডের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত অন্যান্য অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে বলতে পারবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• বাংলাদেশে প্রাপ্ত সীউইডের প্রজাতিসমূহ • বাংলাদেশে সি-উইড চাষ পদ্ধতি, আহরণ ও বাজারজাতকরণ • সি-উইড এর বহুল ব্যবহার • বাংলাদেশে সমুদ্রে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর, ভিডিও ক্লিপ/কেস স্টাডি, ও পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: লিফলেট, মানচিত্র, আলোকচিত্র, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: অপ্রচলিত

বঙ্গোপসাগর সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে অনন্য একটি অঞ্চল। সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলের কারণে এই অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য অত্যধিক লক্ষ্যণীয়। অধিক পরিমাণ মাছের প্রজাতির পাশাপাশি এই অঞ্চল সেলফিশ, সেফালোপড, সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রভৃতি অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদে পরিপূর্ণ। সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, লবস্টার অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের পাশাপাশি আমাদের সমুদ্রে কিছু অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আছে যারা সমুদ্রের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি, বাস্তুসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সম্পদের মধ্যে কিছু প্রজাতি বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ব বহন করে এবং সেই অঞ্চলে মানুষের কাছে খাদ্য বা ঔষধি গুণের জন্য গৃহীত। আমাদের দেশে এসব অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের মধ্যে রয়েছে সী উইড বা সমুদ্র শৈবাল, সেফালোপড, কোরাল, ওয়েস্টার, সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি

সি-উইড

সি-উইড হলো একপ্রকার সামুদ্রিক ম্যাক্রো অ্যালজি যেটি সমুদ্রের অল্প গভীরতায় শক্ত বা পাথুরে অবলম্বনে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে। সি-উইড অতি আদিম প্রজাতির উদ্ভিদ যাদের সত্যিকারের শিকড়, কাণ্ড ও পাতা নেই এবং তারা হোল্ডফাস্ট নামক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে তলদেশের সাথে লেগে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণিদের খাবারের উৎস ও বাসস্থান প্রদান করে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে সি-উইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া নিউট্রিয়েন্ট বায়োএক্সট্রাকশন ও বাফারিং এর মাধ্যমে সি-উইড পানির নিউট্রিয়েন্ট এর ভারসাম্য রক্ষা করে। সি-উইড এ রয়েছে উন্নতমানের পুষ্টিগুণ। প্রায় সব ধরণের ভোজ্য সি-উইডে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, কপার, আয়রন সহ প্রচুর খনিজ পদার্থ। সি-উইড খুব কম ক্যালরি ও ফ্যাট সমৃদ্ধ এবং প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন (ভিটামিন B, D, E, K এবং ফলিক এসিড) এর গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সি-উইড এ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ গরুর দুধের চেয়ে দশগুণ বেশি এবং একইসাথে ভিটামিন D উপস্থিত থাকার ফলে ক্যালসিয়ামের আত্তীকরণ ভালো হয়। অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড থাকার কারণে সি-উইডের প্রোটিন অত্যন্ত উন্নতমানের হয়। সি-উইড অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের ভালো উৎস যা হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সি-উইড এ রয়েছে প্রয়োজনীয় এনজাইম যা ভালো হজমে সাহায্য করে। সি-উইড এ থাকা উপাদানসমূহ উচ্চ রক্তচাপ, কোলস্টেরল, টিউমার, গলগণ্ড ও স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কিছু প্রজাতির সি-উইড এর ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার প্রতিরোধেও কার্যকরী ভূমিকার প্রমাণ রয়েছে।

প্রধানত লাল, সবুজ ও বাদামী এই তিন রঙের সি-উইড পাওয়া যায় সমুদ্রে। সতের শতাব্দীতে জাপানে প্রথম সি-উইড এর চাষ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হতে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ জনপ্রিয় হয়। জাপানের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য এশিয়ান দেশসমূহে সি-উইড এর চাষ বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সি-উইডের বার্ষিক চাহিদা ১৬ মিলিয়ন টন যার শতকরা ৯৯ ভাগই এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। চীন একাই বর্তমান চাহিদার অর্ধেক পরিমাণ সি-উইড উৎপাদন করে। বর্তমানে বিশ্বে সি-উইড উৎপাদনে আটটি শীর্ষ দেশ হলো চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া এবং তাঞ্জানিয়া এবং বিশ্বের ৯৪% সি-উইড অ্যাকুয়াকালচার হতে আসে। বাংলাদেশে চাষকৃত সবচেয়ে পরিচিত সি-উইড হলো *Hypnea sp* যা এক প্রকারের রেড সি-উইড। এর উচ্চমাত্রায় তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং আলোর তীব্রতা সহ্য করতে পারার ক্ষমতা একে বাংলাদেশের মু-ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলে চাষের উপযোগী করে তুলেছে।

বাংলাদেশের ৭১০ কিমি ব্যাপি সমুদ্র সৈকত, ২৫ হাজার বর্গ কি.মি .উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে পরিকল্পিত বাণিজ্যিকভাবে সি-উইড চাষ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখতে পারে। মাছের পাশাপাশি এ সি-উইড চাষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে পারে বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমির মূল কর্মকাণ্ড। কার্যকরী ভুমিকা নিলে সি-উইডই হতে পারে আগামী দিনের বাংলাদেশিদের পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস।

চিত্র ১: প্রধান তিন প্রকার: বাদামী, সবুজ ও লাল সি-উইড (উৎস: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, ২০১৯)

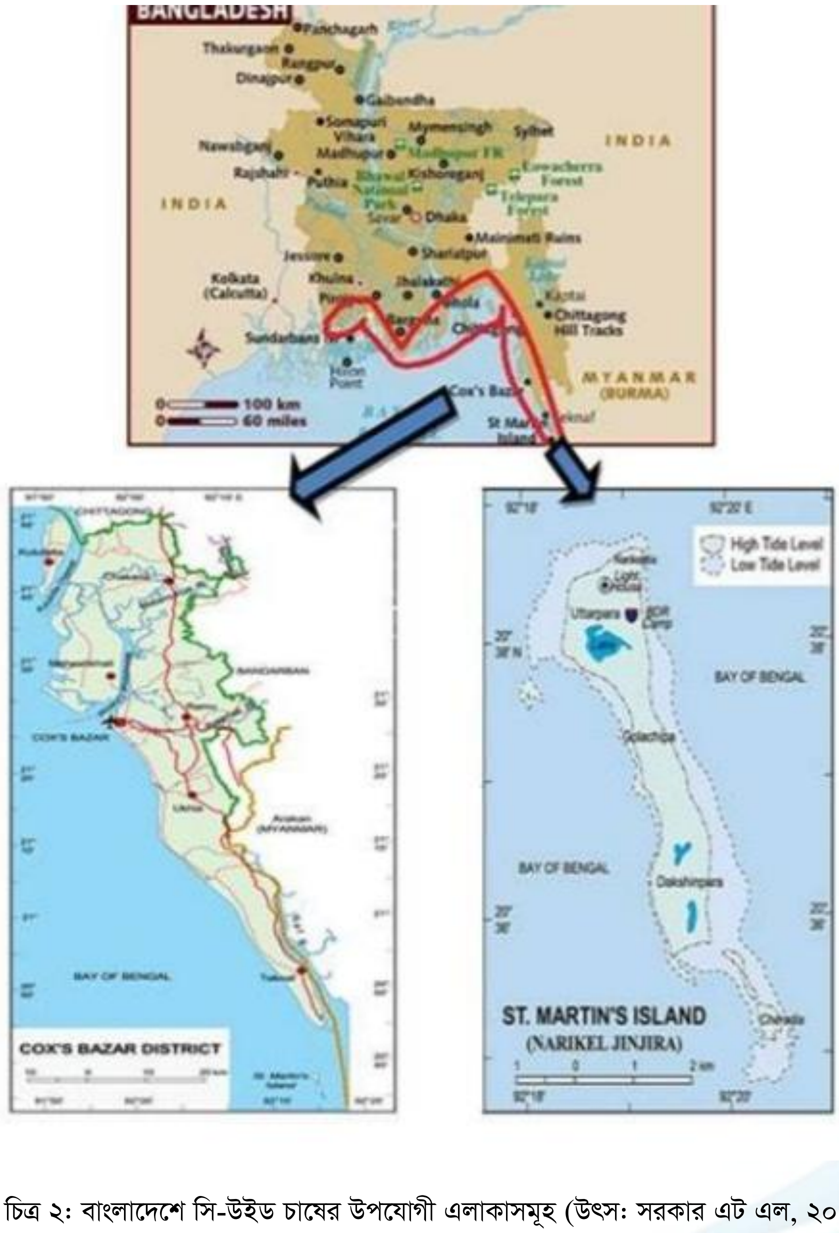

চিত্র ২: বাংলাদেশে সি-উইড চাষের উপযোগী এলাকাসমূহ (উৎস: সরকার এট এল, ২০১৬)

বাংলাদেশে ৯৪ জেনেরার ১৯৩টি প্রজাতির সি-উইড পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৫৫টি কক্সবাজার এলাকায়, ১৪০ টি সেন্টমার্টিন এলাকায় এবং ৬০টি সুন্দরবন এলাকায়। এই সি-উইডের মধ্যে ১৪টি জেনেরার ১৯টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যার তালিকা নিম্নরূপ: (উৎস: সরকার এট এল, ২০১৬)

Sl. No.	Genus	Species	Type
1	*Caulerpa*	*Caulerpa racemosa* *Caulerpa sertularioides*	Green Seaweed
2	*Enteromorpha*	*Enteromorpha intestinalis* *Enteromorpha moniligera*	Green Seaweed
3	*Gelidiella*	*Gelidiella tenuissima*	Red Seaweed
4	*Halymenia*	*Halymenia discoidea*	Red Seaweed
5	*Hypnea*	*Hypnea pannosa* *Hypnea valentiae* *Hypnea musciformis*	Red Seaweed
6	*Hydroclathrus*	*Hydroclathrus clathratus*	Brown Seaweed
7	*Sargassum*	*Sargassum oligocystum* *Sargassum coriifolium*	Brown Seaweed
8	*Gelidiella*	*Gelidiella tenuissima*	Red Seaweed
9	*Gelidium*	*Gelidium pusillum*	Red Seaweed
10	*Padina*	*Padina tetrastromatica*	Brown Seaweed
11	*Catenella*	*Catenella* spp.	Red Seaweed
12.	*Porphyra*	*Porphyra* spp.	Red Seaweed
13.	*Gelidium*	*Gelidium amansii*	Red Seaweed
14.	*Codium*	*Codium fragile*	Green Seaweed

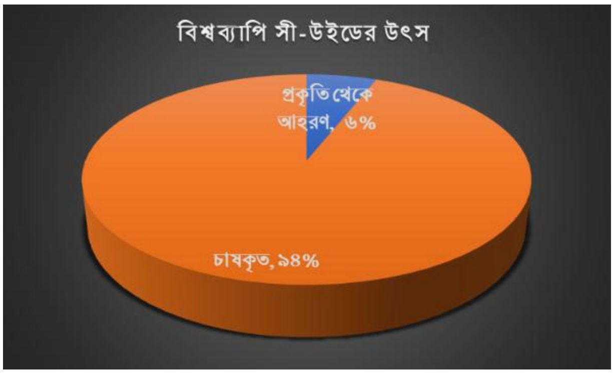

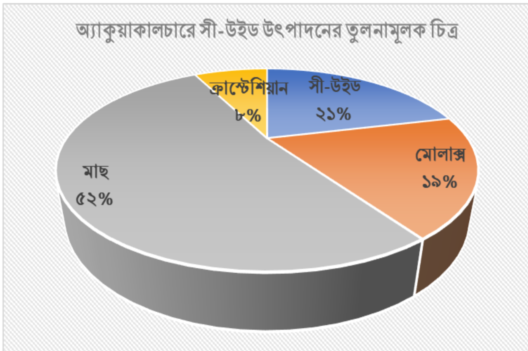

চিত্র ৩: পৃথিবীতে সি-উইড উৎপাদনে প্রাকৃতিক উৎস ও অ্যাকুয়াকালচারের অংশ এবং এর পরিমাণগত অংশ (FAO, ২০১৮)

বাংলাদেশে সি-উইড চাষ পদ্ধতি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত লং লাইন বা রোপ, ভাসমান র‍্যাক, ভাসমান ও স্থায়ী খাঁচা এবং ঝুলন্ত নেট এসব কাঠামোতে সি-উইড চাষ করা হয়। 'অফ বটম' বা তলদেশ থেকে উপরে এবং 'অন বটম' বা তলদেশের সাথে সংযুক্ত এই দুই পদ্ধতিতেই সি-উইড চাষ করা হয়। নিরক্ষীয় এলাকায় সি-উইড চাষ করার জন্য ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, শক্ত বা পাথুরে তলদেশ, লবণাক্ত ও মোটামুটি স্বচ্ছ পানি এবং পানির উপযুক্ত পরিচলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ফসল চাষের তুলনায় সি-উইড চাষের খরচ তুলনামূলকভাবে কম। কারণ এখানে কোন সার, কীটনাশক ও দেখাশোনার খরচ এর প্রয়োজন হয়না। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, উপযুক্ত পরিবেশে ও কাঠামো নির্মাণ করে আমাদের দেশে কক্সবাজার উপকূলে প্রতি চার বর্গমিটারে মাত্র ১,২০০ টাকা ব্যয় করে প্রতি ১৫ দিনে ৬০ থেকে ৮০ কেজি সি-উইড উৎপাদন সম্ভব এবং সময়কাল অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই ছয় মাস সি-উইডের বৃদ্ধি খুবই দ্রুত হওয়াতে প্রতি মাসে দুই/তিনবার সংগ্রহ করা যায়। প্রতি বর্গমিটারে সি-উইড উৎপাদন এর গড় খরচ ২০০ টাকা এবং উৎপাদিত সি-উইড এর মূল্য গড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। সি-উইড প্রধানত শুকনো অবস্থাতে খাদ্য হিসেবে অধিক জনপ্রিয়। ২০০ কেজি সি-উইড শুকিয়ে ৪০ কেজি শুকনো সি-উইড পাওয়া যায় যার দাম ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা, যেখানে প্রতি মণ কাঁচা সি-উইডের দাম ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকা। তবে এই দাম সি-উইডের প্রজাতিভিত্তিক বিভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা সি-উইড চাষের জন্য সম্ভাবনাময়।

বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় ইতোমধ্যে সি-উইড চাষ আরম্ভ হয়েছে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ আরম্ভ হয়েছে। সারা বাংলাদেশের উপকূল হতে প্রতি বছর অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস এর মধ্যে প্রায় ৫,০০০ মে. টন সি-উইড আহরিত হয় (উৎসঃ সরকার এট এল, ২০১৬)।

সি-উইড চাষের অসুবিধা

সি-উইড চাষের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে যেমনঃ সমুদ্রের তলানি/পলি জমা, সাগরের শক্তিশালী ঢেউ এবং ভাটা সি-উইড চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অভাব, পর্যাপ্ত দেশীয় বাজার সৃষ্টি না হওয়া, প্রযুক্তিগত দক্ষ মানুষের অভাব ইত্যাদি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও লাভজনক সি-উইড চাষকে ব্যাহত করতে পারে। ব্যাপক সম্ভাবনাময় সি-উইড এর চাষ সম্প্রসারিত করতে হলে বাংলাদেশকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে যেমনঃ সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সংকট, দক্ষ জনশক্তির অবমূল্যায়ন, অভিজ্ঞ চাষি ও উদ্যোক্তার অভাব, প্রয়োগিক গবেষণার অপর্যাপ্ততা, খাদ্য হিসেবে সি-উইডের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি।

চিত্র ৪: ভাসমান রোপ বা লং লাইন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের কক্সবাজারের নুনিয়ার ছড়া এলাকায় সি-উইড চাষ

চিত্র ৫: বাংলাদেশের খেপুপাড়া, পটুয়াখালী এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে সি-উইড চাষের জন্য নেট স্থাপন

সি-উইড এর গুরুত্ব ও ব্যবহার

সি-উইড থেকে অ্যাগার, ঔষধ, সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য উপকরণ, প্রসাধণী এবং খাবার ও কাপড়ের রঙ তৈরি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সি-উইড সমূহ কাগজ ও কাপড়, ইমালসিফায়ার, জেল ও ঘনীকরণ পাওডার, আঠা, প্যাকেটের আবরণ, সিরামিকের গ্লেজ, চামড়াজাত বস্তুর পলিশিং উপাদান এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যের বাইন্ডার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সি-উইড উত্তম খাদ্য এবং ফাংশনাল ফুড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের স্যুপ তৈরিতে সি-উইড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী মাছ, শুঁটকি ও অন্যান্য সবজির সাথে সি-উইড রান্না করে খায়। তাছাড়া তারা স্যুপ, সস, পিঠা, সালাদ, চানাচুর এসব তৈরিতেও সি-উইড ব্যবহার করে থাকে।

চিত্র ৬: সি-উইড হতে তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য

সি-উইড বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম

বাংলাদেশে সি-উইড চাষ প্রসার এর লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট' (BARI) এর খামার ভিত্তিক গবেষণা বিভাগ এর আওতায় নুনিয়ার ছড়া এলাকার কৃষকদের সি-উইড চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সেখানে মুলত Hypnea sp এর চাষ করা হয়। কক্সবাজারে অবস্থিত সি-উইড ল্যাবরেটরিতে সি-উইডের টিস্যু কালচার এবং সি-উইডের বীজ উৎপাদন সহ

অন্যান্য গবেষণা চলমান রয়েছে। গত বছর বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্ট এসোসিয়েশন (BAEA) এর "Potential of Blue Economy in Transforming Future Bangladesh" শীর্ষক আলোচনায় বাংলাদেশে ব্লু- ইকোনমি ও ব্লু-বায়োটেকনোলজি এর প্রসারে সি-উইডের সম্ভাব্য ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ব্লু- বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সি-উইডের বীজ উৎপাদন, সি-উইড হতে অতিমূল্যবান প্রাকৃতিক উৎসজাত স্বাস্থ্যকর খাদ্য (Functional Food) ও বিভিন্ন ঔষধ এবং প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করা যায় যা আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (FAO) এর প্রজেক্ট Technical Cooperation Programme (TCP) বাংলাদেশে সি-উইডের বর্তমান উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাত ও রপ্তানির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এবং সি-উইডের চাষ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ও একটি জাতীয় নীতিমালা ও অবকাঠামো নির্ধারণে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলায় সি-উইডের চাষ সম্প্রসারণ ও গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র ৭: ভিয়েতনামের চিংড়ি ঘেরে সি-উইড চাষ ও আহরণ

আমাদের উপকূলীয় এলাকা সি-উইড উৎপাদনের জন্য সমূহ সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশে সি-উইডের চাষ জোরদার করলে তা দেশের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। সি-উইডের চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। বিশেষভাবে নারীদের জন্য সি-উইডের চাষ একটি লাভজনক ক্ষেত্র তৈরি করবে। উপকূলীয় এলাকায় মলাস্ক, চিংড়ি, কাঁকড়া ও সামুদ্রিক মাছের সাথে সি-উইডের পলিকালচার করার উত্তম সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও চিংড়ির সাথে সি-উইডের সমন্বিত চাষ করার মাধ্যমে চিংড়ি চাষের বর্জ্য প্রাকৃতিকভাবেই পরিশোধন সম্ভব। আমরা প্যাথলজি, খাবার এবং ঔষধ শিল্পে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে যে পরিমাণে আগার আমদানি করে থাকি তা আমাদের দেশীয় সি-উইড থেকেই উৎপাদন সম্ভব এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। আমাদের দেশে যদি কাপড় ও কাগজ তৈরিতে চাষকৃত সি-উইড ব্যবহার করা যায় তবে তা কাপড় ও কাগজশিল্পের জন্য বনভূমি ধ্বংস রোধে হবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সি-উইডের চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে চিংড়ির পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড এর একটি বড় সম্ভাবনাময় খাতের সৃষ্টি হবে।

ডলফিন (Dolphin)

সামুদ্রিক ডলফিন Cetacea বর্গের Delphinidae গোত্রের অন্তর্গত জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী। সারাবিশ্বে সামুদ্রিক ডলফিন প্রজাতির সংখ্যা ৩৫ বাংলাদেশে ডলফিন জাতীয় প্রজাতির সংখ্যা ১১। ডলফিন সারা বিশ্বজুড়ে খুবই আকর্ষণীয় একটি প্রাণি এবং বিশ্বব্যাপী এ্যাকুয়াপার্কে ডলফিন/তিমি দেখা যায়। বাংলাদেশের সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড অঞ্চলের গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন এর দেখা মেলে এছাড়াও সুন্দরবনের মোহনা অঞ্চলে ডলফিনের দেখা পাওয়াা যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ডলফিনের মধ্যে ইরাবতি ডলফিন (Orcaella brevirostris), বোতলনাক ডলফিন (Delphinus delphis), চিত্রা ডলফিন, ঘুনি ডলফিন, বেশি পরিমাণে লক্ষণীয়।

সমুদ্র দূষণসহ বিভিন্ন কারণে এদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সমুদ্রে ডলফিন এর চারণক্ষেত্র সমুহে সাধারণত মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয় । বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ডলফিন, তিমি এবং হাঙ্গর সংরক্ষণের জন্য সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে ১৭২৮ বর্গ কি.মি এলাকাকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সেফালোপড (Cephalopod)

মলাস্কা পর্বের অন্তর্গত সেফালোপডা শ্রেণির সকল প্রাণীই এর অন্তর্গত। এর মধ্যে আছে অক্টোপাস, স্কুইড, কাটলফিশ। বাংলাদেশে ৭ প্রজাতির সেফালোপড পাওয়া যায়। সেফালোপড সমুদ্রে প্রাণীসমুহের মধ্যে একটি বিশাল অংশজুড়ে অবস্থান করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এদের অবদান অনস্বীকার্য। সমুদ্রে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন প্রাণী যেমন বড় মাছ, তিমি, হাঙ্গর, সামুদ্রিক পাখি এদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে সেফালোপড আকর্ষণীয় খাদ্য হিসেবে সমাদৃত। বাংলাদেশেও বাণিজ্যিক ভাবে সেফালোপড আহরণ করা হয়। সমুদ্রে এদের পরিমাণ অত্যাধিক হওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ সেফালোপড থেকে আসে। বাংলাদেশ থেকে সেফালোপড রপ্তানিও করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই ক্যাটাগরিতে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ২১৯.৭৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ।

চিত্র ৮: *Uroteuthis duvauceli*

চিত্র ৯: *Sepia aculeata*

ওয়েস্টার (Oyester)

ওয়েস্টার হচ্ছে দুই খোলকবিশিষ্ট ঝিনুক যা উষ্ণ অঞ্চলে অগভীর সমুদ্রের তলদেশে পাওয়া যায়। এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন pearl oyster, slipper shell, cup oyster, hammer oyster। দুই খোলক বিশিষ্ট খাদ্য উপযোগী ঝিনুকের চাষ বিশ্বজুড়ে খুবই জনপ্রিয় একটি চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশেও এর সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু কিছু ওয়েস্টার থেকে প্রাকৃতিক মুক্তাও পাওয়া যায় এবং কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনে (মুক্তা চাষ) এসব ওয়েস্টার ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার ফলে অর্থনৈতিকভাবে এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের খোলস থেকে বাণিজ্যিকভাবে চুনও উৎপাদন করা হয়। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় প্রচুর প্রজাতির ঝিনুক পাওয়া যায়। এরা সাধারণ ফিল্টার ফিডার অর্থাৎ ছাকন পদ্ধতিতে খাদ্য সংগ্রহকারী। এদের চাষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ উচু জোয়ারের ব্যাপ্তি, জোয়ার-ভাটার পর্যাপ্ত স্রোত, ম্যানগ্রোভ বনের উপকূল ভাগ, দূষণমুক্ত অঞ্চল, উপযুক্ত লবণাক্ততা প্রয়োজন।

সামুদ্রিক কচ্ছপ

বাংলাদেশে ৫ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রচলিত মৎস্যসম্পদ হিসেবে বিবেচিত না হলেও বিশ্বের কিছু কিছু অঞ্চলে সামুদ্রিক কচ্ছপের চাহিদা রয়েছে। সামুদ্রিক কচ্ছপের পরিমাণ সারাবিশ্বজুড়ে ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তাই কচ্ছপ সংরক্ষণে সারা বিশ্বে প্রচুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রবাল (Coral)

প্রবাল সেলেনটারাটা পর্বভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা এদের বহিঃত্বকের চারপাশে একটি অস্থিময় বস্তু ক্ষরণ করে একটি অতিরিক্ত কঙ্কাল সৃষ্টি করে। উপযুক্ত পরিবেশে (২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাবিশিষ্ট পানি) এসব প্রবালে প্রচুর বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন এসব প্রবালের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাল বাস্তুগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের প্রবাল বা কোরাল রীফ অঞ্চলসমুহে সাধারণ প্রচুর জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। মাছসহ অন্যান্য অনেক প্রাণী প্রবাল অঞ্চলে প্রজনন অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সমুদ্রে সৃষ্টি হওয়া অত্যধিক পুরোন প্রবাল প্রাচীর বায়োহার্ম হিসেবে পরিচিত এবং এগুলোকে পেট্রোলিয়ামের আধার হিসেবে বর্তমানে মনে করা হচ্ছে।

সাগর শসা (Sea Cucumber)

সাগরশসা একধরনের একাইনোডার্মস যা Holothuroidae শ্রেণির অন্তর্গত। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাগরশসা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও এর মেডিসিনাল ব্যবহারও হচ্ছে। আমেরিকান চিকিৎসকগণ সাগরশসার মাধ্যমে ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহারের জন্য গবেষণা চালাচ্ছে। বাংলাদেশে ১ প্রজাতির সাগরশসা পাওয়া গেছে যা সেন্ট মার্টিন উপকূল সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়।

চিত্র ১০: Sea cucumber(সূত্র. Asian Scientist magazine)

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ৩ কোটির অধিক মানুষ তাদের জীবনযাত্রার জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য প্রচলিত সমুদ্র সম্পদের পাশাপাশি অপ্রচলিত সমুদ্র সম্পদের কাঙ্ক্ষিত আহরণ ও চাষ এখন সময়ের দাবি। অপ্রচলিত সমুদ্রসম্পদ সি-উইডকে বহুল প্রচলিত ও লাভজনক সমুদ্র সম্পদে পরিণত করতে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক গবেষণার প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

1. Sarker MSI, M Kamal, MM Hasan and MI Hossain, 2016. Present status of naturally occurring seaweed flora and their utilization in Bangladesh. Res. Agric. Livest. Fish. 3(1):203-216.
2. DoF.2019. National Fish Week 2019 Compendium (in Bangla). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 160p.

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন: ২.১	সময়: ০৯.০০-০৯.৩০	মেয়াদ: ৩০ মিনিট

অধিবেশন শিরোনাম: প্রাত্যহিক পুনরালোচনা ও প্রতিভাব এবং সান্ধ্যকালীন দলীয় কাজের উপস্থাপনা

শিরোনাম: প্রাত্যহিক পুনরালোচনা ও প্রতিভাব এবং সান্ধ্যকালীন দলীয় কাজের উপস্থাপনা

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের গত দিনের কার্যক্রম ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পুনরালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তাঁরা পূর্বদিনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পুনরালোচনা করে এবং কারো কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে শিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পূর্বদিনের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পুনরালোচনার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা		
১. ২য় দিনে সকলকে স্বাগত জানানো ও কুশল বিনিময়। ২. গতদিনের ভাল-মন্দ বিষয়গুলো জানা ও সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি করা। ৩. চলতি অধিবেশনের আলোকপাত ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা। ৪. এ অধিবেশনের আওতাভুক্ত বিষয়বস্তু, কার্যক্রম ও সময় সম্পর্কে জানানো।	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু		
১. পূর্বদিনের পুনরালোচনা প্রশিক্ষক একজন অংশগ্রহণকারীকে সহায়ক হিসেবে নির্বাচন করবেন যিনি গত দিনের সমস্ত অধিবেশনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরালোচনা করবেন।		
সারসংক্ষেপ		
১. প্রাত্যহিক জার্নাল উপস্থাপন, প্রাত্যহিক পুনরালোচনা ও দলীয় উপস্থাপনায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ২. পরবর্তী অধিবেশনে **"মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও নৌযান"** এর আলোকপাত ও সকলের অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানানো।	বক্তৃতা-আলোচনা	৬ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী	বোর্ড, মার্কার ও প্রস্তুতকৃত দলীয় ফ্লিপচার্ট।	

প্রশিক্ষক বা সহায়কের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা:

বিষয়বস্তু অংশে প্রশিক্ষক বা সহায়ক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর আলোকে কী, কেন, কোথায়, কখন, কার দ্বারা, কিভাবে ও সতর্কতা, বিশেষ বক্তব্য বা নির্দেশনা গুরুত্বসহ উপস্থাপন করবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন: ২.২	সময়: ০৯.৩৫-১০.৩৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও নৌযান**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা এবং মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের নৌযান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা এবং মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের নৌযান সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগাতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক আর্টিসানাল নৌযান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• মৎস্যজীবী/জেলেদের জীবনযাত্রা • বাংলাদেশে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক নৌযান • বাংলাদেশে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক আর্টিসানাল নৌযান	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, ভিডিও ক্লিপ, ও ছোট দলীয় কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, ভিডিও ক্লিপ, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী/জেলে ও নৌযান

১. জেলেদের জীবনযাত্রা

বাংলাদেশের খাদ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় **৩.৫৭%** এ খাত থেকে অর্জিত হয়। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর **১১** শতাংশের অধিক মানুষ মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রায় ৫.১৬ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত। এছাড়া **২০১৮-১৯** অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫০৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার মৎস্যসম্পদ রপ্তানি করে আয় করেছে ।

আবহমানকাল থেকেই এদেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক জীবনধারণের জন্য প্রধানত মৎস্য আহরণ ও তৎসম্পর্কিত পেশার ওপর নির্ভর করে আসছে। গ্রামীণ বাংলাদেশে জেলেরা সাধারণত নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট পাড়া বা গ্রামে অথবা বিভিন্ন গ্রামে, বংশপরম্পরায় বসবাস করে থাকে। মৎস্য আহরণ বা বিপণন ছাড়াও সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপনই জেলেদের চিরায়ত ঐতিহ্যের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। জেলেদের যেমন ইতিহাস রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈচিত্রময় ঐতিহ্য এবং প্রাকৃত ধাঁচের দৈনন্দিন জীবনধারা।

চিত্র ১: জেলেদের জীবনযাত্রা ও জাল-নৌকা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জেলেরা হিন্দুধর্মের অনুসারী। হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাছ ধরার পেশা জাতিভেদ প্রথার সাথে সম্পর্কিত বিধায় তা জন্মসূত্রে নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। বর্তমান কালে মুসলমান জনগণের মধ্যেও এ পেশা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় জীবিকা নির্বাহের জন্য যৌথভাবে মাছ ধরা এবং চাষাবাদের ওপর

নির্ভরশীল। অধিকাংশ জেলে পরিবার মূলত মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল হলেও তারা কৃষিকাজও করে থাকে। তাদের উৎপাদন কৌশল সেকেলে ধরনের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য শিকারিগণ যন্ত্রবিহীন দেশীয় নৌকা এবং প্রচলিত জাল ব্যবহার করে থাকে। তবে সমুদ্রগামী জেলেরা যন্ত্রচালিত নৌকা এবং আধুনিক জালের ব্যবহার করে।

মাছ ধরার কৌশলগত ধরন এবং ঋতুভেদে জেলেদের আয়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। শুকনো মৌসুমের তুলনায় ভরা মৌসুমে মাছের উৎপাদন বেশি হয় বলে জেলেদের আয়ও বেড়ে যায়। আবার একই ঋতুতে মৎস্য আহরণ ও আয় ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আয় অসমতার এ ধরনের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে যে, তারা সাধারণত সমআয়গোষ্ঠীর নয়। বস্তুত, তাদের মধ্যে নিজস্ব অবস্থা উন্নয়নের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে জেলেদের মাঝে বিনিময় প্রথার চেয়ে নগদ বিক্রয় প্রবণতাই বেশি। দৈনন্দিন আহরণ সরাসরি অথবা স্থানীয় ভাবে পরিচিত নিকারি এবং আড়তদারদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। তবে এ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় তারা নিকারি অথবা আড়তদারদের সাথে এমন এক ধরনের সুদমুক্ত ঋণ-সম্পর্ক জালে আবদ্ধ হয় যেখানে এ সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা ওজনের অথবা বাজারমূল্যের হেরফের ঘটিয়ে জেলেদেরকে ঠকিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সহজ-সরল জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমেই পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে মানুষ বাড়ছে অথচ মৎস্য আহরণের উৎসভূমিগুলো সংকুচিত হয়ে আসছে। ফলে জীবিকা নির্বাহের ক্রমবর্ধমান জটিলতা আগের অর্থোপার্জন পদ্ধতি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করছে।

জেলাভিত্তিক উপকূলীয় জেলে/মৎস্যজীবীর সংখ্যা:

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	জেলের সংখ্যা (জন)
০১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর	২,৪৯,১৫৪
০২	বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা	২,৫১,৪২০
০৩	খুলনা	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট	১৬,৪২৪
		মোট	৫,১৬,৯৯৮

২. মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান:

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে প্রধানত দুই ধরণের ফিশিং ফ্লিট যথা: অধিক ক্যাপাসিটি সম্পন্ন আধুনিক সরঞ্জামাদি সহযোগে সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার এর অধিক গভীরতায় ও দূর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ইন্ডাসট্রিয়াল ফিশিং ফ্লিট এবং স্বল্প ধারণ ক্ষমতার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান যা আর্টিশনাল ফিশিং ফ্লিট হিসেবে সমুদ্র ও উপকূলীয় জলাশয়ে সর্বোচ্চ জোয়ারে মূলত ৪০ মিটার গভীরতার মধ্যে মৎস্য আহরণ করে থাকে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় ২৪৭ টি ট্রলার ও ৬৭,৬৬৯ টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে।

২.১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং ফ্লিট:

স্বাধীনতা পূর্ব বিভিন্ন জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় মৎস্য ও চিংড়ির মজুদ সন্তোষজনক প্রতিভাত হওয়ায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ১০টি ট্রলার এর ফ্লিট সহযোগে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক পরিসরে মৎস্য আহরণ প্রবর্তিত হয়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় দেশীয় এবং বিদেশি উদ্যোক্তা উভয়ই মেরিন

সেক্টরে মৎস্য আহরণে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ক্রমধারায় ১৯৭৬-৮৬ সময়কালে দেশীয় উদ্যোক্তা ব্যক্তি মালিকানায় অথবা যৌথ উদ্যোগে বিশেষ করে থাইল্যান্ড এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয় থেকে দায় পরিশোধ (Pay As You Earn-PAYE scheme) পদ্ধতিতে সরকার কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্তির মাধ্যমে ১১৪ টি মৎস্য/চিংড়ি ট্রলার বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হয়। পাশাপশি সরকার ট্রলার ফিশারিকে "Open Industry" হিসেবে ঘোষণা করে। এ সুযোগে বহুসংখ্যক অননুমোদিত ট্রলার বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ে প্রবেশপূর্বক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হয়ে মৎস্যসম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদকে সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আনার লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৩ সালে "The Marine Fisheries Ordinance" and "Marine Fisheries Rules" জারি করে। এ অধ্যাদেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বাস্তবায়নের ফলে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহ পালিয়ে বাংলাদেশের জলাশয় ত্যাগ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ অধ্যাদেশের আওতায় ফিশিং ফ্লিটে নিয়োজিত প্রতিটি ট্রলার সরকার অনুমোদিত প্রক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ এবং মৎস্য আহরণে প্রতি ট্রিপের বিপরীতে সেইলিং পারমিশন গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ করাসহ মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স বাস্তবায়ন শুরু হলে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্র ২: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং ফ্লিট

২.২ চিংড়ি ট্রলারঃ (Shrimp Trawler)

দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে স্থায়িত্বশীল উপায়ে সামুদ্রিক চিংড়ি আহরণ নিমিত্ত সরকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি চিংড়ি ট্রলার পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করে। বর্তমান ট্রলার বহরে নিয়োজিত চিংড়ি ট্রলারসমূহের দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ৩০ মিটার, অশ্বশক্তি ৩৫০-৮৫০ বিএইচপি, জালের কড এন্ড ফাঁস ৪৫ মি.মি. এবং হেডরোপ দৈর্ঘ্য ১৫-৩৫ মিটার সম্পন্ন। চিংড়ি ট্রলার দুই পাশে সম্প্রসারিত কাঠামোর মাধ্যমে (Out riggers) ১ অথবা ২ জোড়া জাল ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৩০ দিন মেয়াদে সমুদ্রে চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত থাকে। এ সকল ট্রলার কর্তৃক অধিক চিংড়ি আহরণ নিমিত্ত জালের বটম লাইনের সাথে টিক্‌লার চেইন ব্যবহার করে থাকে যা বটম আন্দোলিত করে সেখানে অবস্থানরত চিংড়িকে জালে তাড়িত করে। এছাড়া, প্রায় সংকটাপন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য চিংড়ি ট্রলজালে প্রবেশকৃত কচ্ছপ বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দানের লক্ষ্যে জালের কডএন্ডের কাছাকাছি Turtle Excluder Device (TED) সংযোজন করা হয়।

চিত্র ৩: চিংড়ি ট্রলার

বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক ২০০৬-০৭ হতে ২০১৫-১৬ সময়কালে আহরিত চিংড়ির তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে আহরিত মোট চিংড়ি পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট চিংড়ি আহরণ এবং ট্রলার প্রতি আহরণ/দিন (কেজি) (Catch Per Unit Effort-CPUE) বৃদ্ধি পেলেও ২০১৪-১৫ হতে চিংড়ি ট্রলারদ্বারা আহরিত চিংড়ির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আহরিত মোট চিংড়ির মধ্যে বাগদা চিংড়ি প্রায় ৮%, বাদামী চিংড়ি পরিমাণ প্রায় ৬৬%, সাদা চিংড়ি প্রায় ৬% এবং অবশিষ্ট অন্যান্য চিংড়ি প্রায় ২০% আহরিত হয়। সামুদ্রিক চিংড়ি সম্পদের স্থায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে অধিক চিংড়ি আহরণ নিমিত্ত ১৯৯৮ সাল হতে পুরাতন চিংড়ি ট্রলারকে মৎস্য ট্রলার দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম বলবৎ আছে। উল্লেখ্য যে, চিংড়ি ট্রলারে ব্যবহৃত টিকলার চেইন দ্বারা সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়ে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামুদ্রিক চিংড়ির অব্যাহত প্রবৃদ্ধির বজায় রাখার নিমিত্ত ভবিষ্যতে জরিপ ও গবেষণা জাহাজ আর. ভি. মীন সন্ধানী এর সহায়তায় নিবিড় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিংড়ি ট্রলারের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি প্রণিধানে নেয়া যেতে পারে।

২.৩ বটম/ডিমার্সাল ট্রলারঃ (Bottom/Demarsal Trawler)

বিনিয়োগ বোর্ড এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আওতায় মৎস্য আহরণের অনুমতিপ্রাপ্ত মোট ৭৮ টি বটম/ডিমার্সাল প্রকৃতির ফ্রিজার ট্রলার (যা সাদা মাছ, ডিমার্সেল, আধুনিক মৎস্য নামে পরিচিত) মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ছিল। ২০১৪ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.০১২৯.৯১.০৬৭.১৪.১৪৬, তারিখঃ ২৭/০৪/২০১৪ খ্রি. মূলে সকল বটম প্রকৃতির ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তরের নিদের্শের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদনপ্রাপ্ত ৬৫ টি ফ্রিজার বটম প্রকৃতির ট্রলার মিডওয়াটার ট্রলার হিসেবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সমুদ্র তলদেশে ইকোসিস্টেম বিনষ্টসহ মাছের বংশবৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য শিকল বিনষ্ট, নার্সারি গ্রাউন্ড ধ্বংস, অধিক পরিমাণে কিশোর মাছ আহরণের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মৎস্য কূলকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর বহুদেশ বটম ট্রল নিরুৎসাহিত বা নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিতকল্পে ২০১৪ সাল হতে নতুন করে বটম প্রকৃতির ট্রলারের অনুমতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বটম প্রকৃতির ট্রলারগুলোর দৈর্ঘ্য ২৮-৪০ মিটার, যেগুলোর জালের কড এন্ড এ ফাঁস ৬০ মি.মি., ইঞ্জিন ক্ষমতা ৩৫০-১৪৫০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন, বটম লাইনে ববিন সংযোজিত প্রায় প্রতিটি ট্রলার উন্নত নেভিগেইশন সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি যথাঃ ইকোসাউন্ডার, সোনার, নেট রেকর্ডার, ট্রল-আই ইত্যাদি সহযোগে ১৩-৩০ দিন মেয়াদে সর্বোচ্চ জোয়রে ৪০ মিটার গভীরতার উর্দ্ধে সমুদ্র তলদেশের মৎস্য আহরণ করে থাকে।

চিত্র ৪: বটম/ডিমার্সাল ট্রলার

২.৪ মিডওয়াটার ট্রলারঃ (Midwater Trawler)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩৪ টি মিডওয়াটার ট্রলারের অনুমতি প্রদান এবং সর্বশেষ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশে ট্রলার বহরে পরিচালিত সকল বটম ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তরের প্রেক্ষিতে ৬৫ টি ট্রলার মিডওয়াটারে রূপান্তর করায় বর্তমানে সর্বমোট ১০৮টি ট্রলার মিডওয়াটার ফিশিং-এ নিয়োজিত আছে। প্রতিটি মিডওয়াটার ট্রলার আধুনিক নেভিগেশন, সেফইটি ইকুইপমেন্ট, অত্যাধুনিক মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি যথা: ইকোসাউন্ডার, সোনার, ট্রল আই ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মৎস্য আহরণ করে থাকে। এ সকল ট্রলারে ব্যবহৃত জালের হেড রোপ ৭০-১১০ মিটার, গ্রাউন্ড রোপ ৭১-১১০ মিটার যা মৎস্য আহরণকালে ৩০ মিটার পর্যন্ত ভার্টিকেল ওপেনিং এর মাধ্যমে সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ না করে মূলত ৬০-৮০ মিটার গভীরতায় এবং দূর সমুদ্রে ভাসমান পেলাজিক প্রজাতির মৎস্য আহরণ করে থাকে।

চিত্র ৫: মিডওয়াটার ট্রলার

মৎস্য আহরণের নিয়োজিত মিডওয়াটার ট্রলার কর্তৃক আহরণ হার (CPUE) বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রকৃতির ট্রলার অন্যান্য প্রকৃতির ট্রলার অপেক্ষা কার্যকর ও দক্ষতার সাথে অধিক পরিমাণ মৎস্য আহরণ করতে সক্ষম। মিডওয়াটার ট্রলার সহযোগে মধ্যস্তরের এবং পেলাজিক মৎস্য আহরণ করায় সমুদ্র তলদেশের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুন্ন রেখে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং কিশোর মাছ রক্ষার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এ প্রকৃতির ট্রলার দ্বারা অতিঅভিপ্রয়ানশীল আন্তঃদেশীয় সমুদ্র জলাশয়ে বিচরণরত মৎস্য প্রজাতি যেমনঃ সার্ডিন, আইল্যা, সুরমা, ইলিশ, চাঁপাকড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির টুনা ইত্যাদি অধিক হারে আহরণ করা সম্ভব হয় যা মূল্যবান চিংড়ি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ তলদেশীয় (বটম) প্রজাতির মাছের রিক্রুটমেন্টে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে সামুদ্রিক মাছের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বর্তমান ট্রলার বহরে মিডওয়াটার ট্রলার সংযোজিত হওয়া পরবর্তী ২০০৭-০৮ হতে ২০১৫-১৬ সলে পর্যন্ত মোট আহরিত মৎস্য ও মৎস্য আহরণ হার (CPUE) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে এ প্রকৃতির ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক।

বর্তমান বাংলাদেশের সমুদ্র সম্পদ সর্ম্পকে সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ এবং নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ ও কারিগরি সহযোগিতায় “সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা জাহাজ আর ভি মীনসন্ধানীর বঙ্গোপাসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২.৫ লং লাইনার ও পার্স সিনার (Long Liner and Purse-seiners)

১৯৭৮-৭৯ সালে ড. ফ্রিডজ্জফ নানসেন জরিপ জাহাজের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে এ্যাকুইসটিক (acoustic) জরিপের মাধ্যমে উপরিস্তরের মাছ মজুদের পরিমাণ ৬০,০০০- ১,২০,০০০ মে. টন নিরূপণ করা হয়। বিগত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭ সময়কালে BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation) ভুক্ত দেশ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত জরিপ ফলাফলে বঙ্গোপসাগরের গভীরে এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাহিরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় পেলাজিক লংলাইনার দ্বারা বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় মূল্যবান বড় আকারের অভিপ্রয়ানশীল পেলাজিক মৎস্য যথা: হলুদ পাখনা টুনা Yellow Fin Tuna, *Thunnus albacaires*), তরবারী মাছ (Swordfish, *Xiphias gladius*), স্কীপজেক টুনা *(Katsuwonus pelamis)* সেইলফিস, ব্লুমার্লিন প্রজাতির মাছের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে ট্রলার এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক আহরিত মাছের মধ্যে নন-টার্গেটেড মাছ হিসেবে ৫০০০-৬০০০ মে. টন বিভিন্ন প্রজাতির টুনা ও মেকারেল আহরিত হচ্ছে। টুনা জাতীয় পেলাজিক প্রজাতির মৎস্য আহরণের কারিগরি সামর্থ্য ও দক্ষ জনবলের সংকট থাকায় অতীতে ট্রলার বহরে টুনা লংলাইনার সংযুক্তির উদ্যোগ নেয়া হলেও আগ্রহী উদ্যোক্তার অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি (এপ্রিল ২০১৬) বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা আহরণকারী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি সামর্থ কাজে লাগিয়ে তাদের সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে বর্তমান ট্রলার বহরে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ টুনা ও টুনা জাতীয় অভিপ্রয়ানশীল প্রজাতির মাছ আহরণের জন্য ৯ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ১০ টি লং লাইনার প্রকৃতির ট্রলার ও ৭ টি পার্স-সেইনার টাইপ ট্রলার -এর ফিশিং লাইসেন্স-এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৬ মৎস্য আহরণে অনুমতি প্রাপ্ত ট্রলার (Present Status of Approved Fishing Trawler)

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার সহযোগে মৎস্য আহরণ নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহামান্য হাইকোর্ট-এর রায়/আদেশের মাধ্যমে ট্রলার বহরে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ২৪৭ টি বাণিজ্যিক ট্রলার সংযুক্ত থেকে মৎস্য আহরণের অনুমতি পেয়েছে। চিংড়ি, বটমওয়াটার, মিডওয়াটার এবং মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে রায়/আদেশপ্রাপ্ত ট্রলার দ্বারা ট্রায়াল ট্রিপের আওতায় সর্বশেষ ২০১৫-১৬ আর্থিক সালে ২০০ টি ট্রলার আহরণে নিয়োজিত ছিল। ট্রলার বহরে অনুমতিপ্রাপ্ত অবশিষ্ট ট্রলারগুলো স্ক্র্যাব, চলাচলের অনপুযোগী, ডুবে যাওয়া ইত্যাদি কারণে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নেই। বর্তমান ট্রলার বহরে অনুমতিপ্রাপ্ত ২৪৭ টি ট্রলার এর সংযুক্তির উৎস সহ সর্বশেষ অবস্থা নিম্নে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৯৮৩-৮৪ হতে ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত ট্রলার বহরে বিভিন্ন প্রকৃতি/টাইপের ট্রলার সংযুক্তির ক্রমধারা নিম্নরূপ:

টলারের প্রকৃতি	১৯৮৪-১৯৮৫		১৯৯৫-১৯৯৬		২০০৭-০৮		২০১১-২০১২		২০১৫-২০১৬	
	অনুমতি প্রাপ্ত (সংখ্যা)	আহরণে নিয়োজিত (সংখ্যা)	অনুমতি প্রাপ্ত (সংখ্যা)	আহরণে নিয়োজিত (সংখ্যা)	অনুমতি প্রাপ্ত (সংখ্যা)	আহরণে নিয়োজিত (সংখ্যা)	অনুমতি প্রাপ্ত (সংখ্যা)	আহরণে নিয়োজিত (সংখ্যা)	অনুমতি প্রাপ্ত (সংখ্যা)	আহরণে নিয়োজিত (সংখ্যা)
চিংড়ি	৩২	২৮	৪৪	৪১	৪২	৩৮	৩৯	৩৩	৩৭	৩০
বটম ট্রলার	৩১	২২	১৪	১২	৫৯	৪৬	৯৯	৯১	৬০	৪৭
মিড ওয়াটার	--	--	--	--	১০	১০	১১	১১	১০৮	৯১
ট্রায়াল ট্রিপ	--	--	--	--	৩১	৩০	৩৩	২৭	৪২	৩৬
স্কুইড	--	--	--	--	০২	০২	৪	০৩	--	--
মিক্সড	২৮	২৩	--	--	--	--	--	--	--	--
লং লাইনার	--	--	--	--	--	--	০৩	--	--	--
মোট	৯১	৭৩	৫৮	৫৩	১৪৪	১২৬	১৮৯	১৬৫	২৪৭	২০৪

২.৭ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান (Mechanized and Non Mechanized Artisanal Boats Engaged in Fishing)፡

বাংলাদেশের দক্ষিণে ৭১০ কি.মি. দীর্ঘ উপকূল সংলগ্ন ১৪ টি জেলার অন্তর্ভুক্ত উপকূলীয় উপজেলার ৫.০ লক্ষাধিক মৎস্যজীবী/জেলের অধিকাংশ সনাতনী পদ্ধতিতে দেশীয় অযান্ত্রিক নৌযান সহযোগে বিভিন্ন প্রকৃতির জাল-সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে দৈনিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ করে থাকে। আবার সমুদ্র উপকূলীয় জেলেদের অনেকে বিভিন্ন অশ্ব-শক্তির ইনবোর্ড ইঞ্জিন এবং ফিশহোল্ড ক্যাপাসিটির সুযোগ সংবলিত ৮-১২ মিটার দৈর্ঘ্যের কাঠের বোট সহযোগে সমুদ্রে সর্বোচ্চ ১০-১২ দিন অবস্থান করে সাগরে বেহুন্দি সহযোগে চিংড়ি, লইট্যা, ফাইস্যা, ওলুয়াসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রজাতির কিশোর মাছ এবং ১০০ মি.মি. বা ততোধিক আকারের ফাঁসজাল ব্যবহার করে ইলিশ, ম্যাকারেল, টুনা, দাতিনা, রাঙ্গাচোক্ষ্যা, সামুদ্রিক কৈ, বড় কাঁটা, হাঙ্গর, হাউস ইত্যাদি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য আহরণ করে। উপকূলের কাছাকাছি সর্বোচ্চ ১০ মিটার গভীরতায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানযোগে ছোট ফাঁসের চটজাল, মশারিজাল, ফাঁসজাল, টংজাল, রকেটজাল, বীচ সেইন, স্টেইক নেট, চরবেড় ইত্যাদি ইকোসিস্টেম বিনষ্টকারী ক্ষতিকর জাল নির্বিচারে জাটকা, চিংড়ির পিএল-সহ অসংখ্য প্রজাতির মাছ, চিংড়ি লার্ভি এবং কিশোর মাছ বিনষ্ট করে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে অত্যন্ত মূল্যবান প্রজাতির মাছের প্রায়ই বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। বর্তমানে সমুদ্র হতে আহরিত মোট মৎস্যের প্রায় ৮৫% আর্টিসানাল সেক্টরের মৎস্যজীবীর মাধ্যমে আহরিত হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের জুন ২০১৫ খ্রি. সালের সর্বশেষ জরিপ ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় জলাশয়ে ৩৪,৮১০ টি যান্ত্রিক এবং ৩২,৮৫৯ টি অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসহ সর্বমোট ৬৭,৬৬৯ টি মৎস্য নৌযান বিভিন্ন জাল-সরঞ্জাম সহযোগে সারা বছরই মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে। ২০১৭-১৮ সালে দেশের সর্বমোট উৎপাদিত ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন মাছের মধ্যে ৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ প্রায় ১৫.৩১% সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছের অবদান। সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮৫% আর্টিসানাল ক্যাচ যা প্রধানত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক আহরিত। বর্তমানে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকর্তৃক নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রাপ্তি সাপেক্ষে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণের আইন ও বিধান থাকলেও অধিকাংশ নৌযান তা প্রতিপালন করছে না। এর ফলে প্রতি আর্থিক সালে নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে আবশ্যিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে নির্দিষ্ট সংখ্যক নৌযানের অনুকূলে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক ফিশিং লাইসেন্স নবায়ন/ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং প্রদানের ক্ষেত্রে একাধিক সংস্থার সংশ্লেষ থাকায় এবং প্রয়োজনীয় জনবলের অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ নৌযান ফিশিং লাইসেন্স ছাড়াই মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। এছাড়া, আর্টিসানাল সেক্টরে নিয়োজিত অসংখ্য নৌযান এর বিস্তৃতি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় সঠিকভাবে সার্ভেল্যান্সের আওতায় তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

চিত্র ৬: দেশীয় যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

বিভাগ	জেলা	উপজেলার সংখ্যা	নৌযানের সংখ্যা			সর্বমোট (যান্ত্রিক+অযান্ত্রিক)	মন্তব্য
			যান্ত্রিক	অযান্ত্রিক	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৫	৪০৫২	৩৪৬	৪৩৯৮	(৩৪,৮১০+৩২,৮৫৯) = ৬৭,৬৬৯	
	কক্সবাজার	৬	**৩৩২৫**	**১৬১৫**	**৪৯৪০**		
	ফেনী	১	১১০	১২৯	২৩৯		
	নোয়াখালী	৩	৮৮০	৩৯৯	১২৭৯		
	লক্ষ্মীপুর	৫	১৯৫৭	৪৯৯	২৪৫৬		
বরিশাল	বরিশাল	১	**৬২১**	**২৩৩৯**	**২৯৬০**		
	পটুয়াখালী	৬	**২৯৫৯**	**২৭৪০**	**৫৬৯৯**		
	ভোলা	৭	**১২০৪২**	**৫৯৫৫**	**১৭৯৯৭**		
	পিরোজপুর	৪	**৬৪৩**	**৪০৩৬**	**৪৬৭৯**		
	বরগুনা	৩	**৩১৬৩**	**২১৭৭**	**৫৩৪০**		
	ঝালকাঠি	১	**৫**	**৪৩০**	**৪৩৫**		
খুলনা	বাগেরহাট	৭	**১৯৩৬**	**৪০৭২**	**৬০০৮**		
	খুলনা	৬	**৭৬৯**	**৭৫৬৪**	**৮৩৩৩**		
	সাতক্ষীরা	৪	৩৯৭	২৫০৯	২৯০৬		

অধিবেশন: মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী/জেলে ও নৌযান

ছোট দলীয় কাজ

কাজের ধারা: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশিক্ষণার্থীগণ ৪টি ছোট দলে বিভক্ত হবেন যেমন: দল ১: বণিজ্যিক নৌযান-মিড ওয়াটার ট্রলার, দল ২: বণিজ্যিক নৌযান-চিংড়ি ট্রলার/ডিমার্সাল ট্রলার, দল ৩: বণিজ্যিক নৌযান-লং লাইনার এন্ড পার্স সিনার এবং দল ৪: যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক আর্টিসানাল নৌযান) এবং নিম্নের অনুশীলনীর সমাধান করবেন।

অনুশীলনী:

১) প্রতিটি দল একটি পোস্টার পেপারে প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত নৌযানের বৈশিষ্ট্য, পরিসংখ্যান, আহরিত মাছের প্রজাতি, ব্যবহৃত জাল/সরঞ্জাম, মাছ ধরার স্থান ও ট্রিপের সময়কাল ইত্যাদির তালিকা তৈরি করবে।

২) প্রতিটি দল সান্ধকালীন সেশনে স্ব স্ব গ্রুপের কাজ উপস্থাপন করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন: ২.৩	সময়: ১০.৫০-১১.৫০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **উপকূল ও সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত উপকরণ ও সরঞ্জাম এবং মৎস্যসম্পদের জন্য ক্ষতিকর উপকরণ ও সরঞ্জাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- উপকূল ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জাম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত ট্রল নেট সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জাম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জাম এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • পূর্ববর্তী অধিবেশন এর সাথে সংযোগ স্থাপন • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• উপকূল ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জাম • গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত ট্রল নেট • গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জাম • ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জাম	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			৭ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: পোস্টার, ম্যাপ, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

উপকূলীয় ও সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি

সাগরে বিভিন্ন জাতের মাছ আহরণের জন্য এলাকা ভেদে নানা রকমের জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পূর্বে তুলা থেকে তৈরি সূতা দিয়ে জাল বুনা হতো। বাঁশ ও অন্যান্য স্থানীয় উপকরণ দিয়ে নানা ধরনের ফাঁদ তৈরি করা হত। নাইলন, পলিথিলিন, টায়ারকর্ড সহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে এগুলো দিয়ে জাল বানানো হয়। আগে হাতে জাল বুনা হতো। সেই জাল গাব ফলের রস ও প্যারা গাছের কসে ভিজিয়ে পাকানো হতো। বর্তমানে অধিকাংশ জালই মেশিনে বানানো হচ্ছে। বিদেশি উন্নত ও কার্যকর আহরণ ক্ষমতাসম্পন্ন জালের আমদানির ফলে সূতার জালের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এতে যোগ হয় নানা আকারের বড়শি। একসময় দেশেই তৈরি হতে থাকে নানা আকারের ফাঁস জাল। ফলে একশ্রেণির লোভী ব্যবসায়ীর লালসার কারণে বিভিন্ন প্রকারের জাল-মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। মৎস্যসম্পদ রক্ষায় সরকার জাল-সরঞ্জামাদির আকার-প্রকার ও ব্যবহারের মৌসুম নির্ধারণ করে বিধি-বিধান প্রণয়ন করে।

উপকূলীয় ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে প্রধানত নানা আকারের ফাঁস জাল (Gill net) ও বেহুন্দি জাল (Set bag net) ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও রয়েছে টানা জাল (Seine net) এবং বিভিন্ন মাপের বড়শি (Hook and Line, Long line) ও নানা ধরনের 'চাঁই' বা ফাঁদ (Trap)। ফাঁস জাল আবার দুই ধরণের-ভাসাজাল (Drift gill net) ও ডুবা জাল (Bottom set gill net)। ফাঁসের মাপ ও আকারভেদে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় নামে ফাঁস জালের পরিচিতি রয়েছে-যেমন, ইলিশ জাল, ছান্দি জাল, কাঠিজাল, টংজাল, কোরাল জাল, লাক্ষ্যা জাল, হাঙ্গর জাল, বাটাজাল, ফইল্যা জাল, পোয়াজাল, ফাঁইস্যাজাল, হুন্দ্রাজাল, ডুবাজাল, তিন-পরল্যা জাল ইত্যাদি। যে জালে যে মাছ বেশি ধরা পড়ে সেসব মাছের নামেও ফাঁস জালের পরিচিতি রয়েছে। বেহুন্দি জালও মৎস্য আহরণ অঞ্চল ও আকারগত কারণে নানা নামে পরিচিত; যেমন-বাধাজাল, বিন্দি জাল। মোহনা ও উপকূলীয় নদীনালায় ছোট আকারের যে বেহুন্দি জাল পাতা হয় সেগুলোকে 'মোহনা বেহুন্দি জাল' বলে এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও কিছুটা গভীর সমুদ্রে যে বড় আকারের বেহুন্দি জাল দিয়ে মাছ ধরা হয় সেগুলোকে 'সাগর বেহুন্দি জাল' বলা হয়। অঞ্চলভেদে টানাজাল মোহনায় ও দ্বীপ এলাকায় মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। বড়শি ও 'হাজারি বড়শি' নামে যান্ত্রিক নৌযান দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয় যেখানে হাঙ্গর ও পোয়া মাছ ধরাই প্রধান লক্ষ্য।

গভীর সমুদ্রে (Deep sea) বাণিজ্যিক ট্রলারে সাধারণত ট্রল নেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে; বটম, মিডওয়াটার ও শ্রিম্প এই তিন ধরনের ট্রল নেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গভীর সমুদ্রে (High sea) টুনা মাছ ধরার জন্য সাধারণত লং লাইন ও পার্স সেইন ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যে ভেসেল ব্যবহার করা হয় তাকে লং লাইনার ও পার্স সেইনার বলা হয়। এছাড়া টুনা ধরার কাজে পোল এন্ড লাইন পদ্ধতিও বেশ জনপ্রিয়। টুনা ধরার কাজে আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে FAD (Fish Aggregating or Aggregation Device).

ক) উপকূলীয় ও অগভীর সমুদ্রে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জামসমূহ

১. ফাঁস জাল (Gill net)

ফাঁস জাল দুই ধরণের-ভাসাজাল (Drift gill net) ও ডুবা জাল (Bottom set gill net)। ফাঁসের মাপ ও আকারভেদে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় নামে ফাঁস জালের পরিচিতি রয়েছে-যেমন, ইলিশ জাল, ছান্দি জাল, কাঠিজাল, টংজাল, কোরাল জাল, লাক্ষ্যা জাল, হাঙ্গর জাল, বাটাজাল, ফইল্যা জাল, পোয়াজাল, ফাঁইস্যাজাল, হুন্দ্রাজাল, ডুবাজাল, তিন-পরল্যা বা ট্রামেল জাল ইত্যাদি।

চিত্র ১: তিন পরল্লাজাল (Trammel Net)

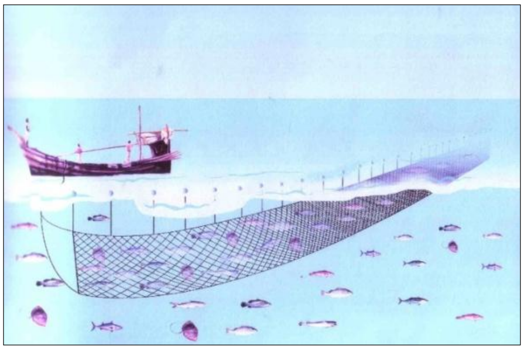

চিত্র ২: বড়ভাসান জাল (Large Mesh Drift Net)

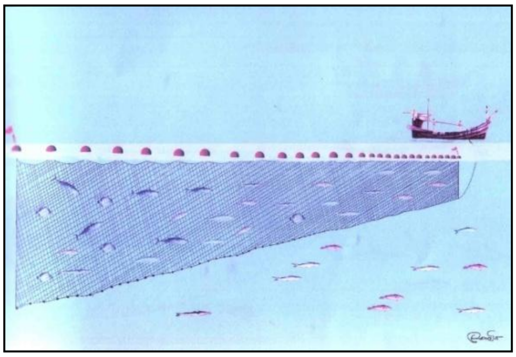

চিত্র ৩: ছোট ভাসানজাল (Small Mesh Drift Net)

২. বড়শি (Hook and Line, Long line)

বড়শি ও 'হাজারি বড়শি' নামে যান্ত্রিক নৌযান দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয়। তবে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যজীবীরা হাজারি বড়শি দিয়ে অনেক সময় হাঙ্গর ও শাপলাপাতা আহরণ করে থাকে যা প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

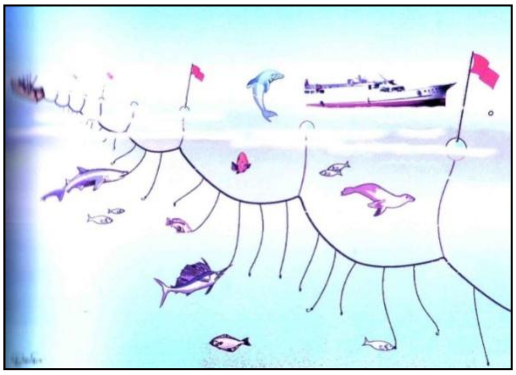

চিত্র ৪: বড়শি উপরিস্তর (Pelagic Long Line)

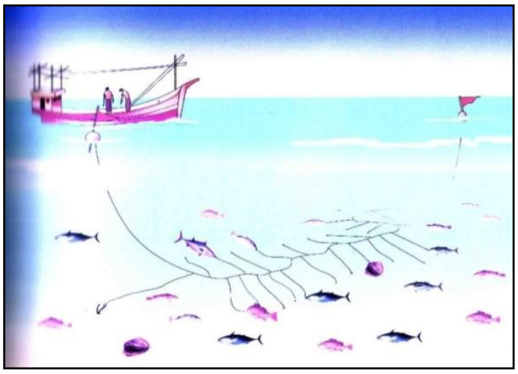

চিত্র ৫: বড়শি তলদেশীয় (Bottom Long Line)

৩. চাঁই বা ফাঁদ (Trap)

চাঁই বা ফাঁদ দিয়ে সাধারণত নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ আহরণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণে পরিবেশের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। তবে, বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণে চাঁই বা ফাঁদ ব্যবহার করা হয় না।

৪. খেপলা জাল (Cast Net)

খেপলা জাল সাধারণত ক্ষুদ্রকায় জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বা নমুনায়নে ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। এটি একটি পরিবেশবান্ধব জাল।

৫. উপকূলীয় বেহুন্দি জাল (Estuarine Set Bag Net, ESBN)

উপকূলীয় বেহুন্দি জাল মোহনা ও উপকূলের জোয়ার ভাটা হয় এমন জায়গায় খুঁটি দিয়ে পেতে রাখা হয়। দেখতে কোনাকুনি ট্রল জালের মুখে। মুখের অংশে দু'পাশ থেকে লম্বা রশিতে বেধে পানির তলদেশে মাটিতে পুঁতে রাখা খুঁটির সাথে বাধা হয়। এই জালের শেষ প্রান্তের ফাঁসের আকার খুবই ছোট-৫ থেকে ২২ মিলিমিটার পর্যন্ত। যে কারণে মোহনার বা উপকূলের নানান জাতের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা কিশোর মাছ ধরা পড়ে। এটিকে একটি ক্ষতিকর জাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

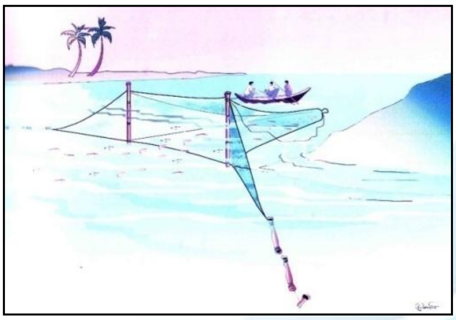

চিত্র ৬: মোহনা বেহুন্দি জাল (ESBN)

৬. টানা জাল

নানা ধরনের টানা জাল রয়েছে। সাগর পাড়ে, মোহনায়, নদীতে সাধারণত ১২ জন মৎস্যজীবী দেশি নৌকা বা অল্প অশ্ব-শক্তি সম্পন্ন যান্ত্রিক নৌকায় টানা জালে মাছ ধরা হয়। জালটি সাধারণত ৬০০ থেকে ৭০০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় যার ফাঁসের আকার ১২ থেকে ২৪ মিলিমিটারের বেশি নয়। টানা জালে অধিকাংশ মাছই ছোট, কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এটি একটি ক্ষতিকর জাল।

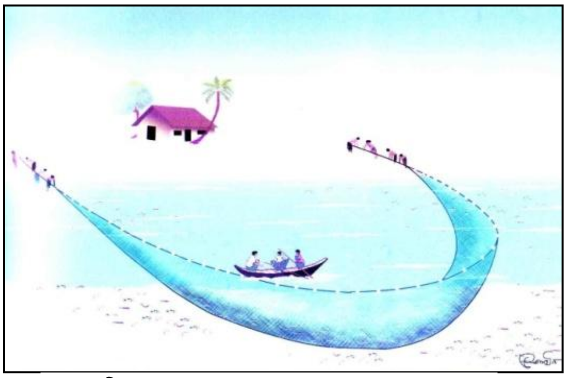

চিত্র ৭: চর জাল (Beach Seine Net)

৭. কারেন্ট জাল বা রক জাল

নাইলনের তৈরি এক-সূতার (Monofilament) এই জাল মেশিনে তৈরি ও নানা আকারের ফাঁস বিশিষ্ট। পূর্বে বিদেশ থেকে আসলেও বর্তমানে দেশের নানা জায়গায় এই জাল তৈরি হচ্ছে। সরকারিভাবে এই জাল নিষিদ্ধ হলেও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল বর্তমানে কারেন্ট জালে সয়লাব হয়ে গেছে। এটি একটি ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ জাল।

চিত্র ৮: উপকূলীয় এলাকায় কারেন্ট জালে ধৃত

১. চর জাল

খুবই ছোট ফাঁসের কমবেশি ১ মিটার প্রস্থে ও ১০০০-১৫০০ মিটার লম্বা চর জাল ৩-৪ মিটার পরপর জোয়ার-ভাটার পানি পৌছে এরকম মোহনা, নদী ও খালের পাড়ের মাটিতে পুঁতে রাখা বাঁশ কিংবা গাছের খুঁটিতে আটকিয়ে মাছ ধরা হয়। ভাটার সময় জাল মাটি বরাবর ফেলে রাখা হয় এবং জোয়ারের পানি বাড়ার সাথে সাথে জাল ওপরে উঠানো হয়, পরবর্তীতে ভাটার সময় আবার মাছ সংগ্রহ করা হয়। এতে খুবই ছোট আকারের কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি ধরা পড়ে এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এটি একটি ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ জাল।

২. ঠেলা জাল/ মশারি জাল/ পোনাজাল

উপকূলীয় এলাকায় পাড় ঘেষে খুবই ছোট ফাঁসের মশারি জাল বা নাইলন নেট দ্বারা তৈরি ঠেলা জাল অথবা ছোট আকারের বেহুন্দি জালের আকারে স্থাপিত এ সকল জাল দ্বারা বাগদা বা গলদার পিএল সংগ্রহ করা হয়। পিএল সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর অন্যান্য প্রজাতির মাছের ডিম পোনা ধ্বংস করে থাকে। সরকার উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ করেছে।

চিত্র ৯: ঠেলাজাল (Push Net)

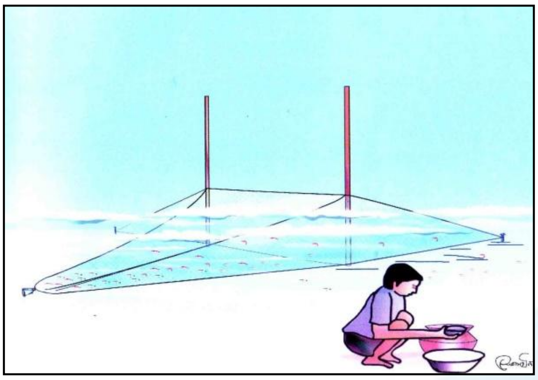

চিত্র ১০: মশারিজাল (Curtain Net)

খ) গভীর সমুদ্রে (Deep sea) ব্যবহৃত ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জামসমূহ

১. মিডওয়াটার ট্রল নেট

মিডওয়াটার ট্রলার আধুনিক নেভিগেশন, সেফইটি ইকুইপমেন্ট, অত্যাধুনিক মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি যথা: ইকোসাউন্ডার, সোনার, ট্রল আই ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মৎস্য আহরণ করে থাকে। এ সকল ট্রলারে ব্যবহৃত জালের হেড রোপ ৭০-১১০ মিটার, গ্রাউন্ড রোপ ৭০-১১০ মিটার যা মৎস্য আহরণকালে ৩০ মিটার পর্যন্ত ভার্টিকেল ওপেনিং এর মাধ্যমে সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ না করে মূলত ৪০-৮০ মিটার গভীরতায় এবং দূর সমুদ্রে ভাসমান পেলাজিক প্রজাতির মৎস্য আহরণ করে থাকে। মিডওয়াটার ট্রলার সহযোগে মধ্যস্তরের এবং পেলাজিক মৎস্য আহরণ করায় সমুদ্র তলদেশের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুন্ন রেখে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং কিশোর মাছ রক্ষার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এ প্রকৃতির ট্রলার দ্বারা অতি অভিপ্রয়াণশীল আন্তঃদেশীয় সমুদ্র জলাশয়ে বিচরণরত মৎস্য প্রজাতি যেমন: সার্ডিন, আইল্যা, সুরমা, ইলিশ, চাঁপাকড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির টুনা ইত্যাদি অধিক হারে আহরণ করা সম্ভব হয় যা মূল্যবান চিংড়ি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ তলদেশীয় (বটম) প্রজাতির মাছের রিক্রুটমেন্টে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে সামুদ্রিক মাছের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

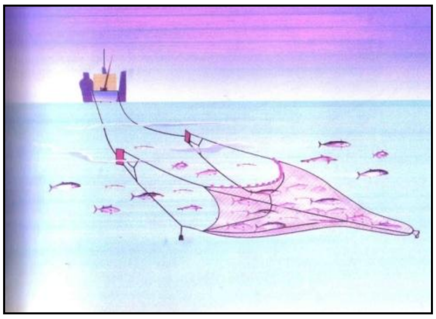

চিত্র ১১: মধ্যভাগীয় ট্রল জাল (Midwater Trawl Net)

২. ডিমার্সাল ট্রল জাল

ডিমার্সাল ট্রল জাল মূলত উন্নত কারিগরি প্রক্রিয়ায় তৈরি এবং ট্রলার বহর দিয়ে গভীর সমুদ্রে তলদেশীয় মাছ ধরে থাকে। সাদা মাছ ধরার তলদেশীয় ট্রল জালগুলো আন্তর্জাতিকভাবে একটি ক্ষতিকর জাল হিসাবে চিহ্নিত হলেও বাংলাদেশের সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য এর কোন বিকল্প না থাকায় সীমিভাবে ৪০ মিটারের বেশি গভীর পানিতে মৎস্য আহরণের জন্য এই জাল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। তবে এতে উপকূলীয় প্রতিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

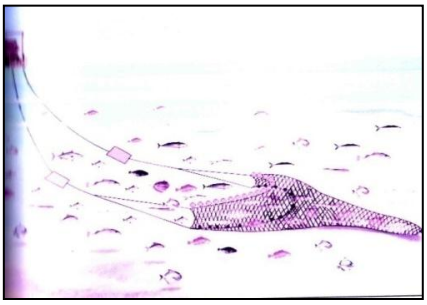

চিত্র ১২: ডিমার্সাল ট্রল (Demersal Trawl Net)

৩. শ্রিম্প ট্রল জাল

শ্রিম্প ট্রল নেট মূলত একটি ডিমার্সাল ট্রল জাল। উন্নত কারিগরি প্রক্রিয়ায় তৈরি চিংড়ি ধরার তলদেশীয় ট্রল জালগুলো আন্তর্জাতিকভাবে একটি ক্ষতিকর জাল হিসাবে চিহ্নিত হলেও বাংলাদেশের সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য এর কোন বিকল্প না থাকায় সীমিতভাবে ৪০ মিটারের বেশি গভীর পানিতে মৎস্য আহরণের জন্য এই জাল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। তবে এতে উপকূলীয় প্রতিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান ট্রলার বহরে নিয়োজিত চিংড়ি ট্রলার সমূহের দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ৩০ মিটার, অশ্বশক্তি ৩৫০-৮৫০ বিএইচপি, জালের কড এন্ড ফাঁস ৪৫ মি.মি. এবং হেডরোপ দৈর্ঘ্য ১৫-৩৫ মিটার। চিংড়ি ট্রলার দুই পাশে সম্প্রসারিত কাঠামোর মাধ্যমে (Out riggers) ১ অথবা ২ জোড়া জাল ব্যবহার করে। এছাড়া প্রায় সংকটাপন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য চিংড়ি ট্রল জালে প্রবেশকৃত কচ্ছপ বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দানের লক্ষ্যে জালের কডএন্ডের কাছাকাছি Turtle Excluder Device (TED) সংযোজন করা হয়।

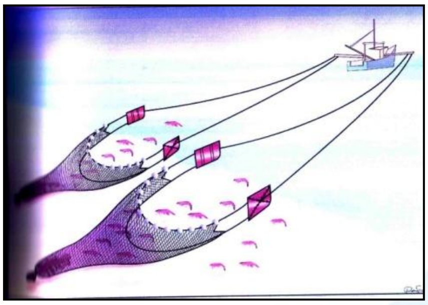

চিত্র ১৩: চিংড়ি জাল (Shrimp Trawl Net)

গ) গভীর সমুদ্রে (High sea) ব্যবহৃত টুনা আহরণ জাল ও সরঞ্জামসমূহ

১. লং লাইন

সারা বিশ্বে গভীর সমুদ্রে (High sea) উচ্চ অভিপ্রয়াণ সম্পন্ন মাছ যেমন টুনা, সোর্ডফিশ, হ্যালিবাট ইত্যাদি বাণিজ্যিকভাবে আহরণে লং লাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লং লাইনে একটি প্রধান লাইন (main line) ও তাঁর সাথে সংযুক্ত আরও সাইড লাইন (snoods) থাকে এবং এতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর হুক (baited hooks) স্থাপন করা হয়। লং লাইন ব্যবহারকারী ভেসেলকে লং লাইনার (long liner) বলা হয়। জলাশয়ের কোন স্তরে ব্যবহার করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে লং লাইনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; পেলাজিক লং লাইন (pelagic longline): সমুদ্রের উপরিভাগে টুনা, সোর্ডফিশ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয় ডির্মাসেল লং লাইন (demersal longline): সমুদ্রের উপরিভাগে কড, হ্যালিবাট ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়।

লং লাইন ফিশিং অন্যান্য মাছ ধরার কৌশল হতে পরিবেশবান্ধব তবে দৈবক্রমে (incidental catching) সামুদ্রিক বৃহৎ প্রাণি যেমন ডলফিন, হাঙ্গর, কচ্ছপ ও সামুদ্রিক পাখি ধরা পড়ে।

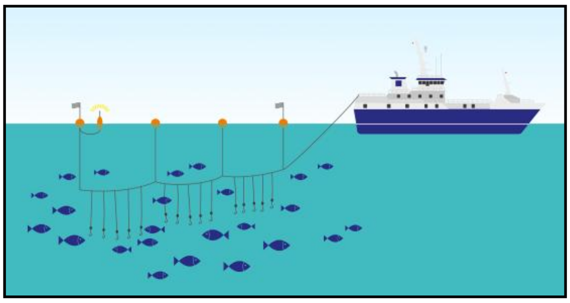

চিত্র ১৪: লং লাইন পদ্ধতি ও আধুনিক লং লাইনার

২. পার্স সেইন

গভীর সমুদ্রে উপরিভাগের ঝাঁকবদ্ধ মাছ (fish school or agreggated) ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত টুনা, হেরিং, ম্যাকেরেল, এনচোভিস ইত্যাদি মাছ এ জালের সাহায্যে ধরা হয়। পার্স সেইন সাধারণ বেড় জালের মতোই সমুদ্রের একটি এলাকাকে মাছের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে ভেসেলের মাধ্যমে টানা হয়। এতে জালের নীচের দিকে লোহার তৈরি রিং লাগানো হয় এবং এর ভিতর দিয়ে একটি মোটা দড়ি (purse-line) প্রবেশ করানো হয়, যখন দড়িটি টানা হয় তখন লোহার রিংগুলো একত্রিত হয়ে কোন মাছকে বের হতে দেয় না। পার্স সেইন ব্যবহারকারী ভেসেলকে পার্স সেইনার বলা হয়। তবে বর্তমানে বিশ্বে নানাদেশে এ জালকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে কারণ এখানে অনেক অযাচিত মাছ (bycatch of non-target species) চলে আসে যা মৎস্য মজুদের (fish stock) ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

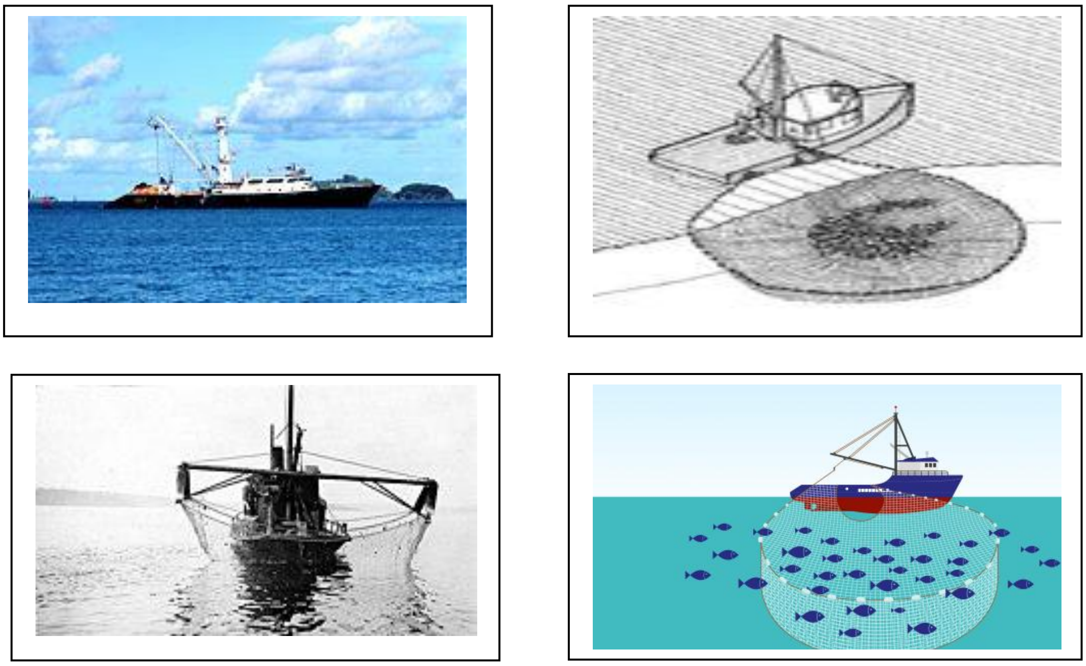

চিত্র ১৫: পার্স সেইন নেট ও পার্স সেইনার

৩. পোল এন্ড লাইন

সমুদ্রে টুনা মাছ আহরণে কিছু কিছু কোস্টাল স্টেট পোল এন্ড লাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। টুনা মাছ আহরণের একটি টেকসই পদ্ধতি যেখানে অন্য মাছের স্টকের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না এবং পরিবেশ বান্ধব। পোল এন্ড লাইন পদ্ধতিতে সাধারণত অন্যান্য ছোট মাছকে জীবন্ত বেইট হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং ফিশ স্কুল বা মাছের ঝাঁক চিহ্নিত করে বড়শির সাহায্যে one by one পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয়। মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে এ পদ্ধতিতে টুনা মাছ আহরণ একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি, এতে খরচ তুলনামূলক কম।

চিত্র ১৬: পোল এন্ড লাইন পদ্ধতিতে মাছ ধরার চিত্র

- Fish Aggregating or Aggregation Device হচ্ছে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম কৌশল বিশেষ যা সমুদ্রের তলদেশে কংক্রিটের সাথে সংযুক্ত দড়ি বয়ার মাধ্যমে ভেসে থাকে অথবা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট যেমন গাছের গুড়ি, ভাসমান বস্তু এবং এতে সাধারণত টুনা জাতীয় মাছ আকৃষ্ট হয়ে এর চারপাশে ঘুরতে থাকে, ফলে মাছের অবস্থান সহজেই নির্ণয় করা যায় এবং এটি টুনা ধরার একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- FADs গুলো দড়ির সাহায্যে তলার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে আবার নাও পারে। আধুনিক FADs গুলোতে সোনার ও জিপিএস সংযুক্ত থাকে ফলে স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে মাছের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।
- পার্স সেইন এর মাধ্যমে এখান হতে মাছ ধরা হয়।
- মাছের মজুত বাড়াতে এবং মাছ আহরণের সফলতা বাড়াতে মাছ জমায়েত করার কৌশল (FADs) বেশ কার্যকর ।

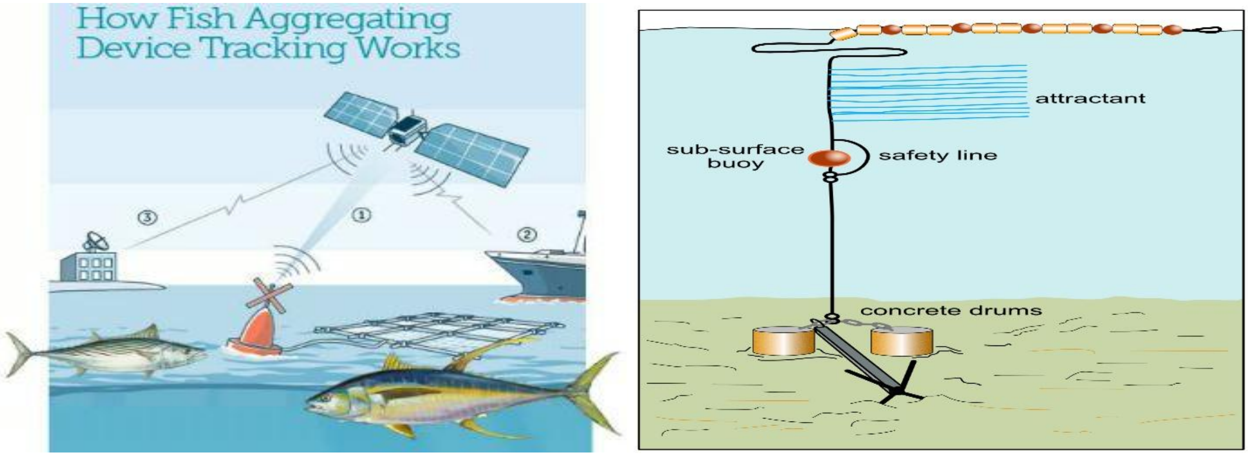

চিত্র ১৭: Fish Aggregating Device

ঘ) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জামসমূহ

বর্তমানে, প্রায় সত্তর হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান এবং আড়াই শত ট্রলারবহর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত আছে। উপকূল, অগভীর ও গভীর সমুদ্রে ব্যবহৃত সকল জাল ও সরঞ্জামাদিই মৎস্য আহরণকালে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর একই রকমের প্রভাব ফেলে না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কিছু কিছু জাল ও সরঞ্জামাদি খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। ধ্বংসাত্মক জাল ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে চলছে নির্বিচার মৎস্য নিধন। নির্বিচারে চলছে ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা নিধন, চিংড়ির পোনা ধরতে গিয়ে অন্যান্য প্রজাতির পোনার বংশ ধ্বংস/নিধন। উপকূল ,অগভীর ও গভীর সমুদ্রে ব্যবহৃত কতিপয় ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জামের নাম উল্লেখ করা হলো।

উপকূলীয় বেহুন্দি জাল, টানা জাল, কুক্কুরি জাল, কারেন্ট জাল, চরজাল

ঠেলাজাল/ মশারি জাল/পোনা জাল

ডির্মাসেল ট্রল জাল

শ্রিম্প ট্রল জাল

পার্স সেইন ইত্যাদি

এবিষয়ে বিস্তারিত উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন: ২.৪	সময়: ১১.৫৫-১২.৫৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা এসডিজি অর্জনে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪: জলজ জীবন (Life Below Water) সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • পূর্ববর্তী অধিবেশন এর সাথে সংযোগ স্থাপন • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) • টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪: জলজ জীবন (Life Below Water) • টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা • টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ	বক্তৃতা ও একক/দলীয় কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী সেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট, ভিপ কার্ড,মার্কার,আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

ভূমিকা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ ২০১৫ সালে সমাপ্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) কে প্রতিস্থাপিত করে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) লক্ষ্যমাত্রা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ''২০৩০ এজেন্ডা'' গৃহীত হয়। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০৩০ এজেন্ডা এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষ্যমের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনি ঝুঁকি মোকাবেলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে ''কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)'' নীতি অনুসরণ।

স্মরণ করা যেতে পারে, জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের পথনকশা (Mapping) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে।

17 GOALS

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট:

১	1 NO POVERTY	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
২	2 ZERO HUNGER	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির সম্প্রসারণ
৩	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
৪	4 QUALITY EDUCATION	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান
৫	5 GENDER EQUALITY	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
৬	6 CLEAN WATER AND SANITATION	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও পাপ্যতা নিশ্চিত করা
৭	7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
৮	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
৯	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসার
১০	10 REDUCED INEQUALITIES	আন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা
১১	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

১২	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা
১৩	13 CLIMATE ACTION	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ
১৪	14 LIFE BELOW WATER	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার
১৫	15 LIFE ON LAND	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ
১৬	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ
১৭	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪: জলজ জীবন (Life Below Water)

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহা

গোল	লক্ষ্যমাত্রা	গোল	কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
১৪.১	২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের সামুদ্রিক দূষণ, বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকাণ্ড, সামুদ্রিক (নৌ) আবর্জনা ও পুষ্টি-দূষণ (পুষ্টিদায়ী পদার্থের আধিক্যজনিত দুষণ) উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস ও প্রতিরোধ	১৪.১.১	ভাসমান প্লাস্টিক আবর্জনার ঘন্ন ও উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবাহিত রাসায়নিক উপাদানের (ইউট্রফিকেশন) সূচক
১৪.২	সাগর-মহাসাগরে সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও এদের অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণসহ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ	১৪.২.১	বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুপাত
১৪.৩	সকল পর্যায়ে বর্ধিত বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও অপরাপর উদ্যোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক অম্লায়নের (অ্যাসিডিফিকেশন) ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা ও এর মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা	১৪.৩.১	প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা স্থলের নির্ধারিত স্থানগুলোতে পরিমাপকৃত গড় সামুদ্রিক অম্লত্ব (পিএইচ)
১৪.৪	২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতিআহরণ, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মাছের মজুদ পুনরুদ্ধার করে নূন্যতম সেই পর্যায়ে নিয়ে আসা যে পর্যায়ে এদের জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন সম্ভব	১৪.৪.১	জীবতাত্ত্বিকভাবে টেকসই মাত্রায় মাছের মজুদের অনুপাত
১৪.৫	প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার অন্ততপক্ষে ১০ শতাংশের সংরক্ষণ	১৪.৫.১	মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি
১৪.৬	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য যথোপযুক্ত ও কার্যকর বিশেষ ও প্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা- এ বিষয়টি অনস্বীকার্য বিবেচনায় রেখে (চলমান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি, দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা এবং হংকং মিনিস্টেরিয়াল ম্যান্ডেট বিবেচনায় এনে) ২০২০ সালের মধ্যে, (মাছ ধরার জাহাজগুলোর) অতিসক্ষমতা বা ধারণক্ষমতা অর্জনে ও অতিআহরণে সহায়ক এমন সকল প্রকার মৎস্য ভর্তুকি নিষিদ্ধ করা, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণে সহায়ক সকল ভর্তুকির উচ্ছেদ সাধন এবং অনুরূপ নতুন কোন ভর্তুকি চালু থেকে বিরত থাকা	১৪.৬.১	অবৈধ, অপ্রকাশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিরিখে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি

গোল	লক্ষ্যমাত্রা	গোল	কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
১৪.৭	মৎস্য আহরণ, মৎস্য চাষ ও পর্যটনশিল্পের টেকসই ব্যবস্থাপনা সহ সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানো	১৪.৭.১	উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ও সকল দেশে জিডিপির অনুপাত হিসেবে টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ
১৪.ক	সামুদ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর, বিশেষ করে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি বিনিময় সংক্রান্ত আন্তঃদেশীয় সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশনের মানদণ্ড ও নির্দেশমালা বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি, গবেষণা সক্ষমতার বিকাশ ও সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর	১৪.ক.১	মোট গবেষণা বাজেটের তুলনায় সামুদ্রিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণায় বরাদ্দকৃত বাজেটের অনুপাত
১৪.খ	সনাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য আহরণকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার সুবিধাদান	১৪.খ.১	ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ আহরণকারী জেলেদের অধিকার সুরক্ষা করে এমন বৈধ/নিয়ন্ত্রণমূলক/নীতি/ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশ অনুযায়ী অগ্রগতি
১৪.গ	যে ভবিষ্যত আমরা চাই (দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট) এর ১৫৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদ বিবৃত সাগর-মহাসাগর ও সংশিষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের আইনি কাঠামো হিসেবে স্বীকৃত সামুদ্রিক আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে গৃহীত আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাগর-মহাসাগর ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা	১৪.গ.১	আইনগত নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মহাসাগর সম্পৃক্ত দলিলাদির মাধ্যমে মহাসাগরের সম্পদ ও তার স্থিতিশীল ব্যবহারকল্পে সাগর আইন বিষয়ে জাতিসংঘ কনভেনশনে প্রতিফলিত যে আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তাতে অনুস্বাক্ষর ও স্বীকৃতিদানসহ বাস্তবায়নে অগ্রগামী দেশের সংখ্যা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এনডিজি ম্যাপিং-এর আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় SDG 14 (Life below water) শীর্ষক অভীষ্ট এর ৬টি লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৪.২, ১৪.৪, ১৪.৫, ১৪.৬, ১৪.৭, ও ১৪.বি অর্জনে লিড মিনিষ্ট্রি এবং SDG 2 (Zero hunger) এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২.১, ২.৩ ও ২.৫ অর্জনে কো-লিড মিনিষ্ট্রি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৮ সালে প্রণয়ন করেছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে তা সংযুক্তি হিসেবে এই মডিউলে সংযুক্ত করা হয়েছে।

SDG 14 (Life below water) শীর্ষক অভীষ্ট এর ৬টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিড মিনিষ্ট্রি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করছে; লক্ষ্যমাত্রা ৬টি এবং মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১৪.২: সাগর-মহাসাগরে সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও এদের অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণসহ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ
উদ্যোগ: টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (মৎস্য অধিদপ্তর) ➢ এমসিএস কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ➢ জেলেদের জীবন মান উন্নয়ন ➢ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ

১৪.৪: ২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতিআহরণ, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মাছের মজুদ পুনরুদ্ধার করে নূন্যতম সেই পর্যায়ে নিয়ে আসা যে পর্যায়ে এদের জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন সম্ভব

উদ্যোগ: ১। টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (মৎস্য অধিদপ্তর)

- এমসিএস কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
- জেলেদের জীবন মান উন্নয়ন
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ
- সকল ফিশিং ভেসেল লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা

২। পায়রা মৎস্য বন্দর স্থাপন (বিএফডিসি)

- আধুনিক শুঁটকি পল্লী স্থাপন
- আধুনিক বরফকল ও হিমাগার স্থাপন
- মৎস্য জাহাজ বার্থিং এর জন্য বেসিন তৈরি
- ভ্যালু এডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন

১৪.৫: প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার অন্ততপক্ষে ১০ শতাংশের সংরক্ষণ

উদ্যোগ: সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণার জন্য সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং উদ্যোগ গ্রহণ

১৪.৬: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য যথোপযুক্ত ও কার্যকর বিশেষ ও প্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা- এ বিষয়টি অনস্বীকার্য বিবেচনায় রেখে (চলমান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি, দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা এবং হংকং মিনিস্টেরিয়াল ম্যান্ডেট বিবেচনায় এনে) ২০২০ সালের মধ্যে, (মাছ ধরার জাহাজগুলোর) অতিসক্ষমতা বা ধারণক্ষমতা অর্জনে ও অতিআহরণে সহায়ক এমন সকল প্রকার মৎস্য ভর্তুকি নিষিদ্ধ করা, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণে সহায়ক সকল ভর্তুকির উচ্ছেদ সাধন এবং অনুরূপ নতুন কোন ভর্তুকি চালু থেকে বিরত থাকা

উদ্যোগ: ১। টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (মৎস্য অধিদপ্তর)

- এমসিএস কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
- জেলেদের জীবন মান উন্নয়ন
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ
- সকল ফিশিং ভেসেল লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা

২। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ প্রকল্প গ্রহণ (মৎস্য অধিদপ্তর)

- ডিপ সী ভেসেল ক্রয়
- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- উদ্যোক্তা সম্পৃক্তকরণ

১৪.৭: মৎস্য আহরণ, মৎস্য চাষ ও পর্যটনশিল্পের টেকসই ব্যবস্থাপনা সহ সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানো

উদ্যোগ: ১। জলবায়ুসহনশীল সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা (CBFM) শক্তিশালীকরণ (মৎস্য অধিদপ্তর)

- সিবিও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন
- জলবায়ুসহনশীল মৎস্যচাষ কৌশল এর প্রদর্শনী
- চাষি প্রশিক্ষণ

২। টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (মৎস্য অধিদপ্তর)

- ➢ এমসিএস কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
- ➢ জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন
- ➢ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ
- ➢ সকল ফিশিং ভেসেল লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা

৩। পায়রা মৎস্য বন্দর স্থাপন (বিএফডিসি)

- ➢ আধুনিক শুঁটকি পল্লী স্থাপন
- ➢ আধুনিক বরফকল ও হিমাগার স্থাপন
- ➢ মৎস্য জাহাজ বার্থিং এর জন্য বেসিন তৈরি
- ➢ ভ্যালু এডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন

৪। অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের চাষ (বিএফআরআই)
৫। মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং ভ্যালু এডেড মৎস্যপণ্য উৎপাদন (বিএফআরআই)
৬। সামুদ্রিক মৎস্যচাষ উৎসাহিতকরণ (বিএফআরআই)

১৪. বি: সনাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য আহরণকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার সুবিধাদান

উদ্যোগ: টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (মৎস্য অধিদপ্তর)

- ➢ এমসিএস কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
- ➢ জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন
- ➢ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ
- ➢ সকল ফিশিং ভেসেল লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা

SDG 2: ক্ষুধা মুক্তি (Zero hunger)

এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২.১, ২.৩ ও ২.৫ অর্জনে কো-লিড মিনিষ্ট্রি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে

২.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটাবে।
২.৩: ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষিদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মুল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ
২.৫: ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্যপ্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যলালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধার সুষ্ঠ ও সমান অংশীদারিতার পথ সুগম করা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ

সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও এসডিজি-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ২০১২-১৩ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্য নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

	খাত	বেইজলাইন উৎপাদন (২০১৩-১৪) (মে.টন)	প্রক্ষেপণ (২০২০-২১) (% বৃদ্ধি)	অগ্রগতি ২০১৭-১৮ পর্যন্ত (% বৃদ্ধি)
১	অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষ হতে উৎপাদন	১৯.৫৭	৪৫	২২.৮৯
২	অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে হতে মৎস্য আহরণ	৯.৯৬	২০	২২.১৯
৩	ইলিশ উৎপাদন	৩.৮৫	২০	৩৪.২৯
৪	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ	৫.৯৫	১৮	১০.০৮

৫. দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৫৩ গ্রাম থেকে ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণ। এর বিপরীতে বিবিএস ২০১৬-এর তথ্য মতে, দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে

৬. হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য হতে রপ্তানি আয় ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীতকরণ

৭. বেকার যুবক ও যুবনারীদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

৮. মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ এবং

৯. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

মৎস্য অধিদপ্তর এসডিজি'র উল্লেখিত লক্ষামাত্রা সমূহ অর্জনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি বেশ কিছু অগ্রাধিকারমূলক কাজ করে যাচ্ছে; তাহলো

- সামুদ্রিক মৎস্য আইন, সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা প্রণয়নসহ মৎস্য সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বিধি হালনাগাদকরণ
- সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির মজুদ নিরূপণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় ১৬ টি মেরিন সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন
- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ফিশিং ভেসেল লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা
- পরিবেশবান্ধব ফিশিং ভেসেল/গিয়ার পরিচালনায় উৎসাহিতকরণ
- সকল ফিশিং ভেসেলে ভিএমএস/এআইএস সংযোজন
- আইইউইউ ফিশিং প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (NPOA-IUU)
- কমপক্ষে ৫ লক্ষ জেলে/মৎস্যজীবী পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন
- ২০৩০ সালের মধ্যে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণার জন্য সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং উদ্যোগ গ্রহণ, এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে নোয়াখালী জেলার হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপ ও দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ৩১৮৮ বর্গ কি.মি. এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে
- উপকূলীয় এলাকার জেলে/মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে মডেল ভিলেজ স্থাপন
- সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা (CBFM) শক্তিশালীকরণ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) কার্যক্রম সম্প্রসারণ
- সরকারি জলাশয় ব্যবহারের জন্য জেলেদের আইডি কার্ডের ব্যবহার এবং
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ।

তথ্যসূত্র:

১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (বাংলায় অনূদিত), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। সংকলন, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯, মৎস্য অধিদপ্তর।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন: ২.৫	সময়: ১৪.০০-১৫.০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-১)**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল যেমন: ইফোর্ট কন্ট্রোল, সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, সী র‌্যাঙ্গিং ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইফোর্ট কন্ট্রোল এর গুরুত্ব এবং ইফোর্ট কন্ট্রোলের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সী র‌্যাঙ্গিং সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব • ইফোর্ট কন্ট্রোল (প্রজাতি, ঋতু, সরঞ্জাম ও অঞ্চল ভিত্তিক) • সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা • সী র‌্যাঙ্গিং	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর, আলোকচিত্র প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত আলোচনা	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: ভিডিও ক্লিপ, আলোকচিত্র, মানচিত্র, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-১)

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের জিডিপির ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৫.৩০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৮)। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়েও এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৬৮,৯৩৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশের আয় হয়েছে ৪,৩১০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক প্রায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক (প্রায় ১৫ লক্ষ নারীসহ) মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। দেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলায় প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য আহরণেই নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ ১৬ হাজার জেলে। বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলজুড়ে মোট ৬৭,৬৬৯ টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এবং ১,৮৩,৭৭৭টি জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দ্বারা প্রতিনিয়ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে। এভাবে অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ চলমান থাকলে অচিরেই দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ হুমকির মধ্যে পতিত হবে। তাই মৎস্য আহরণে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং এর সর্বেচ্চ টেকসই আহরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এই অধিবেশনে আমরা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যেমন: ইফোর্ট কন্ট্রোল, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এবং সী র‌্যাঙ্গিং ও স্টক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অলোচনা করবো।

ইফোর্ট কন্ট্রোল (Effort Control)

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মাছের অনিয়ন্ত্রিত আহরণ এবং অতিআহরণ একটি বড় সমস্যা। অতিআহরণজনিত কারণে মৎস্যকূলের বংশবিস্তার, প্রাচুর্য, বিস্তৃতি ও প্রজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজেই, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা, এবং সমুদ্রসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল ও নিয়ন্ত্রিতভাবে মৎস্য আহরণ করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অতিআহরণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী একাধিক কার্যকর পদ্ধতি প্রয়োগ হচ্ছে যার মধ্যে ইফোর্ট কন্ট্রোল অন্যতম।

বাংলাদেশে মোট ৪টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইফোর্ট কন্ট্রোল বা বন্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়, যা নিম্নরূপ-

- প্রজাতিভিত্তিক ইফোর্ট কন্ট্রোল, যেমন: মা ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা (২২ দিন), জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ (নভেম্বর-জুন, মোট ৮ মাস) ইত্যাদি;
- ঋতুভিত্তিক ইফোর্ট কন্ট্রোল বা বন্ধ মৌসুম, যেমন: সাগরে ৬৫ দিন সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ (২০ মে- ২৩ জুলাই), প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধ (২২ দিন) ইত্যাদি;
- সরঞ্জাম ভিত্তিক ইফোর্ট কন্ট্রোল, যেমন: মনোফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি জাল যেমন: কারেন্ট জাল, উপকূলীয় বেহুন্দী জাল; মশারি জাল, চরঘেরা জাল, চিংড়ি ট্রলনেট কড এন্ডে মেস সাইজ নূন্যতম ৪৫মি.মি., সাদা মাছ ধরার ট্রলনেট কড এন্ডে মেস সাইজ ন্যূনুম ৬০মি.মি., ভাসান জাল ইত্যাদি;
- অঞ্চলভিত্তিক ইফোর্ট কন্ট্রোল, যেমন: সমুদ্রে সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ; ৪০ মি. গভীরতা পর্যন্ত বাণিজ্যিক নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ;

বন্ধ মৌসুম (Seasonal Enclosure)

সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-উপাত্ত ও জেলেদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে মাছের প্রজনন ও প্রাচুর্যতা বাড়াতে উন্মুক্ত জলাশয়ে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাময়িকভাবে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়, এই মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ সময়ই বন্ধ মৌসুম নামে পরিচিত।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বন্ধ মৌসুমের গুরুত্ব ও করণীয়

বৈচিত্র্যময় জলজ সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত ফানেল আকৃতির বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রসীমানা নিয়ে ২০১২ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার ও ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. জলাশয়ে দেশের সার্বভৌম একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক (Blue Economy) সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ আরো বৃহৎ পরিসরে উন্মুক্ত হয়েছে। এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সাগর উন্নয়ন ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট গুরত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্যসম্পদের অবাধ বিচরণ, প্রজনন, প্রবেশন (recruitment) সহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে মৎস্যসম্পদ আহরণের নিষিদ্ধ সময় বা বন্ধ মৌসুম শনাক্তকরণ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে সমুদ্রসম্পদ নির্ভর জনগোষ্ঠীসহ সকল স্টেকহোল্ডারের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে সামুদ্রিক জলাশয়ে প্রচলিত মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম

- বঙ্গোপসাগরে ভারতের পূর্ব উপকূলে ১৫ এপ্রিল হতে ১৪ই জুন পর্যন্ত মোট ৬১ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ।
- দক্ষিণ চীন সাগরে ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্যকূলের প্রজনন নিরাপদ করার জন্য প্রতিবছর ১৬ মে থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত ৭৮দিন নিষিদ্ধ মৌসুম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।
- মিয়ানমারে মৎস্যের অতিআহরণ রোধে প্রতিবছর জুন থেকে আগষ্ট পর্যন্ত মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ।
- শ্রীলংকায় লবস্টার এর প্রজনন সময়ে (ফেব্রুয়ারি, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর) লবস্টার আহরণ নিষিদ্ধ।
- থাইল্যান্ডে আন্দামান সাগরের নিজস্ব জলরাশিতে প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ০৩ মাস মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইফোর্ট কন্ট্রোল কার্যক্রম

১. প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২% এবং জিডিপি'র প্রায় ১% অবদান রাখছে ইলিশ মাছ। সর্বপ্রথম 'হিলসা ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান' (HFMAP)- এর আওতায় ২০০৫ সালে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখা হয় ১০ দিন; এরপর ২০১১ সালে তা ১১ দিনে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে এ বন্ধ মৌসুমের স্থায়িত্ব ১৫ দিনে উন্নীত করা হয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালে Protection and Conservation of Fish Act, ১৯৫০ এর সেকশন ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার Protection and Conservation of Fish Rules, ১৯৮৫ এর rule 13 এর sub-rule (i) এর clause (b) এর সংশোধনক্রমে প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম ভরা পূর্ণিমার ৪ দিন পূর্বে, পূর্ণিমার ৪ দিন এবং পরবর্তি ১৭ দিন, মোট ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখা হয়েছে । মা ইলিশের বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের পূর্বে ২০০৩-০৪ অর্থ-বছরে যেখানে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ২.৫৬ লক্ষ মে. টন সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এসে ইলিশের উৎপাদন দাড়িয়েছে ৫.১৭ লক্ষ মে. টন। প্রজনন এলাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় গবেষণা জালের আহরণ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা আইন বলবতের সময় বাড়িয়ে ২২ দিন করায় ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলাশয়ের অন্যান্য মৎস্য প্রজাতির উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হওয়ায় সংরক্ষণে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৮)।

২. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ৬৫ দিন সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর সেকশন ৫৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ এ সংযোজিত ১৯ নং বিধি মোতাবেক সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্যকূলের প্রজনন ও সংরক্ষণ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা যে কোন প্রকার বা প্রজাতির মাছ এবং ক্রাস্টাশিয়ান আহরণে ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র বানিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। তবে যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল নৌযান এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় না থাকায় সমুদ্রে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এ প্রেক্ষিতে, ২০১৯ সাল হতে বিধি অনুযায়ী ৬৫ দিন সমুদ্রে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়া আহরণ বন্ধে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। সর্বশেষ, এপ্রিল, ২০২২ সালে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এর ধারা ৩ এর উপধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, উৎপাদন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই আহরণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় এবং সকল স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

৩. জাটকা রক্ষায় বন্ধ (নভেম্বর-জুন) মৌসুম

ইলিশের জীবনচক্র একটি জটিল প্রক্রিয়া। এরা পরিণত বয়সে সমুদ্রে অবস্থান করলেও প্রজনন মৌসুমে স্বাদু পানির নদ-নদীতে চলে আসে। ডিম ফুটে পোনা স্রোতের অনুকূলে ভাসতে থাকে এবং জাটকায় পরিণত হওয়ার পর পুনরায় সমুদ্রে ফিরে গিয়ে পূর্ণ বয়স্ক ইলিশে পরিণত হয় এবং পরিপক্কতা লাভ করে। একটি পরিপক্ক ইলিশ প্রায় ২০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছাড়তে পারে। সারা বছর কম বেশি ডিম ছাড়লেও ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম হচ্ছে আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমা হতে কার্তিক পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস)। এ সময় প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ইলিশ ডিম ছেড়ে থাকে। উপকূলীয় এলাকায় বা নদীতে এ মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ডিম ছাড়ার সময় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬০-৭০ ভাগ) জেলেদের জালে ধরা পড়ে যায়। একই ভাবে ডিম হতে উৎপাদিত নতুন পোনা বা জাটকা স্বাদুপানি হতে সমুদ্রে ফিরে যাবার পথে জেলেদের জালে ব্যাপক ভাবে ধরা পড়ে। যা ইলিশ উৎপাদনে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সরকার ২০১৪ সালে Protection and Conservation of Fish Act, ১৯৫০ এর সেকশন ৩ এর সাব-সেকশন (৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা Protection and Conservation of Fish Rules, ১৯৮৫ এর rule ৯ এর ২য় তফসিল সংশোধন করে প্রতি বছর নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ২৫ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ (জাটকা হিসেবে পরিচিত) চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত আহরণ, বহন, পরিবহণ, অফার, প্রদর্শন অথবা নিজ দখলে রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত মোট আট মাস জাটকা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকায় ইলিশের মোট উৎপাদন প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. সরঞ্জামভিত্তিক ইফোর্ট কন্ট্রোল:

বাংলাদেশের সকল জলাশয়ে মনোফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি জাল যেমন: কারেন্ট জাল দিয়ে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা সরঞ্জামভিত্তিক ইফোর্ট নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদাহরণ। সরকার ২০১৩ সালে The Protection and Conservation of Fish Act, ১৯৫০ এর সেকশন ৩ এর সাব-সেকশন (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা Protection and Conservation of Fish Rules, ১৯৮৫ এর rule ১২ এর সহিত পঠিতব্য করে নিম্নরূপ সরঞ্জামভিত্তিক ইফোট কন্ট্রোল আরোপ করে:

(ক) প্রতি বছর ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কটন, নাইলন বা অন্য কোন সিনথেটিক সুতার তৈরি সর্বোচ্চ ১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের যে কোন আকার বা আকৃতির মেস সাইজ বিশিষ্ট টানা জাল; কাঠি জাল (প্রচলিত নাম: মশারি জাল, চট জাল; স্থানীয় নাম: কাঁথা জাল, বেড় জাল, জগৎ বেড় জাল, ভীম জাল) দিয়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে।

(খ) যে কোন আকার, প্রকার, ধরন, ফাঁস বা মেস সাইজ বিশিষ্ট স্থিরকৃত জাল (প্রচলিত নাম: উপকূলীয় বেহুন্দী জাল Estuarine Set Bag Net-ESBN; স্থানীয় নাম: বাঁধা জাল, পেকুয়া জাল, বিঙ্গি জাল, গাড়া জাল, চিংড়ি পোনা ধরা জাল; খুটি/খোটা জাল, টং জাল, বিন্দি জাল) এর ব্যবহার দেশের সকল স্বাদু পানির জলাশয়ে এবং সর্বোচ্চ জোয়ারে ১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপকূলীয় জলসীমায় সারা বছরের জন্য নিষিদ্ধ।

অধিকন্তু,সরকার কর্তৃক চিংড়ি ট্রলনেট কড এন্ডে মেস সাইজ ন্যূনুম ৪৫ মি.মি. এবং সাদা মাছ ধরার ট্রলনেট কড এন্ডে মেস সাইজ ন্যূনুম ৬০ মি.মি. নির্ধারণ ইফোর্ট নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচ্য।

৫. অঞ্চলভিত্তিক ইফোর্ট কন্ট্রোল:

মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তার, জীববৈচিত্র্য এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার চিহ্নিত প্রধান প্রধান প্রজনন অঞ্চলে নির্ধারিত সময়ে বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষনা করে বিভিন্ন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইফোর্ট কন্ট্রোল করতে পারে। 'মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০' এর আওতায় ইলিশের চারটি প্রধান প্রজনন অঞ্চল ও ছয়টি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে; যাতে করে যথাযথভাবে এ মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয়।

বন্ধ মৌসুমে জেলেদের করণীয়

- ✓ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্য আহরণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা।
- ✓ নিজেরা এ অনুশাসন মানার পাশাপাশি অন্যদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা।
- ✓ মাছ ধরার বন্ধ মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- ✓ স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- ✓ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের আর্থসামাজিক অবদান ও পুষ্টিমান বিবেচনায় এর উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য ২০০২-০৩ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশে ইলিশের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়ে স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন রকম মৎস্য আহরণ বন্ধ মৌসুম বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে দেশের উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় সকল প্রজাতির মাছের জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিসহ মাছের উৎপাদন আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা

উৎপাদনশীল মৎস্যসম্পদের জন্য সহায়ক একটি সুস্থ সাগর এবং টেকসই ব্লু ইকোনমি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কনভেনশন অব বায়োডাইভার্সিটি (CBD) এর আইচি বায়োডাইভার্সিটি লক্ষ্যমাত্রা ১১ এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ১৪.৫ অনুযায়ী আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার কমপক্ষে ১০ ভাগ (প্রায় ১২০০০ বর্গ কিলোমিটার) এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

সামগ্রিকভাবে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় হুমকির সম্মুখীন প্রজাতি ও তাদের আবাসস্থলের নিরাপত্তা প্রদান করার মাধ্যমে জেলেদের টেকসই ও উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামুদ্রিক আবাসস্থল সুরক্ষার জন্য কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপিত একটি মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ, বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে ও টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি

মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩, ৮ম অধ্যায়, ২৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- ''সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমার যে কোন এলাকা এবং এর উপযুক্ত কোন পার্শ্ববর্তী বা চারপাশের ভূমি (adjacent or surrounding lands), নিম্নরূপ বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন মনে করলে, সেই সব এলাকাকে মেরিন রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে-

(ক) এইরূপ এলাকার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান এবং জলজ জীবের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ও আবাসস্থলের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বিশেষ করে সেই সব উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের প্রসংগে, যারা বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে; অথবা

(খ) যে সব এলাকায় সামুদ্রিক জলজ জীব ক্রমহ্রাসমান পর্যায়ে আছে (has been depleted), সেই সব এলাকায় প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা; অথবা

(গ) এরূপ এলাকায় বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও গবেষণা সুযোগের প্রসার; অথবা

(ঘ) এইরূপ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ এবং বর্ধন।''

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় মাছ শিকার, ড্রেজিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

(১) কোন ব্যক্তি ধারা ২৮ এর অধীন ঘোষিত সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় এই ধারার অধীন মঞ্জুরকৃত অনুমতি ব্যতিত-

(ক) মৎস্য আহরণ করে বা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে; অথবা (খ) ড্রেজিং করে, বালি ও কাঁকড় আহরণ করে, বর্জ্য বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ বা জমা করে অথবা অন্য কোনভাবে মৎস্য বা মৎস্যের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায়, পরিবর্তন বা ধ্বংস করে; অথবা

(গ) উক্ত সংরক্ষিত অঞ্চলভূক্ত কোন ভূমি বা জলাশয়ে ইমারত বা অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণ বা উত্তোলন করে, তাহা হইলে তিনি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) পরিচালক এই ধারায় বর্ণিত নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন, যদি সংরক্ষিত অঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা ধারা ২৮ এ উল্লিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে অনুরূপ কাজ করিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area)

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বপ্রথম ২০০০ সালে বঙ্গোপসাগরের মিডেল গ্রাউন্ড এন্ড সাউথ প্যাচেস এলাকায় ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা করে। অতঃপর ২০১৪ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সোয়চ অব নো গ্রাউন্ড MPA ঘোষণা করে যার আয়তন ১৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার (নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান বাদ রেখে) সামুদ্রিক এলাকায় নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করে। অত:পর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০২২ সালে সেন্ট মার্টিন MPA ঘোষণা করে যার আয়তন ১৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার। ফলে, বাংলাদেশে মোট সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৭৩৬৭বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মেরিন রিজার্ভ ও মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

১. বঙ্গোপসাগরের মিডেল গ্রাউন্ড এন্ড সাউথ প্যাচেস সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Marine Reserve) এলাকা

মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩ এর সেকশন ২৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২০০০ সালে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার মধ্যে এলিফ্যান্ট পয়েন্ট হতে ৫৫.৫ কিমি পশ্চিমে (বাউন্ডারি মার্ক ১), ৭৫.৮৫ কিমি পশ্চিমে (বাউন্ডারি মার্ক ২), ৬৬.৬০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে (বাউন্ডারি মার্ক ৩) এবং ৮৪.১৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে (বাউন্ডারি মার্ক ৪) মোট ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক সংরক্ষিত **(Marine Reserve)** এলাকা ঘোষণা করে।

২. নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Marine Reserve) এলাকা

মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩ এর সেকশন ২৮ এর ক্ষমতাবলে সরকার ২০১৯ সালে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার মধ্যে পায়রা বন্দর হতে ২৩.৫ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, চরফ্যাশান সদর হতে ১৪.৭ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে এবং মনপুরা হতে ২২.৯ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে মোট ৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Marine Reserve) এলাকা ঘোষণা করে।

৩. সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩(১) এবং ১৩(২) এর ক্ষমতাবলে সরকার বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন, শুশুক, তিমি এবং হাঙ্গর সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে মোট ১৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করে।

৪. সেন্ট মার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপদ) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩(১) ও ১৩(২) এর ক্ষমতাবলে প্রবাল, ডলফিন, হাঙ্গর, রে মাছ, কাছিম, সামুদ্রিক পাখি, সি-গ্রাস, সামুদ্রিক জীবন বৈচিত্র্য ও আবাসনস্থল সংরক্ষণ এর টেকসই মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ২০২২ সালে ১৭৪৩ বর্গকিলোমিটার "সেন্ট মার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য এমপিএ জোনেশন এবং বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বতন্ত্র জোন ব্যবস্থাপনা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নানাবিধ ব্যবহার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ-এর সফল বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার আদর্শ উপায় হলো Marine Spatial Planning (MSP) ও এর বাস্তবায়ন। এই প্রেক্ষিতে নিঝুম দ্বীপ সহ অন্যান্য এমপিএ-এর উদ্দেশ্য পূরণে মৎস্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি সংস্থা এবং সংরক্ষণ সংস্থার অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে MSP গ্রহণ করা যেতে পারে। নিঝুম দ্বীপ মেরিন রিজার্ভ-এর জন্য সমগ্র মেরিন রিজার্ভটি ৪ টি জোন এ ভাগ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে ১) মৎস্য পুনরুৎপাদন জোন, ২) মৎস্য পুনরুৎপাদন/মেরিন মেগাফোনা সংরক্ষণ জোন, ৩) কমিউনিটি মৎস্য ও পর্যটন উন্নয়ন জোন এবং ৪) টেকসই মৎস্য উৎপাদন জোন (নিম্নে আলোচিত)। যার আলোকে অন্যান্য মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ সমূহের ব্যবস্থাপনা কৌশল নেওয়া যেতে পারে।

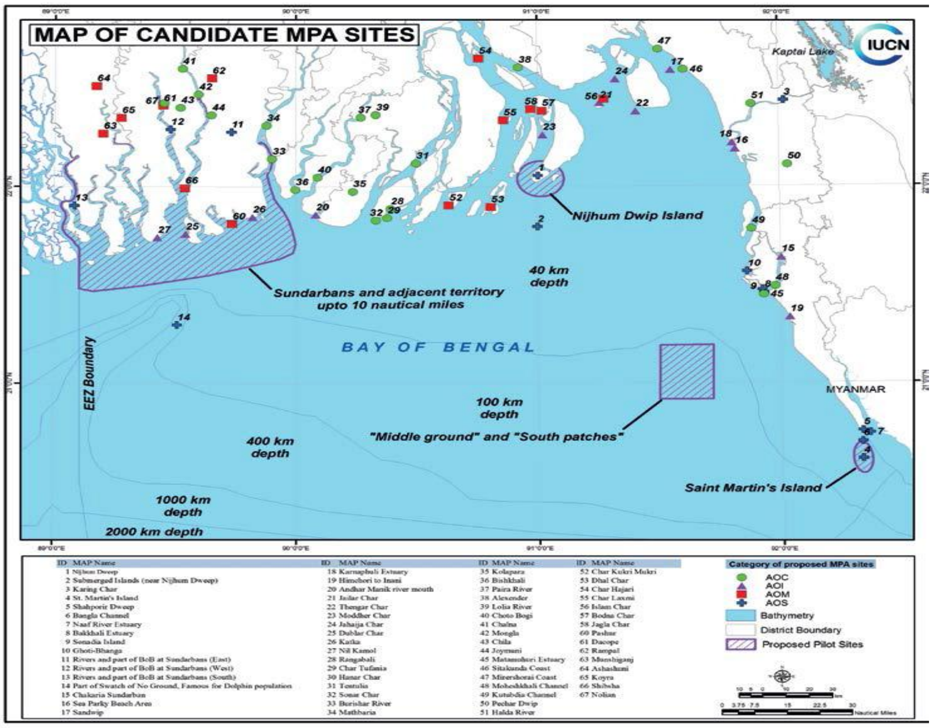

চিত্র ১: বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা সমূহ

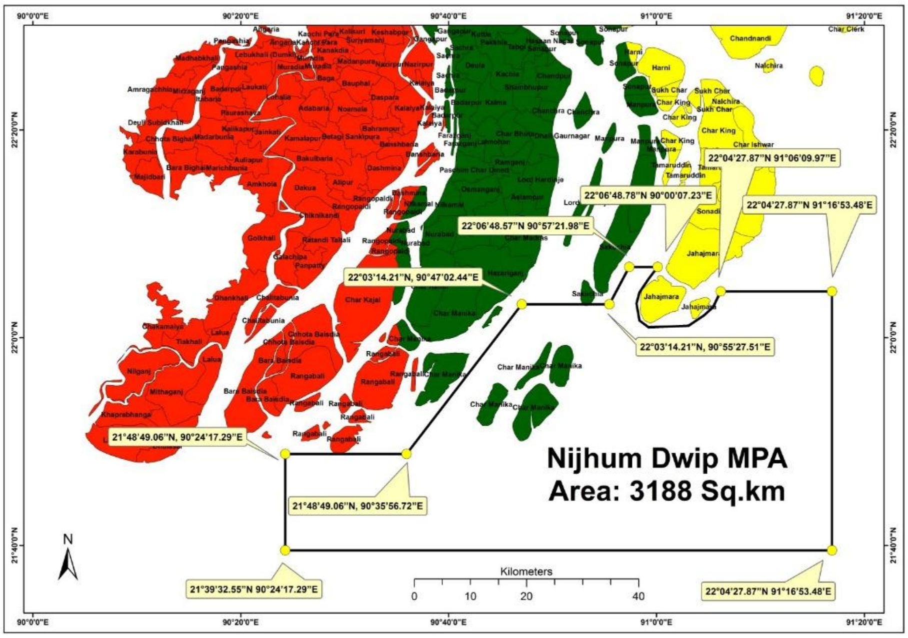

চিত্র ২: নিঝুমদ্বীপ মেরিন রিজার্ভ

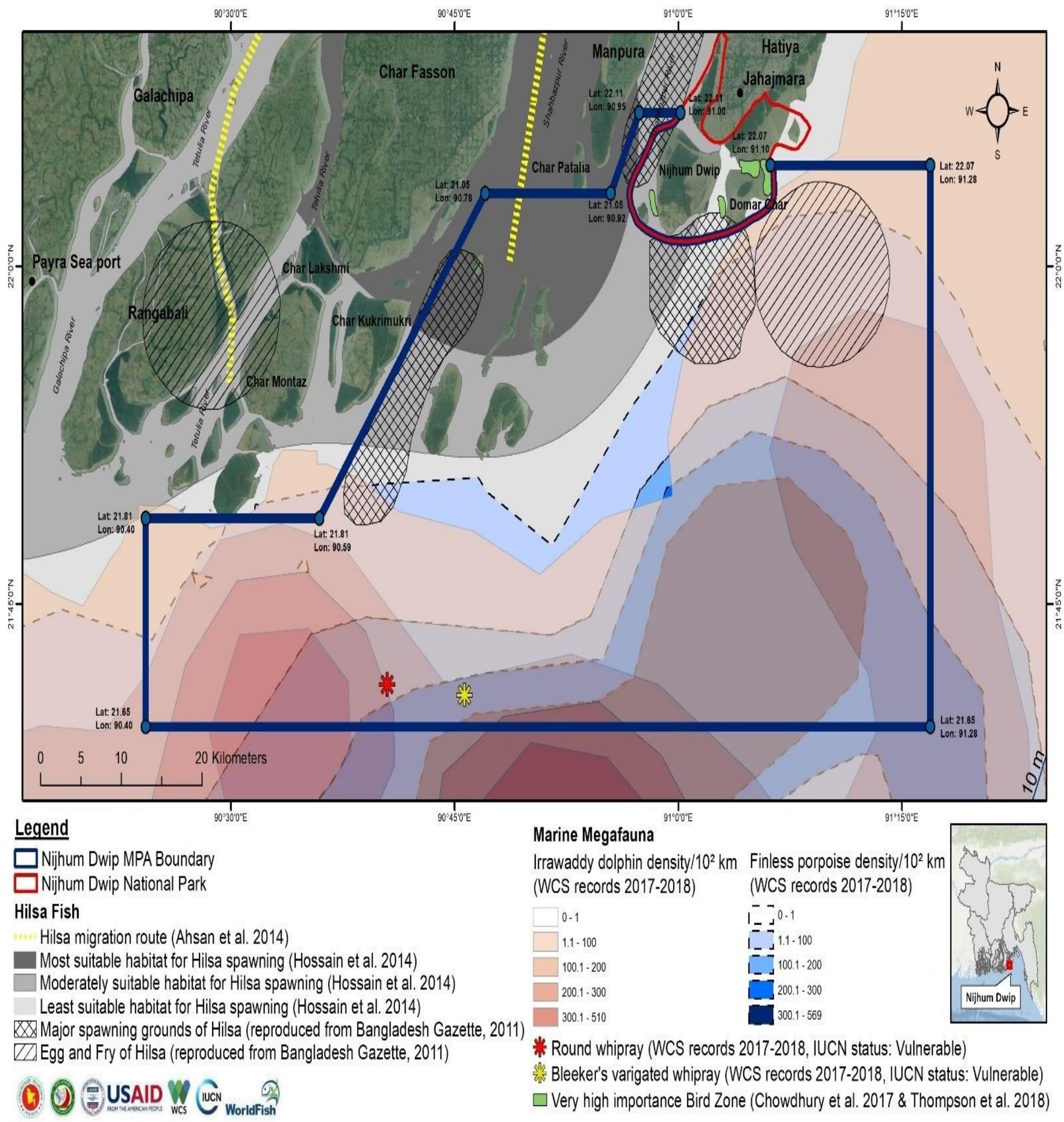

চিত্র ৩: নিঝুমদ্বীপ মেরিন রিজার্ভ এবং এর ব্যবস্থাপনায় সহায়ক কতিপয় তথ্য

বিভিন্ন এমপিএ জোন-এ নিম্নবর্তী ব্যবস্থাপনা কৌশল অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে:

সম্পূর্ণ মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ (Entire MPA/MR Zone)

বিদ্যমান আইনে নিষিদ্ধ বাঁধাজাল এবং কারেন্ট জাল এবং ৪০ মিটারের নীচে ট্রলিং জাল ব্যবহার কোস্টগার্ড ও নেভি থেকে সহযোগিতা নিয়ে, মৎস্য অধিদপ্তরের টহল এবং কমিউনিটি ভিত্তিক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং টুল এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে বন্ধ করা হবে। নিঝুম দ্বীপের জন্য লং লাইন বা আধারসহ এবং আধারবিহীন বড়শি ব্যবহারে জেলেদের জন্য ইস্যুকৃত পারমিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে যার মধ্যে অন্তত অর্ধেক পারমিট নিঝুম দ্বীপের জেলেদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাংলা মাস আশ্বিনের প্রথম চাঁদ-এ (সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর) ইলিশ ধরার ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে।

মৎস্য পুনরুৎপাদন জোন (Fish Replenishment Zone)

ইলিশ এর নির্বিঘ্ন মাইগ্রেশন নিশ্চিত করার জন্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস এবং ইলিশ প্রজননক্ষেত্র এবং অন্যান্য মাছের প্রজাতির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ সুরক্ষার জন্য সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সকল মাছধরার জলযান এই এলাকায় নিষিদ্ধ থাকবে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জাতীয় অর্থনীতির জন্য আবশ্যকীয়। এই অঞ্চলটি "spillover" প্রভাব এর মাধ্যমে মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একটি জলাধার হিসাবে কাজ করবে।

মৎস্য পুনরুৎপাদন/মেরিন মেগাফোনা সংরক্ষণ জোন

উচ্চ ঘনমাত্রায় বসবাসরত বিপন্ন ডলফিন, হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ রক্ষার জন্য এই এলাকায় সারা বছর সব ধরনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হবে, যা "spillover" এর প্রভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়।

কমিউনিটি মৎস্য ও পর্যটন উন্নয়ন জোন

এই অঞ্চলটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও মৎস্য অধিদপ্তর এর সহ-ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হবে। বিদ্যমান মৎস্য আইন অনুযায়ী নিঝুম দ্বীপের শুধুমাত্র ক্ষুদ্র পরিসরের জেলেরাই টেকসই কৌশল (যেমন মাছের ধরার ফাঁদ, বড়শি/হুক ও লাইন এবং খেপলা জাল) ব্যবহার করে এই এলাকায় মাছ ধরার সুযোগ পাবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকাকে সমর্থন করার জন্য, এই অঞ্চলটিতে পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম, যেমন ডলফিন দর্শন এবং সৌখিন মৎস্য শিকার পরিচালনা করা যেতে পারে।

টেকসই মৎস্য উৎপাদন জোন (Sustainable Fishing Zone)

টেকসই মৎস্য উৎপাদন জোনের বিধিবিধান জেলেদের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে যার লক্ষ্য হবে সর্বোত্তম মাছ ধরার কৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও টেকসই মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা এবং বিশ্বব্যাপী হুমকির মুখে থাকা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য যেমন ডলফিন, পরপয়েস, হাঙ্গর, শাপলাপাতা এবং সামুদ্রিক কচ্ছপদের রক্ষা করা। বিদ্যমান মৎস্য আইন এবং নিয়ম-কানুনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর জোর গুরুত্বারোপ করা হবে যার মধ্যে কারেন্ট জাল, বাঁধাজাল, ১০ সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল এবং বাণিজ্যিক ট্রলারের ৪০ মিটারের কম পানিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হবে।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার (মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ) প্রাতিষ্ঠানিক শাসন/পরিচালনা পদ্ধতি

মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ এলাকায় একটি কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক শাসন বা পরিচালনা পদ্ধতি ৩ টি পর্যায়ে বাস্তাবায়ন করতে হবে, যেমন: ক) লোকাল বা কমিনিউটি পর্যায়ে এক বা একাধিক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন, খ) উপজেলা বা আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি সমন্বিত ফাউন্ডেশন এবং গ) জাতীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সকল এমপিএ/মেরিন রিজার্ভসমূহের ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি।

সামুদ্রিক প্রাণিপালন এবং সী র‍্যান্সিং (Sea ranching and enhancing program)

সাগর রেঞ্চিং এবং বর্ধিতকরণ প্রোগ্রাম

সামুদ্রিক প্রাণিপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচি হলো মোহনা, উপকূলীয় এবং উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চলের মতো প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোতে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা/জুভেনাইল মজুদের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

সামুদ্রিক প্রাণিপালনের মধ্যে কিশোর মাছকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ছেড়ে দেয়া জড়িত যেখানে বাণিজ্যিক বা বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে আহরণের আগে পর্যন্ত তাদের বেড়ে ওঠার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। শিকারীদের হাত থেকে মাছগুলোকে রক্ষা করার জন্য এবং অবমুক্তির স্থান থেকে খুব বেশি দূরে সরে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য এই অঞ্চলগুলোকে সাধারণত বেড়া দেয়া হয়। মাছ পরিপক্কতায় পৌঁছে গেলে, বাণিজ্যিক বা বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে জেলেদের দ্বারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

অপরদিকে, সমুদ্র বর্ধিতকরণ কর্মসূচি, বিদ্যমান বন্য জনসংখ্যার পরিপূরক করার জন্য হ্যাচারি-পালিত মাছকে বনে ছেড়ে দেওয়া জড়িত। এটি প্রায়শই অতিরিক্ত মাছ ধরা, বাসস্থানের ক্ষতি বা অন্যান্য কারণের কারণে বন্য জনসংখ্যার হ্রাস অফসেট করার জন্য করা হয়। ছেড়ে দেওয়া মাছগুলোকে সাধারণত তাদের বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির হার নিরীক্ষণের জন্য এবং সেইসাথে তাদের গতিবিধি ট্র্যাক করার জন্য ট্যাগ করা হয়।

বাণিজ্যিক ও বিনোদনমূলক মাছ ধরার জন্য মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচি উভয়ই স্থানীয় সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা রাখে। যাইহোক, তাদের সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রোগের প্রবর্তন এবং স্থানীয় প্রজাতির স্থানচ্যুতি। অতএব, এই প্রোগ্রামগুলো অবশ্যই সাবধানে পরিচালনা করা উচিত যাতে তারা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি না করে।

সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকির পাশাপাশি, সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচিরও কিছু প্রযুক্তিগত এবং লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা অবশ্যই সমাধান করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, জিনগত বৈচিত্র্যের অভাব বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে দুর্বল অভিযোজনের কারণে হ্যাচারি-পালিত মাছের বেঁচে থাকার হার বন্য জনসংখ্যার তুলনায় কম হতে পারে। তদুপরি, বন্য জনসংখ্যার সাথে বেঁচে থাকার এবং সফল একীকরণের সম্ভাবনা সর্বাধিক করার জন্য মুক্তির সময় এবং অবস্থান অবশ্যই সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করা উচিত।

এই চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে, সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ প্রোগ্রামগুলোর জন্য সতর্ক পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে স্টকিংয়ের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি এবং স্ট্রেন নির্বাচন করা, হ্যাচারি স্টকের জেনেটিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা এবং উপযুক্ত প্রকাশের স্থানগুলো শনাক্ত করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিবেশগত মূল্যায়ন করা। উপরন্তু, প্রোগ্রামের ক্রমাগত অপারেশন এবং সম্ভাব্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রোগ্রামের সাফল্যের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন।

এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচি কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে, জাপানি সমুদ্র খাদের সামুদ্রিক পশুপালন বন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক খাবারের একটি টেকসই উৎস প্রদান এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে সমর্থন করতে সফল হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে, বর্ধিতকরণ কর্মসূচি সফলভাবে স্যামন এবং অন্যান্য বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান প্রজাতির ক্ষয়প্রাপ্ত জনসংখ্যা পুনরুদ্ধার করেছে।

সামগ্রিকভাবে, সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচীগুলোর সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার সময় অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস করার জন্য তাদের অবশ্যই যত্ন সহকারে পরিচালনা এবং মূল্যায়ন করতে হবে।

সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হল প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র এবং হ্যাচারি-পালিত মাছের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব। সমুদ্রের তাপমাত্রা এবং অম্লতার মাত্রা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মাছের জনসংখ্যার বন্টন এবং প্রাচুর্যও পরিবর্তিত হতে পারে, যা সমুদ্র পালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচির সাফল্যকে প্রভাবিত করে। এইভাবে, এই প্রোগ্রামগুলোকে পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং তাদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের অনুমানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধিকন্তু, জেনেটিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নির্বাচনী প্রজনন প্রাকৃতিক পরিবেশে হ্যাচারি-পালিত মাছের কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জেনেটিক মার্কারগুলো এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবং নির্বাচন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো বন্যের মধ্যে বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির প্রচার করে, যখন একাধিক হ্যাচারি স্টক বা ক্যাপটিভ প্রজনন প্রোগ্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে জেনেটিক বৈচিত্রতা বজায় রাখা যেতে পারে।

পরিশেষে, সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচির সাফল্যের জন্য সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সম্প্রদায় এবং মাছ ধরার শিল্পগুলোকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকতে হবে এবং এই প্রোগ্রামগুলোর সম্ভাব্য সুবিধা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এটি প্রোগ্রামের স্থায়িত্বকে উন্নীত করতে, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ও সমর্থন গড়ে তুলতে এবং জ্ঞান ও সম্পদ ভাগাভাগি করতে সহায়তা করতে পারে।

উপসংহারে, সামুদ্রিক পশুপালন এবং বর্ধিতকরণ কর্মসূচি মাছের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য একটি টেকসই এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর সমাধান প্রদান করতে পারে। যাইহোক, এই প্রোগ্রামগুলো সাবধানে পরিকল্পিত, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা উচিত যাতে তাদের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন: ২.৬	সময়: ১৫.১৫-১৬.১৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ (পার্ট-২)**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল যেমন: এমসিএস, ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, সহ-ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা ও জোনিং ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমসিএস পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং এবং জোনিং সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমসিএস পদ্ধতি • ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা • সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা • মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং এবং জোনিং	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: পোস্টার, হ্যান্ডআউট, মানচিত্র, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ (পার্ট-২)

বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের এক বিশাল ভান্ডারে সমৃদ্ধ হলেও সমুদ্র হতে যথেচ্ছভাবে সম্পদ আহরণ এবং অতিআহরণের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের মজুদ ক্রমান্বয়ে হুমকির মধ্যে পড়ছে। আইন বহির্ভূত মৎস্য আহরণ এবং নির্বিচারে মৎস্য নিধন সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম এর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকায় অন্তরায়। তাই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকরি পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যা সাধারণভাবে MCS পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (Monitoring Control and Surveillance)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই আহরণের জন্য প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের পদ্ধতিকে এক কথায় MCS পদ্ধতি বলা হয়।

পরিবীক্ষণ (Monitoring): এমসিএস পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণ বলতে বুঝায় মৎস্য আহরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ এবং তথ্য বিশ্লেষণ। এসব তথ্যের মধ্যে আহরিত মাছ, প্রজাতি সংখ্যা, প্রজাতির পরিমাণ, মাছ আহরণে ব্যবহৃত নৌকা ও জালের ধরন এবং সংখ্যা, পরিত্যক্ত মাছের পরিমাণ, মৎস্য আহরণ এলাকা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

নিয়ন্ত্রণ (Control): মৎস্যসম্পদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই আহরণ নিশ্চিতকল্পে প্রণীত জাতীয় মৎস্য আইন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও শর্তের আলোকে মৎস্য আহরণই মৎস্য নিয়ন্ত্রণ।

তদারকি (Surveillance): মৎস্য আহরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জাতীয় আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রতিফলন এবং মাছ ধরার নির্ধারিত শর্তাবলী ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার তত্ত্বাবধান করাই এক কথায় তদারকি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৪ মোতাবেক সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতিআহরণ, অবৈধ, অপ্রকাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসান ঘটানোর জন্য MCS বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নাই।

জেলেদের নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং জেলেদের জীবন মানোন্নয়নে তাদের প্রকৃত তথ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মৎস্যজীবীদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৬ লাখ ২০ হাজার জেলেকে নিবন্ধিত করে এর মধ্যে ১৪ লাখ ২০ হাজার জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করেছে। জেলে নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র নির্দেশিকা ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য নৌযান নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বাংলাদেশ সামুদ্রিক জলসীমায় মাছের অনিয়ন্ত্রিত আহরণ রোধে প্রতিটি মৎস্য নৌযান নিবন্ধন, লাইসেন্সিং এবং মৎস্য আহরণের অনুমতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

১. বাণিজ্যিক ট্রলারের লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বাংলাদেশের জলসীমায় গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রতিটি বৈধ ট্রলার বা মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অংশ III সেকশন ৮ এ সকল প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষমতা পরিচালক (সামুদ্রিক) এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ট্রলার ব্যতীত অন্য কোন ট্রলার হতে ফিশিং লাইসেন্স ফি আদায় কিংবা ফিশিং লাইসেন্স প্রদান করা হয় না।

২. যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং কার্যক্রম

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা ১৭ ও ১৮ মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল নৌযানের লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। সরকার কর্তৃক এস আর ও নং-২৭৫-আইন/৯২, তারিখ: ২৬/১২/১৯৯২ খ্রি. মূলে সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা এর Rule-৬ সংশোধন হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল নৌযানের (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন (সিওআই) গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

জেলে ও মৎস্য নৌযান নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম এর গুরুত্ব:

জেলে ও মৎস্য নৌযান নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম এমসিএস (MCS) পদ্ধতির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো:

- জেলে ও নৌযান সহজে চিহ্নিতকরণ সম্ভব হবে;
- আইইউইউ ফিশিং প্রতিরোধে সহায়ক হবে;
- সমুদ্রে শৃঙ্খলা আনায়ন সহ অবৈধ কার্যক্রম যেমন: অবৈধ মৎস্য আহরণ, মানব পাচার, মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়;
- প্রকৃতিক দুর্যোগে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া জেলে ও নৌযান এর অবস্থান চিহ্নিতকরণ সম্ভব হবে;
- ভবিষ্যতে সরঞ্জাম/নৌযানের ধরন অনুযায়ী নৌযানের সর্বোচ্চ আহরণসীমা নির্ধারণ সহায়ক হবে;
- প্রধান প্রধান প্রজাতিভিত্তিক মৎস্য আহরণ তথ্য সংগ্রহ সহজ হবে যা সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে;
- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমূহের ডাটাবেইজ উন্নয়ন ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করাসহ এখাতে সরকারের রাজস্ব আদায় (ফিশিং লাইসেন্সিং) সহজতর করা সম্ভব হবে;
- লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য নৌযানসমূহে আধুনিক যোগাযোগ যন্ত্র যেমন: Automatic Identification System (AIS), Global System Mobile (GSM) ইত্যাদি সংযোজন করে Safety of Life at Sea (SOLAS) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- সহ-ব্যবস্থাপনা সহায়ক হিসেবে কাজ করবে;
- সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সহায়তা, সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সহজ হবে;
- সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জেলেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- সংকট ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা- যেমন: দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, মৎস্য আহরণকালে জীবনহানি বা অঙ্গহানির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান, মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে খাদ্য/অর্থ প্রদান ইত্যাদি স্বচ্ছতার সাথে প্রতিপালন করা সম্ভব হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য নৌযান পার্শ্ববর্তী দেশে আটকে গেলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাবর্তন সহজ হবে।

ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১৪.২ এ সাগর-মহাসাগরের সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে ২০২০ সালের মধ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতিসমূহের এবং সমুদ্রের স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রজাতিসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, তাদের পরিবেশ এবং সামুদ্রিক মাছের ওপর নির্ভরশীল মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর। এসকল বিষয় বিবেচনায় রেখে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা।

সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতিসমূহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করে সামুদ্রিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলে, যেমন- ধ্বংসাত্মক মৎস্য আহরণ, অতি আহরণ, মাছের আবাসস্থল ধ্বংস বা পরিবর্তন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, পানির গুণাগুণ পরিবর্তন যেমন- অম্লতা বৃদ্ধি (এসিডিফিকেশন), স্থলভাগ থেকে ও জাহাজের বর্জ্য দ্বারা সমুদ্রের পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি। কাজেই, সামুদ্রিক মাছের প্রাপ্যতা, প্রজনন, বৃদ্ধি, খাদ্য শৃংখল, সমুদ্রের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং টেকসই আহরণের জন্য ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

- সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম/বাস্তুসংস্থানের টেকসই উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনমান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন।
- সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম/বাস্তুসংস্থানের অবক্ষয় রোধ করা।
- সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি-সমন্বয় যা পরিবর্তিত হলে সামুদ্রিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হতে পারে তেমন ঝুঁকি হ্রাস করা।
- সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমকে আপস (compromise) না করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস্য শিল্পকে লাভজনক করা।
- সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম/বাস্তুসংস্থান বিষয়ক জ্ঞান আহরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি যাতে মানবসৃষ্ট কারণে সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ অনুধাবিত হয় এবং ক্ষতি হ্রাস পায়।

প্রচলিত মৎস্য ব্যবস্থাপনার সাথে ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক চিত্র:

বিষয়	প্রচলিত মৎস্য ব্যবস্থাপনা	ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা
প্রজাতি	প্রধানত টার্গেট প্রজাতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	বাস্তুতন্ত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি, বিশেষত যারা মৎস্য আহরণ কার্যকলাপ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত।
মূল্যায়ন (assessment) পদ্ধতি	স্টক মূল্যায়ন, অবতরণ, সিপিইউই (CPUE), মডেলিং	বহু প্রজাতিভিত্তিক মূল্যায়ন, দূর্বলতা (Vulnerability) মূল্যায়ন, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ইকোসিস্টেম সূচক, স্থানীয় জ্ঞান
	তথ্য-দুর্বল পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাব।	তথ্য-দুর্বল পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য	প্রধানত জৈবিক, কিছু অর্থনৈতিক	পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক
সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি	ব্যবস্থাপক বা সরকারি সংস্থা দ্বারা চালিত।	অংশগ্রহণমূলক; অংশীদারগণের জড়িত থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।
	জৈবিক বা মৎস্য অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল	সামাজিক ও পরিবেশগত কল্যাণের ভারসাম্য রক্ষার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।
	কেবলমাত্র জেলেদেরকে গুরুত্ব প্রদান করে।	বিভিন্ন ধরনের অংশীদারগণের অগ্রাধিকার বিবেচনার সক্ষমতা তৈরি করে।
ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপসমূহ	আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল	স্বেচ্ছায় সম্মতির বা শর্তপূরণের উচ্চ সম্ভাবনা। অন্যান্য প্রণোদনা দ্বারা সমর্থিত (যেমন: বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা উন্নয়ন)
	প্রধানত মৎস্য আহরণের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ (ইফোর্ট, মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি ইত্যাদি)	মৎস্য বহির্ভূত বিষয় (non-fishery) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ (যেমন: শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, বন্ধ এলাকা ইত্যাদি)
	মৎস্যসম্পদের ওপর প্রভাব ফেলে এরূপ বহিরাগত কারণ (external factors) বিবেচনার/মোকাবেলার সীমিত ক্ষমতা	মৎস্যসম্পদের ওপর অন্যান্য ব্যবহারকারীদের প্রভাব বিবেচনা/মোকাবেলা (addresses) করে।

ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তন এবং নানা প্রতিকূলতার জন্য মাছের স্বাভাবিক আচরণ এবং মৎস্য জনতায় পরিবর্তন আসছে। তাই পরিবর্তিত পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি আবাসস্থল পরিবর্তন করছে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মৎস্যসম্পদেও প্রাচুর্যতায় পরিবর্তন আসছে। অনেক দেশেই একক প্রজাতির মাছকে অভীষ্ট প্রজাতি হিসেবে টার্গেট করে মাছের অর্থনৈতিক বাজার গড়ে তোলা হয়। যেমন বাংলাদেশে ইলিশ, অনেক দেশে টুনা, স্যামন ইত্যাদি। অন্যান্য মাছের পরিবেশ, আবাসস্থল বিবেচনা না করে শুধু একক প্রজাতির উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ সমুদ্রের সামগ্রিক পরিবেশ এবং সকল প্রজাতির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাই সকল ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির প্রজাতিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মাছের প্রাপ্যতা এবং সামুদ্রিক মাছের ওপর নির্ভরশীল উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন নতুন প্রজাতির মাছকে অভীষ্ট প্রজাতি হিসেবে গ্রহণ করে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার উপায় বের করতে হবে। যেমন

ইকোসিস্টেমভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ

লাভজনক বা মুনাফাভিত্তিক একক প্রজাতি নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ না করে সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম/বাস্তুসংস্থান বিষয়ক জ্ঞান বিবেচনায় রেখে ইকোসিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রজাতিভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তদ্রুপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। ইতোমধ্যে যেসকল প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হ্রাস পেয়েছে এবং বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে সেসকল প্রজাতি/মাছের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ, ঝুঁকি বা দুর্বলতা নিরূপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ইকোসিস্টেমের পরিমাপক/সূচক নির্ধারণ, স্থানীয় জ্ঞানের সমন্বয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্টেকহোল্ডার/অংশীজনের সমন্বয়ে অংশগ্রহণমূলক সার্বিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

মাছের আবাসস্থল রক্ষা

কোরাল রীফ, মাছের প্রজননস্থল সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে মাছ খাদ্য গ্রহণ, আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারে সেইসব স্থানকে মাছের আবাসস্থল বলে গণ্য করা হয়। মাছ ধরার সময় আমরা মাছের আবাসস্থল বিনষ্ট হচ্ছে সেদিকে নজর দেইনা কিন্তু সামুদ্রিক মাছের পরিবেশ এবং মাছের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে আবাসস্থল রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাই ক্যাচ বা অনাকাঙ্ক্ষিত মাছের আহরণ কমানো

বাইক্যাচ বলতে বোঝায় লক্ষ্য বহির্ভূত মাছ বা সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণী যেমন- হাংগর, তিমি, সামুদ্রিক পাখি, বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি যা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মাছ ধরার সময় জালে উঠে আসে। এই ধরনের প্রাণিগুলো সমুদ্রের বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই এদের আহরণ কমাতে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে আইনকানুন জোরদার করতে হবে।

ফোরাজ ফিশ (খাদ্য মাছ) সংরক্ষণ

সার্ডিন জাতীয় ও অন্যান্য ছোটমাছকে বিভিন্ন বড়মাছ, তিমি, সামুদ্রিক পাখি ইত্যাদি প্রাথমিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। নির্বিচারে এসব মাছ ধরে ফেললে বড়মাছসমূহ খাদ্যাভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে যা সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং বড়মাছের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও কমে যাবে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা এক ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, যেখানে অংশীদারিত্বমূলকভাবে সরকারি সংস্থা, বিভিন্ন সম্প্রদায়, এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজনের (যেমন- জেলে, মাছ বেপারি, আড়তদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি) সমন্বয়ে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করা হয়। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা অপেক্ষাকৃত একটি জটিল প্রক্রিয়া। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয় এবং সম্পদ এই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। এই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকলের অধিকার সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বন্টনের জন্য সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে অন্যান্য অংশীজনের বিশেষভাবে জেলেদের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সহব্যবস্থাপনা একটি মধ্যবর্তী কৌশল যা রাষ্ট্রিয় মূলধারা এবং স্থানীয় ব্যবস্থার মাঝামাঝি থেকে অধিক কার্যকরী ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়।

সমাজভিত্তিক মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা

সমাজভিত্তিক উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে অনেক সাদৃশ্য আছে তবে আলোকপাত এবং কৌশল কিছুটা ভিন্ন। পার্থক্যটা সরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। সমাজভিত্তিক উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা দলকেন্দ্রিক এবং সম্প্রদায় অভীষ্ট ব্যবস্থা কিন্তু মৎস্য সহব্যবস্থাপনা এর বাইরেও একটি অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা যেখানে সরকারি সংস্থা, দলীয় সম্প্রদায় এবং সম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হয়।

সমাজভিত্তিক মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনার শর্তসমূহ

- বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রচলিত পদ্ধতিলুব্ধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ।
- স্থানীয় জনতার মতামতের প্রেক্ষিতে কোন আইন প্রণীত হলে স্থানীয় জনতা নতুন আইন মেনে চলবে এবং অন্যদেরও আইন মেনে চলতে সাহায্য করবে।
- মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জরুরি তথ্যে প্রবেশাধিকার থাকবে।
- স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকবে।
- গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিরাজমান থাকবে।

সমাজভিত্তিক মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা

- বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা অর্জন করা কঠিন।
- সরকারি সংস্থার সাথে একসাথে কাজে আগ্রহী হয়না।
- তথ্য সরবরাহ এবং যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে সবাইকে শিক্ষিত করা জরুরি ।
- বিভিন্ন মতবিরোধী দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।
- প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।
- বিরতিহীন যোগাযোগের প্রয়োজন হয় যা দুরূহ।
- অনেকসময় এনজিও এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সম্পৃক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে যা দুরূহ।

মেরিন স্প্যাশাল প্ল্যানিং এবং জোনিং (Marine Spatial Planning and Zoning)

মেরিন স্প্যাশাল প্ল্যান বা সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা হচ্ছে একটি সামগ্রিক কোস্টাল এন্ড মেরিন স্পেস ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা, যা সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার অংশগ্রহণে মেরিন স্পেস প্ল্যানিং এর সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এর ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের মেরিন স্পেস ব্যবহার সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন হবে এবং সামুদ্রিক সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমুদ্রসম্পদ ব্যবহারে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনের জন্য একটি জাতীয় Marine Spatial Plan (MSP) প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এটি SDG target ১৪.২ অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ২০২২ সাল হতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করে মেরিকালচার একশন রিসার্চ বা উৎপাদন পাইলটিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে মেরিকালচার জোনিং সম্ভব হবে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্প হতে মার্চ ২০২৩ সালে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংকে MSP Web-GIS Platform উন্নয়নের জন্য চুক্তি করা হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় আর্টিসানাল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং জোন, সম্ভাব্য টুনা ফিশিং জোন, মেরিকালচার জোন, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, ইলিশ মাইগ্রেশন রুট, ইলিশ অভয়াশ্রম, চিংড়ি নার্সারি জোন, ফিশ ল্যান্ডিংসহ উপকূলীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে মেরিন স্প্যাশাল প্ল্যান উন্নয়ন করা হবে। এর পাশাপাশি, মেরিটাইম বাউন্ডারি, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, স্যালাইনিটি ও ক্লোরোফিল ঘনত্ব ম্যাপিং এবং অন্যান্য সেক্টরের মেরিন স্পেস ব্যবহারের বিষয়গুলো, যেমনঃ তেল ও গ্যাস ব্লক, পোর্ট ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া, শিপিং রুট, সি ট্রাফিক, সাবমেরিন কেবল, মিলিটারি ফায়ারিং এরিয়া, ট্যুরিজম এরিয়া, ক্রিটিক্যাল ইকোলজিক্যাল এরিয়া, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/মন্ত্রণালয়সমূহ চূড়ান্ত করবে।

তৃতীয় দিন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০৩	অধিবেশন: ৩.১	সময়: ০৯.০০-০৯.৩০	মেয়াদকাল: ৩০ মিনিট

অধিবেশন শিরোনামঃ প্রাত্যহিক পুনরালোচনা ও প্রতিভাব এবং সান্ধ্যকালীন দলীয় কাজের উপস্থাপনা

শিরোনামঃ	**প্রাত্যহিক পুনরালোচনা ও প্রতিভাব এবং সান্ধ্যকালীন দলীয় কাজের উপস্থাপনা**
অভীষ্ট দল:	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
লক্ষ্য:	অংশগ্রহণকারীদের গত দিনের কার্যক্রম ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পুনরালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তাঁরা পূর্বদিনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পুনরালোচনা করে এবং কারো কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে শিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারেন।
উদ্দেশ্য:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পূর্বদিনের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পুনরালোচনার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময়
ভূমিকা		
১. ৩য় দিনে সকলকে স্বাগত জানানো ও কুশল বিনিময়। ২. গতদিনের ভাল-মন্দ বিষয়গুলো জানা ও সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি করা। ৩. চলতি অধিবেশনের আলোকপাত ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা। ৪. এ অধিবেশনের আওতাভুক্ত বিষয়বস্তু, কার্যক্রম ও সময় সম্পর্কে জানানো।	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	৪ মিনিট
বিষয়বস্তু		
১. পূর্বদিনের পুনরালোচনা		
প্রশিক্ষক একজন অংশগ্রহণকারীকে সহায়ক হিসেবে নির্বাচন করবেন যিনি গত দিনের সমস্ত অধিবেশনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরালোচনা করবেন।		
সারসংক্ষেপ		
১. প্রাত্যহিক জার্নাল উপস্থাপন, প্রাত্যহিক পুনরালোচনা ও দলীয় উপস্থাপনায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ২. পরবর্তী অধিবেশন "**পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS): পদ্ধতি ও প্রয়োগ**" এর আলোকপাত ও সকলের অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানানো।	বক্তৃতা-আলোচনা	৬ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী	বোর্ড, মার্কার ও প্রস্তুতকৃত দলীয় ফ্লিপচার্ট।	

প্রশিক্ষক বা সহায়কের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা:

বিষয়বস্তু অংশে প্রশিক্ষক বা সহায়ক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর আলোকে কী, কেন, কোথায়, কখন, কার দ্বারা, কিভাবে ও সতর্কতা, বিশেষ বক্তব্য বা নির্দেশনা গুরুত্বসহ উপস্থাপন করবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০৩	অধিবেশন: ৩.২	সময়: ০৯.৩৫-১০.৩৫	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS): পদ্ধতি ও প্রয়োগ

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি পদ্ধতি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি পদ্ধতির গুরুত্ব এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণ কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক সনদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- MCS পদ্ধতির সঠিক মানদণ্ড নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের উপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি পদ্ধতির গুরুত্ব • মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমসিএস এর প্রয়োগ • MCS বাস্তবায়নের বর্তমান গতিধারা • সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণ কাঠামো • নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক সনদ • MCS পদ্ধতির সঠিক মানদণ্ড নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তা	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সার-সংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয় সমূহের সার সংক্ষেপ • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS): পদ্ধতি ও প্রয়োগ

সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বেই নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে। 'যার যেভাবে খুশি সম্পদ আহরণের অধিকার' (Open access) নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরি প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য আহরণ থেকে অতিরিক্ত ইফোর্ট (effort) কমানো মৎস্যসম্পদের টেকসই উৎপাদন ও সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণের জন্য খুবই জরুরি। বর্তমান বিশ্বে MCS পদ্ধতি মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় একটি প্রধান উপাদান। বিগত ১৯৮০ হতে ১৯৯০ এর দশকে মৎস্য ভান্ডারসমুহে দ্রুত মাত্রায় মৎস্য মজুত কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ মৎস্য আহরণ কার্যক্রম ও মৎস্য জাতীয় পণ্যের অবাধ গতিবিধিতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। 'আইন বর্হিভূত মৎস্য আহরণ' (Illegal Fishing) সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম ও এর উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি প্রধান অন্তরায় ও হুমকি হিসেবে গণ্য করা হয়। বিগত দশকে কার্যকর এমসিএস পদ্ধতির গুরুত্বকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাঁড় করানোর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক আনুষ্ঠানিকতা বিশেষ করে আইনসম্মত দলিলপত্র (International Instruments) প্রস্তুত করা হয়েছে। অবৈধ, গোচরবিহীন ও অনিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported & Unregulated -IUU Fishing) মৎস্য আহরণ বন্ধ করা ও নিজ দেশের MCS প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহু দেশই এসব আর্ন্তজাতিক আইন-কানুনসমূহকে বিশেষ করে 'আর্ন্তজাতিক কর্মপরিকল্পনা' (International Plan of Action to prevent IUU) †ক নিজেদের মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করে সফল হয়েছে। MCS পদ্ধতি ছাড়া যে কোন মৎস্য ব্যবস্থাপনাই বর্তমানে অসম্পূর্ণ ও অকার্যকর।

মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমসিএস এর প্রয়োগ

মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমসিএস পদ্ধতি কার্যকরকরণে প্রধান প্রধান কৌশলসমূহ (Tools) নিম্নরূপ:

- সংশ্লিষ্ট সকল মহলের অংশগ্রহণে কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ।
- কার্যকরযোগ্য আইন/বিধিবিধান ও নিয়ন্ত্রণের কার্যসাধন পদ্ধতি (লাইসেন্স ইত্যাদি)।
- উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন: জাহাজ ঘাটা পরিবীক্ষণ (Dock side monitoring), পর্যবেক্ষক (Observer), সমুদ্র ও বন্দর পরিদর্শন ইত্যাদি।
- যোগাযোগ পদ্ধতিতে সাহায্য সহযোগিতা যোগান (supporting communication system)।
- মৎস্য নৌযান বহরের সাথে তাল মিলিয়ে সমুদ্রে অবস্থান করত প্রলম্বিত অভিযান পরিচালনায় সক্ষম তদারকি জাহাজ (patrol vessel)।
- বিশাল এলাকায় তাৎক্ষণিক ও দ্রুত কার্যকর টহল দেওয়ার মত উড়োজাহাজের প্রাপ্যতা।
- VMS, স্যাটেলাইট, ইনফ্রারেড, ট্র্যাকিং ইত্যাদির মত নতুন নতুন প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার।
- সংযুক্ত ও ভূমি হতে পরিবীক্ষণ (linked, land based)।
- মৎস্যজাত শিল্পের উদ্যোক্তা ও মৎস্য আহরণকারীদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা-সমর্থন (support)।
- এমসিএস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ (component) এর সাথে দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা।
- পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী।
- যৌথ পরিবীক্ষণ (joint monitoring)

এমসিএস পদ্ধতির আলোকে পরিকল্পনা, আয়োজন ছক (Design) ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে যে ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন তা যে কোন সরকারের জন্যই প্রাথমিকভাবে গুরুত্বহ ও উদ্বেগের বিষয়। বেসামরিক জনপ্রশাসনে সম্পৃক্ত ব্যক্তির নিকট মৎস্য বিষয়ক আইন প্রয়োগের কার্যকরণ (enforcement) একটি ব্যয় সাশ্রয়ী (cost effective) কর্মকাণ্ড। তবে অনেক সরকারের ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনী শক্তভাবে এমসিএস পদ্ধতির প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য সর্মথন দিতে পারে। এ ধরনের সরকারগুলোর জন্য একটি আন্তঃসংস্থা পদ্ধতি তৈরি করার প্রয়োজন যাতে মৎস্য প্রশাসকগণ সামরিক প্রতিপক্ষের সাথে প্রয়োজনের সময় একযোগে কাজ করতে পারে।

এম সি এস পদ্ধতি প্রয়োগে ঝুঁকিসমূহ

অধিকাংশ মৎস্য ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক এমসিএস পদ্ধতি ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা ব্যস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এর সংকটপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝতে পারেন না। কারও কারও মতামত হলো এমসিএস প্রয়োগের কার্যকারিতার একমাত্র পরিমাপক (Indication) অপরাধীদের বন্দী করা। কিন্তু এমসিএস বাস্তবায়নের আসল পরিমাপক হলো সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের মান্যতার স্তর (Level of compliance) এবং এটি বিভিন্ন উপাদান (Factor) দ্বারা চালিত হয়ে থাকে যেমনঃ মৎস্য আহরণকারীর সংখ্যা, মৎস্য নৌযানের সংখ্যা, নজরদারির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও এলাকার পরিমাণ (effect and area coverage of patrol), নজরদারির ফলাফল, স্বপ্রবৃত্ত মান্যতা বৃদ্ধির পরিমাণ (Increase of voluntary compliance) ইত্যাদি।

কার্যকরি এমসিএস পদ্ধতি হলো দ্বি-মুখী (two pronged) ও সমান্তরাল প্রস্তাবনায় (Parallel approach) এগিয়ে নেওয়া, নিবারন (Prevention) ও নিরুৎসাহিতকরণ (Deterrence) এর উপর আস্থা রাখা। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে যে সব মৎস্য আহরণকারী অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক মৎস্য আহরণ করে থাকে তাদেরকে আইন পালনে বাধ্য করার জন্য এমসিএস পদ্ধতির প্রয়োগ কার্যকরকরণ (Deterrence and enforcements) এর বিভিন্ন ধাপ হলো- পরির্দশন (Inspection), তদন্ত (Investigation), নিরোধ (Preventions) ও আদালতে আইনগত ব্যবস্থা (court proceedings)। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মৎস্যজীবীদের চাইতে যদি আইন অমান্যকারীরা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হয় বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশি পেয়ে যায় তাহলে সমাজের সংশ্লিষ্ট শ্রেণির (Stakeholder) ভিতরে স্বপ্রবৃত্ত মান্যতা (Voluntary compliance) বৃদ্ধির চাইতে বরং কমে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

এমসিএস এর ব্যাপনস্থলের উপাদানসমূহ (MCS spatial components)

এমসিএস এর ব্যাপনস্থলের (spatial) তিনটি প্রধান component রয়েছে যেমনঃ ভূমি, সমুদ্র ও আকাশ। এমসিএস প্রক্রিয়ায় ভূমি (land) অংশের কাজ হলো এটিকে সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগানো, সকল এমসিএস কর্মপ্রক্রিয়ায় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সবকিছুতে সমন্বয় সাধন করা, বন্দর পরিদর্শন, জাহাজঘাটা তদারকি, trans-shipment তদারকি এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য তদারকি করা। সমুদ্রভিত্তিক (sea) এমসিএস এর কার্যক্রমের ভিতরে একটি হলো রাষ্ট্রের সমুদ্র এলাকায় ও অপরটি অনেক সময় উন্মুক্ত সাগরের (High sea) কর্মকাণ্ড। রাডার (RADAR), সোনার (SONAR) ও Vessel platform এর মত প্রযুক্তি সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রে নিরাপত্তার বিধানে ও আইন অমান্যকারীদের বন্দী করার জন্য সমুদ্রে সরেজমিনে নজরদারি এমসিএস কার্যকরণের একটি প্রাথমিক ভিত্তি (Fundamental component)। আকাশপথে এমসিএস কার্যকরণের অংশ হলো আকাশে ও মহাকাশে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি (Aircraft, satellites etc.)। এগুলোর গতি (Deterrence, flexibility) এসব যন্ত্রপাতিকে জনপ্রিয় করেছে।

এমসিএস পদ্ধতির বর্তমান গতিধারা

নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বতর্মানে Vessel Monitoring System বা VMS প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে। Communication system নামের বিশ্বস্ত Satellite এর উদ্ভাবন ও Global Positioning System (GPS) এর উন্নয়নের ফলে মৎস্য ব্যবস্থাপকের চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষণিকভাবে অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৎস্য নৌযানসমূহ সাগরে তাদের অবস্থানের তথ্যাদি সহজেই দিতে পারে। এসব প্রযুক্তি প্রথমদিকে আইন প্রয়োগকালে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে মৎস্য ব্যবস্থাপক বা মৎস্যবিজ্ঞানী তাঁদের প্রয়োজনমতো যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতির প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বর্তমানে মৎস্য আহরণকালে নৌযান থেকে সম্পূরক তথ্যাদি যেমন আহরিত মাছের প্রতিবেদন (catch report), মৎস্য আহরণ কর্মকাণ্ড (Fishing activities), আহরিত মাছের বিশ্লেষণ (Analysis of catch) প্রভৃতি সম্পৃক্ত করে 'সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণ' (Integrated Fishing Monitoring - IFM) নামে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচিতি লাভ করেছে।

সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণের কাঠামো

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ১-৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখে সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণের ওপর আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা আয়োজিত এ সম্মেলনে সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণের একটি কাঠামো দাঁড় করানো হয় যাতে মৎস্য পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তের শ্রেণীবিন্যাস ও তালিকা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ-

- প্রথাগত এমসিএস (যেমন- নৌযানের অবস্থান, অনুমতিপত্র ও মৎস্য আহরণ)।
- আহরিত মৎস্য ও পরিত্যক্ত মৎস্যের প্রতিবেদন (Catch and discards reporting)
- মৎস্যবিদ্যা পরিবীক্ষণ এবং পরিবেশ ও আবহাওয়া বিষয়ক পরিবীক্ষণ।

সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণের পদ্ধতি (Tools)

সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণ এর নির্দেশাবলী (A guideline for IFM) মোতাবেক প্রচলিত তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের পাশাপাশি Vessel Monitoring System (VMS) ও Satellite surveillance এর মত পরীক্ষিত প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য নৌযান পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণের জন্য নিচে দেওয়া কৌশলগুলো কম-বেশি উপযোগী।

- সমুদ্রে তদারকি (Maritime surveillance)
- আকাশ পথে তদারকি (Aerial Surveillance)।
- উপকূলীয় ভূমিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও পরিদর্শন লগ বই ও মৎস্য হিসাব নিরীক্ষণ (Onshore Data collection and inspection including log books and fish audits)
- সমুদ্রে অবস্থানরত অবস্থায় পর্যবেক্ষক (At Sea observer)
- নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি-ইলেকট্রনিক লগবইসহ (Vessel Monitoring system including Electronic Logbook)
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ (Satellite surveillance)

সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণ গঠনে উপাদানসমূহ

মৎস্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারীদের বর্ধনশীল অংশগ্রহণ, (বিশেষ করে অংশদারীত্বমূলক ব্যবস্থাপনা) মৎস্য বিষয়ের উপাত্ত সমুহের মালিকানা ও বাণিজ্যিক ভাবে সংবেদনশীল তথ্য প্রবাহের উপর আস্থাশীলতার জন্য পরবর্তী দশক ধরেই কিছু অতিরিক্ত উপাদানকে (Additional Factor) গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে সমন্বিত মৎস্য পরিবীক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। একটি আশাপ্রদ উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে; তা হলো স্ব-প্রনোদিত হয়ে মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে ও গবেষকদের সরবারহ করে যাচ্ছে। তবে তা হচেছ তথ্যের মালিকানা প্রদান (ownership) ও গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থে।

পরবর্তী দশকে IFM কার্যকরণে প্রধান কৌশল (Tools) হবে Satellite ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে। তবে তা MCS এর অন্যান্য কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত করে। VMS এর পদ্ধতি ব্যবহার করে কম খরচে বেশি নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর MCS বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কোন কোন উন্নত দেশে MCS বাস্তবায়নের ব্যয় অত্যন্ত বেশি যা মৎস্য খাত থেকে আসা রাজস্ব আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য কৌশলসমুহের সাথে সমন্বয় ব্যতিরেকে শুধু VMS কৌশল এককভাবে কার্যকর বাস্তবায়ন বাস্তবসম্মত নয়।

VMS যেহেতু MCS পদ্ধতি স্থাপনের জন্য করা হয়েছে, সেহেতু বৈজ্ঞানিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক গবেষণায় বেশি বেশি করে মৎস্য নৌযানসমূহ হতে সরাসরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। কিছু কিছু মৎস্য নৌযান সুযোগ-সুবিধাভোগী নৌযান (Vessel of opportunity) এ পরিগণিত হবে কেননা এগুলো গবেষণা জাহাজের (Research Vessel) চাইতেও কম খরচে গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। বার্তা (Message) দীর্ঘস্থায়ী হবে ও যোগাযোগের ব্যয় (Communication cost) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হবে। এ হিসাবে বর্তমানে বার্তা ''প্রেরণ সময়" (Transmission time) খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় (১ থেকে ২ সেকেন্ড) স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যয় তুলনামূলক ভাবে কম। বেশি সময় ধরে বড় বড় বার্তা প্রেরণ করা হলে তা আরও ব্যয়বহুল হবে।

নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Vessel Monitoring System)

মৎস্য নৌযান সমুহের অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করার উপযোগী নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৌযান সমূহ তৈরির সময়ই সে গুলোতে আধুনিক স্যাটেলাইট যোগাযোগের যন্ত্রপাতি ও GPS এর যন্ত্রপাতি বসানো হয়

যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। পূর্ব নির্ধারিত বিরতি (interval) বজায় রেখে নৌযানের অবস্থান (Position), দিক (Course), গতি (Speed) ও পরিচিতি (Identity) আপনাআপনি বিশেষ বার্তা মারফত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কেন্দ্রে স্থাপিত পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এটি মনে রাখতে হবে যে, VMS পদ্ধতি মৎস্য নৌযানসমূহের MCS কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনেকগুলি কৌশল এর মধ্যে একটি। তবুও VMS নৌযানের অবস্থান ও এর গতিবিধি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যদি প্রদানের মাধ্যমে MCS কার্যকরকরণে অন্যান্য কৌশলসমূহকে (সামুদ্রিক প্রহরা ও আকাশ পথে পরিবীক্ষণসহ) ও কার্যকর অভিযান পরিচালনাকে এগিয়ে দেয়। তবে VMS শুধু লাইসেন্সকৃত নৌযানসমূহ যেগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে উপযোগী। যেসব নৌযান লাইসেন্সকৃত নয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নাই ও কোন তথ্য বা প্রতিবেদন প্রদান করছে না সেগুলোর বেলায় VMS এর কোন কার্যকারিতা নেই। কিন্তু সমুদ্রে সরাসরি নজরদারী করার সময় রাডার ও অন্যান্য 'নৌযান চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি'র (Vessel Detection System) দ্বারা লাইসেন্স বিহীন অবৈধ মৎস্য আহরণকারী নৌযানগুলোকে চিহ্নিতকরণের ও বৈধ নৌযানসমুহের দলিলপত্র ও মেয়াদ পরীক্ষার ক্ষেত্রে VMS এর উপযোগিতা রয়েছে।

নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (VMS) ও আর্ন্তজাতিক সনদ (Instrument)

পতাকা রাষ্ট্রের নিজস্ব জাতীয় জলসীমায় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় UNCLOS সনদ অনুসারে (FAO compliance Agreement) এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সংস্থার সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাদের নৌযান সমুহের কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা সমান মূল্যবান। আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা IUU ঠেকানো ও নির্মূল করার জন্য VMS কে গুরত্বপূর্ণ কৌশল (Tools) হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মৎস্যসম্পদের মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে এটিকে শর্ত হিসাবে রাখার জন্য পতাকা-রাষ্ট্রসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। IUU সম্পর্কিত ১৯০৫ সালের রোম ঘোষণায় (Rome Declaration, 2005) উপস্থিত মৎস্য মন্ত্রীগণ উন্মুক্ত সমুদ্রে (High sea) মৎস্য আহরণে পরিচালিত নৌযানসমুহে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে VMS পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজনের জন্য পতাকা-রাষ্ট্র সমূহকে আহ্বান জানান।

নিরাপত্তা বিধানে ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে VMS এর ভূমিকা

VMS এর জন্য ব্যবহৃত Hardware সমুদ্রে নৌযান ও নাবিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় Programme প্রেরণ (Transmit) করতে পারে। জাহাজে বা নৌযানে GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) সংযুক্ত থাক আর নাই থাক VMS ঠিকভাবেই কাজ করে। শুরুর দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৌযানের অবস্থান, Catch report ও ইফোর্ট ডাটা (Effort data) ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উপকারী আনুষাংগিক তথ্যসমূহ প্রেরণের জন্যই VMS প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়েছিল। নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ অথবা প্রদানের জন্য নৌযানে পর্যবেক্ষক অথবা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাবিকের উপস্থিতি প্রয়োজন।

ইলেকট্রনিক ফিশিং লগ বই এর সুচনা করা গেলে তা Catch statistics এর জন্য সহজ হবে এবং নৌযানে নাবিকদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে Catch Data লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হবে। যা আপনাআপনি VMS রিপোর্টের সাথে সত্যিকার ও চলতি উপাত্ত দেওয়া যাবে। লগ বইয়ের একটি মানসম্পন্ন ও আদর্শ ছক (Standard Format) ব্যবহার করা হলে তা 'কম্পিউটার সফটওয়ার' ব্যবহারের মাধ্যমে এক ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষায় সহজে অনুবাদযোগ্য হবে এবং মৎস্যবিষয়ক পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টরা তা বুঝতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের 'ইলেকট্রনিক লগ বই' নৌযানের মাছ ধরার ফলাফলসমূহ ঐতিহাসিকভাবে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উপযোগিতা দেখাতে পারবে। এসব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মৎস্য নৌযানের মালিকপক্ষ মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়াকে সর্বোচ্চ মাত্রায় গ্রহণ করতে পারবে।

MCS পদ্ধতির সঠিক মানদন্ড নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তা

VMS পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে Message protocol এর সঠিক মানদন্ড নির্দিষ্টকরণ করা প্রয়োজন যাতে মৎস্য নৌযানসমূহ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে 'উপগ্রহ যোগাযোগ পদ্ধতি'র (Satellite comunication system) রিপ্রোগ্রামিং (reprogramming) ছাড়াই যাতায়াত করতে পারে। এই তথ্যাদি লগ বই এর ফরমেট উন্নত করার কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই ফরমেট MCS পদ্ধতির 'ব্যবহারকারী-বান্ধব' হিসাবে কার্যকর হতে পারে। বর্তমানে VMS ব্যবহারকারী নৌযান ও সংশ্লিষ্ট তথ্য আদানপ্রদানকারী দেশগুলোর অধিকাংশই প্রায় একই ধরনের Message protocol ব্যবহার করছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থারও মতামত এমন যে, VMS পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশগুলোর প্রশাসনযন্ত্রের দেশীয় protocol কে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার সাথে সুসংগতভাবে প্রণয়ন করা উচিত। মৎস্য নৌযানের অবস্থান ও Catch Reporting format `FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No.1- Fisheries Operations- Supplement. No. 1- "Vessel Monitoring Systems" ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হওয়া উচিত। কার্যকর MCS কে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে সহযোগিতা ও Data sharing খুবই প্রয়োজনীয়।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৩	সময় ঃ ১০:৫০- ১১:৫০	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বর্তমান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (এমসিএস) পদ্ধতি, বাণিজ্যিক ট্রলার এ এমসিএস বাস্তবায়ন, যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এ এমসিএস বাস্তবায়ন, বর্তমান এমসিএস পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য বাস্তবায়নাধিন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে যাতে তারা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত এমসিএস পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ট্রলারে এমসিএস বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে এমসিএস বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- এমসিএস পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য বাস্তবায়নাধিন বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের উপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত এমসিএস পদ্ধতি • বাণিজ্যিক ট্রলারে এমসিএস বাস্তবায়ন • যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে এমসিএস বাস্তবায়ন • বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সহযোগে যৌথ অভিযান • এমসিএস পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য বাস্তবায়নাধিন বিভিন্ন কার্যক্রম	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সার-সংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• সংক্ষেপে পুণরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী

উনিশ শতকে সত্তর এর দশকে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তায় বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণের বাণিজ্যিক ভিত্তি তৈরি হয়। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের ট্রলার বহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে সময়ে ৪৭৫টি সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ও ৪টি Fishing ground চিহ্নিত করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে বাগদা চিংড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ঐ দশকের শেষের দিকে থাইল্যান্ডের সাথে Joint venture এর মাধ্যমে অনেকগুলো বিদেশি ট্রলারকে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার (EEZ) ভিতর চিংড়ি ও মাছ আহরণে সরকারিভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়। একই সময়ে RV Dr. Fridtjof Nansan নামের একটি জরিপ জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের আমাদের জলসীমায় চিংড়ি ও মৎস্য মজুদ নির্ণয় করা হয়েছিল। উৎ. ডবংঃ নামের একজন মৎস্য বিজ্ঞানী বাংলাদেশের জলসীমায় ২-৫ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি, ১৫০-১৬০ হাজার মেট্রিক টন তলদেশীয় মাছ ও ৬০-১২০ হাজার মেট্রিক টন উপরিতলের মাছের মজুদ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং বার্ষিক আহরণযোগ্য তলদেশীয় চিংড়ি ও মাছের পরিমাণ যথাক্রমে ৭-৮ হাজার মেট্রিক টন ও ৪০-৫০ হাজার মেট্রিক টন নির্ণীত হয়। সেই হিসাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক মৎস্য/চিংড়ি ট্রলারকে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয় এবং থাইল্যান্ডের সাথে ট্রলার বহর দ্বারা মৎস্য আহরণের Joint venture টি বাতিল করা হয়। এভাবেই সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য এই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালান হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের জুন ২০১৫ খ্রি. সালের সর্বশেষ জরিপ ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় জলাশয়ে ৩৪,৮১০ টি যান্ত্রিক এবং ৩২,৮৫৯ টি অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসহ সর্বমোট ৬৭,৬৬৯ টি মৎস্য নৌযান বিভিন্ন জাল-সরঞ্জাম সহযোগে সারা বছরই মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে।

এই অধিবেশনে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (MCS) পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

বংলাদেশে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী কার্যক্রমের বর্তমান প্রেক্ষিত

পরিবীক্ষণের মূল কথা- তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও জরিপ কাজ সম্পাদন, তথ্য বিশেষণ ও ফলাফলকে তথ্য প্রবাহে সম্পৃক্ত করা। ব্যবস্থাপনার অন্যতম শর্ত হলো যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যের মত নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে স্থায়িত্বশীল মাত্রায় টিকিয়ে রাখা। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়ে থাকে প্রশাসনযন্ত্র কর্তৃক মৎস্য আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও এর বলে প্রণীত বিধিবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের আহরণ কর্মকাণ্ড ও পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক মূলতঃ সামুদ্রিক মৎস্য আইন বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের নিবন্ধিকরণ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা বর্তমানে উপকূলীয় জেলাসমুহের জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের কাছে ন্যস্ত করা আছে। কিন্তু জেলা মৎস্য দপ্তরের সীমিত জনবল ও অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের কারণে এসব আইন ও বিধিবিধানের কার্যকর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি মন্থর। তদুপরি নৌ বাণিজ্যিক অধিদপ্তরের কাছে নৌযানের ইঞ্জিনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা অর্পিত থাকায় ও নৌযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকলে মাছ ধরার লাইসেন্স দেওয়ার বিধান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যাচ্ছে। এসব কারণে মৎস্যজীবীদের মধ্যে মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স গ্রহণের প্রবনতা কম। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জনবল ও অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব না। ইতোমধ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ট্রলারবহরকে সামুদ্রিক মৎস্য আইনের আওতায় আনা গেছে। তারপরও ট্রলারবহরের বিরুদ্ধে সমুদ্রের কম গভীরতায় জাল ফেলা, নির্ধারিত আকারের চাইতে ছোট ফাঁসের জাল দ্বারা মাছ ধরা ও নিষিদ্ধ এলাকায় মৎস্য আহরণসহ নানামুখি অবৈধ কর্মকান্ডের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। বাংলাদেশ কোস্টগার্ডসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমুহের সমন্বয়ের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল করা সম্ভব।

বিশাল উপকূলীয় ও সমুদ্রসীমায় দেশি-বিদেশি ট্রলারবহর ও যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণের বিষয়টি নজরদারীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ নেভিও গভীর সমুদ্রে এসব কার্যক্রম নজরদারী করে আসছে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আওতায় চট্টগ্রামে একটি মাত্র Surveillance check post রয়েছে। সীমিত জনবল ও

অর্থবরাদ্দ দিয়ে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকায় ও ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক অঞ্চলের সুষ্ঠু নজরদারী সম্ভব নয়। কাজেই, উপকূলীয় প্রধান-প্রধান নদীর মোহনায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আরও বেশ কয়েকটি নজরদারী কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্য নজরদারীর জন্য আরও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে পদায়ন করা এবং নতুন কিছু পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আকাশপথেও নজরদারীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তাদেরকে অধিকতর প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতা প্রদান করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমুহের আদলে শক্তিশালী নজরদারী টিম গঠন করা না গেলে আমাদের বিপুল মৎস্য ভান্ডারকে রক্ষা করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়বে।

বাণিজ্যিক ট্রলার পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণের জন্য চিংড়ি, বটম, মিডওয়াটার এবং ট্রায়াল ক্যাটাগরির মোট ২৪৭ টি ট্রলার অনুমতি প্রাপ্ত হলেও বর্তমানে প্রায় ২০০ টি মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩১ ও ৩৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্তৃক বাণিজ্যিক ট্রলারগুলোর মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিদর্শন, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বাণিজ্যিক ট্রলারের সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান

প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে সাগরে মৎস্য আহরণে যাওয়ার পূর্বে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নৌ-বাণিজ্য দপ্তর হতে জারীকৃত ফিটনেস সনদপত্র (ঈবৎঃরভরপধঃব ড়ভ ওহংঢ়বপঃরড়হ) এ অনুমোদিত মেয়াদ ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতি ট্রিপে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করে। সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদানের সময় ট্রলার-এর প্রকৃতি নির্বিশেষে ফ্রিজার ট্রলার গুলোর ক্ষেত্রে প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং নন-ফ্রিজার ট্রলারগুলোকে প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য সমুদ্র যাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়। আবেদনপত্রের সাথে পূর্বের ট্রিপে আহরিত মাছের তথ্য-উপাত্ত অত্র দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত উধরষু ভরংযরহম ষড়ম এবং ডেলিভারি/ট্যালি শীট দাখিল করতে হয়। সমুদ্রযাত্রার অনুমতির আবেদনের সাথে প্রতিটি ট্রলার কর্তৃক এস আর ও নং ২৮৬-আইন/২০১৪, তারিখ: ১৪/১২/২০১৪ খ্রি. মূলে নির্ধারিত মৎস্য শিকার ফি ও ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক চালানের মূল কপি সংযুক্ত করতে হয়। সংস্থার আবেদন যাচাই-বাছাই পূর্বক পরিচালক (সামুদ্রিক) এর অনুমোদন সাপেক্ষে সহকারী পরিচালকবৃন্দ সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্র ইস্যু করেন।

ট্রলার পরিদর্শন ও মনিটরিং

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সেকশন-৩৪ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা এর বিধি -৭ উপবিধি (র) মোতাবেক পরিচালক (সামুদ্রিক) এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মৎস্য অবতরণ ও প্রাক জাহাজীকরণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলার সমুদ্রযাত্রার পূর্বে ও মৎস্য আহরণ শেষে বন্দরে প্রত্যাবর্তনের পর দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিন উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। মাছের প্রজাতি বিন্যাস ও আহরণের পরিমাণ যাচাই করার জন্য সময় সময় বাণিজ্যিক ট্রলারের সম্পূর্ণ আহরণ কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(ক) মৎস্য/চিংড়ি আহরণ প্রাক্কালে ট্রলার পরিদর্শন ও মনিটরিং

চিত্র ১: পরিদর্শন টিম কর্তৃক ট্রল জালের ফাঁস পর্যবেক্ষণ

মৎস্য আহরণ এর উদ্দেশ্যে সমুদ্রে গমণের প্রাক্কালে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর অধিকাংশ ট্রলার এর অনুকূলে ইস্যুকৃত সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্র সহকারী পরিচালক, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা ও পরিদর্শক (ক্ষেত্র বিশেষ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড) সমন্বয়ে পরিদর্শন টিম কর্তৃক ট্রলারে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি, নাবিক তালিকা ইত্যাদি সরেজমিন পর্যবেক্ষণপূর্বক অনবোর্ডে সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্র হস্তান্তর করা হয়। পরিদর্শন টিম ট্রলারে প্রাক পরিদর্শনকালে কোন নন-কমপ্লাইন্স পেলে উক্ত ট্রলারটির অনুকূলে : ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(খ) মৎস্য আহরণ পরবর্তী ট্রলার পরিদর্শন ও মনিটরিং

সংস্থা কর্তৃক ট্রলারের মৎস্য অবতরণ (Unloading) এর উদ্দেশ্যে বন্দরে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য সময় ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক বিধি মোতাবেক সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে আগমনী বার্তা দাখিল করা হয়। পরিচালক (সামুদ্রিক) কর্তৃক অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও পরিদর্শক সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন টিম দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত ট্রলারসমূহ পরিদর্শন করে। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং তদাধীনে প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩-এর যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বিধি অনুসারে পরিদর্শনকালে জাল, আহরিত মৎস্য এর তথ্য-উপাত্ত, মৎস্য আহরণ এলাকা এবং সমুদ্রযাত্রার অনুমতি পত্রের শর্তাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধি পরিপন্থি কোন বিষয় পরিলক্ষিত হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(গ) মাছ/চিংড়ি আহরণ আনলোডিং পর্যবেক্ষণ

ট্রলার সংস্থা কর্তৃক আগমনি বার্তা প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সহকারী পরিচালক/সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা/পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও পরিদর্শকের সমন্বয়ে পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়। আহরিত চিংড়ি/মৎস্যের সঠিক পরিমাণ এবং প্রজাতি/গ্রুপভিত্তিক পরিমাণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিদর্শন টিম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ট্রলারের আহরিত সম্পূর্ণ ক্যাচ অবতরণ কার্যক্রম প্রয়োজনে ২-৫ দিন ট্রলারে উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে। ট্রলার সংস্থা আহরিত মাছের তথ্য-উপাত্ত অত্র দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত উধরষু ভরংযরহম ষড়ম এবং ডেলিভারি/ট্যালি শীট এর মাধ্যমে দাখিলকৃত তথ্যে সঠিকতা ও প্রজাতিভিত্তিক আহরিত মাছের তথ্য/উপাত্ত বঙ্গোপসাগরে বানিজ্যিক ট্রলারকর্তৃক আহরিত মোট মাছের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণে সহায়তা করে। এ কার্যক্রম প্রতিপালনের ফলে ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ সময়ে নির্দিষ্ট লগবহিতে প্রজাতি/গ্রুপভিত্তিক আহরিত মাছ/চিংড়ির সঠিক উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। প্রজাতিভিত্তিক মৎস্যের সঠিক উপাত্ত প্রাপ্তি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নের ও প্রজাতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অপরিহার্য।

চিত্র ২: মাছ/চিংড়ি আহরণ আনলোডিং পর্যবেক্ষণ

(ঘ) ট্রলারে অবস্থান পূর্বক মৎস্য/চিংড়ি আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং:

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিসমূহ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা সহযোগে টিম গঠনপূর্বক ৩-৫ দিন ট্রলারে অবস্থানকরতঃ মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবক্ষণসহ সহায়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করার নির্দেশনা দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ফেব্রুয়ারি ২০১২খ্রি. হতে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও পরিদর্শকবৃন্দ সহযোগে বিভিন্ন ট্রলারে অবস্থান করে গভীর সাগরে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করে। টিমসমূহ ট্রলারে অবস্থানকালীন সময়ে মাছের প্রজাতির উপস্থিতি/বিন্যাস, বিস্তৃতি, প্রচুর্য্যতা এবং আহরণোত্তর পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক সহায়ক সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

চিত্র ৩: ট্রলারে অবস্থান পূর্বক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স

কক্সবাজার হতে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৫ লক্ষাধিক জেলে আর্টিসানাল সেক্টরে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন আকার, আয়তন ও ক্ষমতার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সহযোগে সামুদ্রিক মাছের প্রায় ৮৬% আহরণ করছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প" কর্তৃক পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ৩২,৮৫৯ টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। আর্টিসানাল মৎস্য সেক্টরে নৌযান নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনরূপ আইনি প্রক্রিয়া, পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকা, অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিনিয়োগ, সহজলভ্য, কম ক্ষমতা সম্পন্ন সেচ পাম্প, কম মূল্যের চায়না ইঞ্জিন মৎস্য আহরণ বোটে সংযোজন সহজলভ্য হওয়ার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, আহরিত মৎস্যের পরিমাণ ও প্রজাতি পর্যবেক্ষণ ও তথ্যাদি সংগ্রহসহ এবিষয়ে সকল প্রকার নজরদারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের অংশ-২ ধারা-৬ এর উপধারা-২ অনুযায়ী উপকূলীয় ১৪ টি জেলার (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, খুলনা,বাগেরহাট, সাতক্ষীরা) জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দকে ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Power) করা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের নিজ নিজ অধিভুক্ত উপজেলার যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহকে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা-১৭ ও ধারা-১৮ অনুযায়ী নৌ বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক নৌযানের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ জারী সাপেক্ষে মৎস্য নৌযানের জন্য ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স নবায়নপূর্বক তার বিবরণী সংশ্লিষ্ট নথি এবং রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করেন। এছাড়া নৌযানের অনুকূলে নতুন ফিশিং লাইসেন্স জারী বা নবায়নের স্বপক্ষে সরকার নির্ধারিত ফি আদায়ের প্রমানকসহ প্রতিমাসের অর্জন নির্ধারিত ছকে সন্নিবেশ করতঃ পরবর্তী মাসের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হয়। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নসহ সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মৎস্যকূলের বংশ রক্ষা, অবাধ ও নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্যের উৎকর্ষ সাধনপূর্বক সামুদ্রিক মৎস্যের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে আর্টিসনাল মৎস্য আহরণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও নিবিড় মনিটরিং এর

চিত্র ৪: যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের কার্যক্রম মনিটরিং

আবশ্যকতা রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর তথা সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিনিয়ত মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, ফিশিং লাইসেন্সসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামাদী সহযোগে মৎস্য আহরণে নিয়োজনের বিষয়টি মনিটর করে। এছাড়া, লাইসেন্সবিহীন নৌযানের লাইসেন্সিং কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের আওতায় নৌ বাণিজ্য দপ্তর সমন্বয়ে উপকূলীয় জেলাসমূহে সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহযোগে উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং যৌথ ক্যাম্পের মাধ্যমে ফিশিং লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর মাধ্যমে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারীঃ

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী বৃদ্ধি ও অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধের জন্য ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গায় কর্নফুলী নদী তীরে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আওতায় দেশের একমাত্র মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার বন্দর এবং কর্নফুলী নদীতীরস্থ ফিশারী ঘাট এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণসহ বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিনিয়ত যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহ চেকপোস্ট অতিক্রম করে চলাচল করায় নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করাসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করা হয়:

- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ এবং ফিশিং লাইসেন্স এর অবস্থা
- ঈঙও অনুযায়ী নৌযানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যেমনঃ জীবন রক্ষাকারী, অগ্নিনির্বাপণ এবং নেভিগেশন সরঞ্জামাদির উপস্থিতি
- মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত জালের প্রকৃতি, সংখ্যা ও জালের ফাঁস
- সাগরে আহরণকৃত প্রজাতি/গ্রুপভিত্তিক মাছের পরিমাণ, সংরক্ষণ পদ্ধতি, মৎস্যজীবীগণের সাগরে দুর্ঘটনায় কবলিত হওয়া সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত এবং দুর্ঘটনায় পতিত নৌযান উদ্ধারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে অবহিত করা।
- মাঝি ও ইঞ্জিন ড্রাইভারের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ ফিশিং লাইসেন্সে উল্লিখিত নাবিক সংখ্যা যাচাই।

চেকিং কালে কোনরূপ নন-কম্প্লায়েন্স যথাঃ অনুমোদিত আকারের চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল, কিংবা অবৈধ কোন সরঞ্জাম পেলে তাৎক্ষণিক জব্দসহ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় জরিমানা ও আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফিশিং লাইসেন্স কিংবা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ন হলে নতুন লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। জব্দকৃত জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নে চেকপোস্টের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের মাধ্যমে সারাদেশে ১৬ টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে।

ট্রলার/নৌযান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে যৌথ কার্যক্রম

বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার/নৌযানসমূহ নিবিড় গঈঝ এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে প্রায়শঃ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সহ যৌথভাবে ট্রলার/নৌযান পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশি নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোধ সহ দেশীয় মৎস্য আহরণ নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণে নন-কমপ্লাইন্স অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশি ট্রলার দ্বারা মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধভাবে বিদেশি ট্রলার অনুপ্রবেশ রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা ২২ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায়

মৎস্য/চিংড়ি আহরণের উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশকারী ভেসেলসমূহকে অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভেসেলের নাবিকদের বিরূদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভেসেলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা-৩১ মূলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে এ সকল ট্রলার/বোট এর অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিদেশি কোন ভেসেল বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশের সাথে সাথে আটক করা সহজতর হয়েছে।

চিত্র ৫: অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জব্দকৃত বিদেশি ট্রলার

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর জাহাজে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ

বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমূহ সমুদ্র যাত্রার পুর্বে এবং সমুদ্র হতে প্রত্যবর্তনের পর মৎস্য অবতরণের সময় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা, পরিদর্শক ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সহযোগে নিয়মিুভাবে ইনশোরে (Inshore) নন-কমপ্লায়েন্স সমূহ শনাক্ত পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু অফশোর (offsore) উক্ত ট্রলার সমূহ এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক কম ফাঁসের জাল ব্যবহার, ৪০ মিটারের কম গভীরতায় মৎস্য শিকার, মেরিন বিজার্ভ এলাকায় মৎস্য শিকার সহ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ পরিপন্থি Non compliance শনাক্তকরণে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব কোন টহল জাহাজ নেই। গত ৩১/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখে বিএন ফ্লোটিলা, নিউমুরিং, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ও বিধিমালা সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভায় বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর টহল জাহাজে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা/ পরিদর্শককে ঙনংবৎাবৎ হিসেবে অংশগ্রহণ করে নন-কমপ্লায়েন্স সমূহ শনাক্তকরণ এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নির্দেশনার আলোকে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের ২জন কর্মকর্তা এবং ০১জন পরিদর্শক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২টি পেট্রোলিং জাহাজ এ ঙনংবৎাবৎ হিসেবে অবস্থান করে যৌথভাবে Surveillence কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করেন। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনীর জাহাজে ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন পরিদর্শক Observer হিসেবে অংশগ্রহণ করে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিসিজি সৈয়দ নজরুল পেট্রোলিং জাহাজে Observer হিসেবে অংশগ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজে Observer হিসেবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র ও offshore জলাশয়ে বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহ কর্তৃক সংগঠিত non-compliance সরেজমিন শনাক্ত করে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধে অত্যন্ত কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ বলে প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতেও মাঝে মাঝে নৌবাহিনীর জাহাজে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে নন-কমপ্লায়েন্স মৎস্য নৌযানের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

চিত্র ৬: বি এন এস করতোয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের Observer হিসেবে অংশগ্রহণ

চিত্র ৭: বি এন এস সাংগুয় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের Observer হিসেবে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক নিয়মিত সার্ভেল্যান্স এবং রিপোর্ট প্রদান

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন তথা সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা বাস্তবায়নে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক মৎস্য/চিংড়ি ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম মনিটরিং পূর্বক সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে রিপোর্ট প্রদানে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/বাংলাদেশ নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে গভীর সমুদ্রে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও নৌযান কর্তৃক সংগঠিত নন-কম্প্লায়েন্স সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ করছে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রতিটি নন-কম্প্লায়েন্স ও অভিযুক্ত নৌযানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশি মৎস্য ট্রলারকর্তৃক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার আটকপূর্বক সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে হস্তান্তর পরবর্তী সময় সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বাণিজ্যিক ট্রলার সহযোগে অনুমোদিত গভীরতা অপেক্ষা কম গভীরতায় (৪০ মিটার-এর কম) অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, মেরিন রিজার্ভে মৎস্য আহরণ, অনুমোদিত ফাঁসের জাল ব্যবহার করে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের কার্যক্রম নিশ্চিত হয়ে যথাযথ প্রমাণক ও তথ্যাদিসহ সামুদ্রিক মৎস্য অফিসে প্রতিবেদন প্রেরণ করে। অত্র দপ্তর অভিযুক্ত ট্রলার ও ট্রলার সংস্থার স্কীপারের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধি অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

যৌথ অভিযান পরিচালনা (Joint Operation)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, স্থায়িত্বশীল মৎস্য/চিংড়ি আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশি মৎস্য ট্রলার এর অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং বাণিজ্যিক ট্রলার/মৎস্য নৌযানসমূহ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা ও পরিপত্র অনুসরণ করে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কল্পে পরিচালক (সামুদ্রিক) এর নির্দেশনা মোতাবেক টিম গঠন পূর্বক বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা/পরিদর্শক সমন্বয়ে কর্ণফুলি নদীর ১৮ নং ঘাট থেকে বোয়ালখালীস্থ উপজেলার কালুরঘাট ব্রীজ এলাকা পর্যন্ত যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়। যৌথ অভিযানে পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়াদি নিম্নরূপঃ

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান

- মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন এর মেয়াদ হালনাগাদ আছে কিনা যাচাই;
- লাইসেন্স এর মেয়াদ হালনাগাদ আছে কিনা যাচাই;
- সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশনে উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ;
- মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- নৌযানে রক্ষিত অত্যাবশ্যকীয় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা যাচাই:

চিত্র ৮: সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সমন্বয়ে যৌথ অভিযান।

- মাঝি ও ইঞ্জিন ড্রাইভারের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ফিশিং লাইসেন্সে উল্লিখিত নাবিক সংখ্যা যাচাই;
- মৎস্য নৌযান কর্তৃক কোনরূপ নন-কম্প্লাইন্স সংগঠিত হলে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালায় বিধৃত আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

বাণিজ্যিক ট্রলার

- বাণিজ্যিক ট্রলার সমুহের রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন ও ফিশিং লাইসেন্স হালনাগাদ সংক্রান্ত তথ্যাদী পর্যবেক্ষণ;
- সমুদ্রযাত্রার অনুমতি পত্রের সাথে সংযুক্ত তালিকায় অনুমতিপ্রাপ্ত স্কীপার, অন্যান্য অফিসার এবং নাবিকবৃন্দের উপস্থিতি ও সঠিকতা পর্যবেক্ষণ;
- বাংলাদেশ সরকার/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকর্তৃক অনুমোদিত ফিশিং লগ, শীপ লগ, তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র অনবোর্ড যাচাই;
- অনুমোদিত জাল, ফিশিং গিয়ার ও মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদি এর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- ট্রলারকর্তৃক অবৈধভাবে জাটকা আহরণ তথ্য পাওয়া গেলে জেলা মৎস্য দপ্তর, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ট্রলারে আহরণকৃত মাছ, মাছের প্রজাতি ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ;
- নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট, জীবণরক্ষাকারী সরঞ্জামাদি এবং অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রপাতির সঠিকতা পর্যবেক্ষণ;

ফিশিং বোট ও বাণিজ্যিক ট্রলার এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকালে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কোন ফিশিং বোট বা ফিশিং ট্রলার কর্তৃক নন-কম্প্লায়েন্স পাওয়া গেলে অর্থাৎ অনুনোমোদিত জাল বা মৎস্য পাওয়া গেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ করে নন-কম্প্লায়েন্স বিষয়ে পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অপরাধ আমলযোগ্য বিবেচ্য হলে সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের আউট স্টেশন, সদর দপ্তর এবং বিভিন্ন জোনাল অফিসের উর্দ্ধতন অফিসারবৃন্দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ এবং টেকসই উন্নয়নে সহায়ক সহযোগিতা প্রাপ্তির মাধ্যমে সমন্বিত ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় MCS বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় MCS বাস্তবায়নে সমস্যা হিসেবে যে সমস্ত বিষয় চিহ্নিত হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো:

➢ বাণিজ্যিক ট্রলারের সংখ্যা বৃদ্ধি

অতি আহরণের ফলে মৎস্যসম্পদ যাতে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয় সে জন্য সরকার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বাণিজ্যিক ট্রলারের সংখ্যা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু, মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে বিপুল সংখ্যক ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হচ্ছে বিধায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিঘ্নিত হচ্ছে।

➢ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নিয়ন্ত্রণহীন যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। উপকূলীয় এলাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান তৈরি করে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হচ্ছে।

➢ ক্ষতিকর জালের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় মোহনা অঞ্চলে বিভিন্ন চ্যানেলে, নদী মুখে, নদী ও খালে বিভিন্ন আকৃতির মোহনা বেহুন্দি জাল ব্যবহৃত হয়। যা অপরিণত মৎস্য/চিংড়ি ইত্যাদি আহরণ করে সামুদ্রিক মাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত করছে। এই জাল সাধারণত সর্বোচ্চ জোয়ারে চ্যানেল বা দ্বীপের কাছাকাছি ৫ থেকে ১০/১৫ মিটার গভীরতায় স্থাপন করা হয় যেখানে জোয়ার ও ভাটার তীব্রতা থাকে। এ জালের কড এন্ডের ফাঁস ৫ থেকে ১৮ মি. মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ জোয়ারে ১০ মিটার গভীরতায় উপকূলীয় জলসীমায় সারা বৎসরের জন্য এ ধরনের জাল নিষিদ্ধ করলেও এখন

পর্যন্ত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত আছে। এ সমস্ত ক্ষতিকর জাল সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ।

- **সুন্দরবন এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ**

সুন্দরবন উপকূলীয় প্যারাবন এলাকা স্বাদু, অল্প লবণাক্ত ও সামুদ্রিক সকল প্রজাতির মৎস্য/চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা যথা: লার্ভা, জুভেনাইল, কিশোর ইত্যাদির বিচরণ ক্ষেত্র, নার্সারী ক্ষেত্র, লালন ক্ষেত্র এবং পাশাপাশি আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা সমুদ্রে মৎস্য/চিংড়ির মজুদ বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এই এলাকায় কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বিপুল পরিমাণ জেলে মৎস্য আইন অমান্য করে বিভিন্ন ক্ষতিকর জাল /ধ্বংসাত্মক উপকরণ দ্বারা নির্বিচারে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হওয়ার কারণে সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। সুন্দরবনে বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ বন অঞ্চল রয়েছে। এতে প্রতিবছর সীমিত সংখ্যক ফিশিং পারমিট ইস্যু করা হয় যার মাধ্যমে নির্বিচারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ/চিংড়ি নিধনসহ মাছের প্রজনন বিঘ্নিত করা হয়।

- **চিংড়ির বন্ধ মৌসুম বাস্তাবায়ন না হওয়া**

মৎস্য বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা পূর্বক সরকার কর্তৃক বিগত ১৯৯৫ সালে চিংড়ির সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি হতে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় ট্রলারের মাধ্যমে চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়েরের ফলে উক্ত আদেশের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রতিবছর চিংড়ির সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে চিংড়ি আহরণ অব্যাহত থাকার কারণে চিংড়িসহ সকল প্রজাতির মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

- **সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ এলাকায় মৎস্য/চিংড়ি আহরণ**

সরকার কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে ৬৯৮ বর্গ কি.মি. এলাকাকে সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব পেট্রোল বোট ও প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান কর্তৃক সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ এলাকায় মৎস্য আহরণের ফলে মাছ/চিংড়ি নিরাপদ আশ্রয় ও প্রজননে বিঘ্ন ঘটছে।

- **সার্ভেল্যান্স চেক পোস্ট স্থাপন এবং নজরদারী কার্যক্রম জোড়দারকরণ**

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর অধীনে পতেঙ্গায় ১টি মাত্র সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট থাকায় এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের অধিকাংশ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকে ফিশিং লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উপকূলীয় অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট না থাকায় যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ এ সেক্টরে প্রয়োজনীয় নজরদারী ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না।

- **জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা**

বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদের মজুদ, সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য পরিমাণ, প্রজনন কাল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণা না হওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথাযথ হচ্ছে না।

- **৪০ মিটার গভীরতার কম গভীরতায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ**

বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহকে ৪০ মিটারের কম গভীরতায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করে বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু, বর্তমানে অনেক বাণিজ্যিক ট্রলারই তা সঠিকভাবে মেনে মৎস্য আহরণ করছে না। বিষয়টি নজরদারীর জন্য সকল বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS স্থাপন এবং বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক নৌযানে AIS স্থাপন করলে তাৎক্ষণিকভাবে সমুদ্রে ভেসেলের অবস্থান শনাক্ত করে ৪০ মি. এর কম গভীরতায় মৎস্য আহরণ হতে বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহকে বিরত রাখা সম্ভব হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৩	সময় ঃ ১১:৫৫- ১২:৫৫	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **এমসিএস কার্যক্রম বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ব্যবহার**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের এমসিএস বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম যেমন: স্যাটেলাইট, ভিএমএস, এআইএস, ই-লগবুক ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা এই অধিবেশন শেষে এমসিএস বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- ই-লগ সিস্টেম এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• ই-লগ সিস্টেম এবং এর ব্যবহার • ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম • অটোমেটিক আইডিয়েন্টিফিকেশন সিস্টেম	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা	
সারসংক্ষেপ			৭ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: পোস্টার, লিফলেট, ফ্লিপচার্ট, ভিপ কার্ড, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ব্যবহার

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (MCS) বলতে আমরা বুঝি যে, মৎস্যক্ষেত্রের অতি আহরণ রোধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত কার্যক্রম যা সামগ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানে কাজ করে। আন্তর্জাতিকভাবে মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য MCS এর আইনগত ভিত্তি ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশন (UNCLOS) থেকে এসেছে যা আরও বিস্তৃতভাবে কানকুনের ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগঠনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অঞ্চলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আন্তর্জাতিক মৎস্য আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ), যা মহাসাগরের সাথে তীরবর্তী দেশগুলোর উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০ কিলোমিটার) বিস্তৃত। ভূমধ্যসাগর এবং বাল্টিকের মতো তুলনামূলকভাবে ছোট সমুদ্রের মধ্যে উউত একটি অর্থবহ ধারণা নয়, তাই সেই অঞ্চলগুলো তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক জলাশয়ের MCS এর জন্য আঞ্চলিক চুক্তি করে।

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS বাস্তবায়ন সাধারণত তিনটি কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত যথা: ক) সামুদ্রিক, খ) ভূমি ভিত্তিক এবং গ) আকাশ ভিত্তিক। নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম যেমন: ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম (VMS) এই তিন এলাকাভিত্তিক হয়ে থাকে। অন্যান্য সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা সাধারণত এই ভেসেল মনিটরিং সিস্টেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেমন: অটোমেটিক আইডিয়েন্টিফিকেশন সিস্টেম (AIS), ভেসেল ট্রাফিক সার্ভিস (VTS), সমুদ্রে রাডার সার্ভেলেন্স্য এবং দুষণ শনাক্তকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS এর সামুদ্রিক অংশ

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নৌযানে লগ এবং ক্যাচ রিপোর্টিং (ক্যাচ, ইফোর্ট, লোকেশন, পরিবেশগত তথ্য, মাছ ধরার সরঞ্জাম বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি) মৎস্যজীবীরা মাছধরা অবস্থায় নিজেরাই রেকর্ড করে থাকে। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রিপোর্ট (বাই-ক্যাচ এবং ডিস্কার্ড তথ্য, বায়োলজিক্যাল ড্যাটা ইত্যাদি) অন-বোর্ড অবজারভার প্রস্তুত করে থাকে। অন-বোর্ড অবজারভারদের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। তারা কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন এবং রিপোর্ট প্রদান করবেন।

ই-লগ (E-log)

ই-লগ (e-log) বা ইলেকট্রনিক ক্যাচ রিপোর্টিং হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ MCS tool। ই-লগ (e-log) হলো আধুনিক ইলেকট্রনিক লগবুক রিপোর্টিং সফটওয়ার যা আধুনিক মৎস্য নৌযানে স্থাপন করে দ্রুত ও সহজ পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। ই-লগ ব্যবহার করে আহরণ (Catch) রিপোর্টিং এর পাশাপাশি ভেসেল ব্যবস্থাপনাও করা যায়। ই-লগ গ্লোবাল চার্ট, সমুদ্রবন্দর সমূহের বিস্তারিত তালিকা ও সামুদ্রিক প্রজাতি ডাটাবেজ সমৃদ্ধ প্রোগ্রাম সফটওয়্যার।

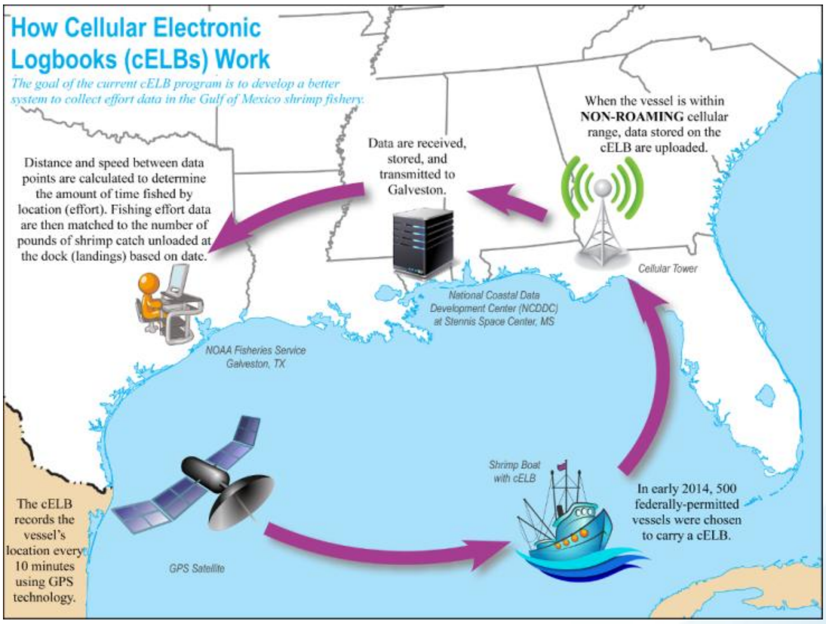

চিত্র ১: একটি সেলুলার ই-লগবুক সিষ্টেম এর নমুনা

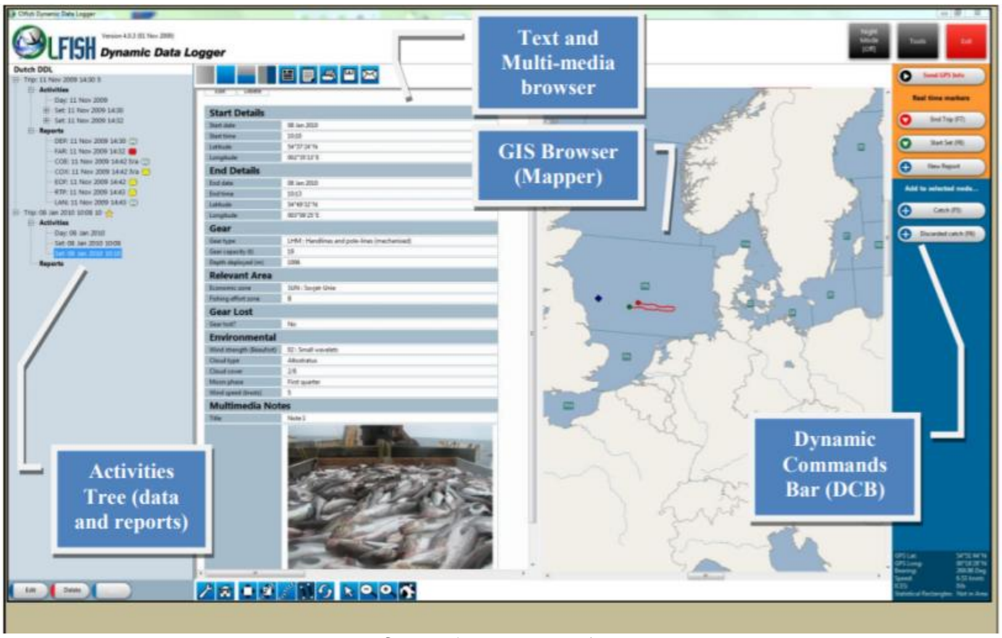

চিত্র ২: ই-লগবুক সফটওয়ার

ভিএমএস (VMS)

সমুদ্রে মৎস্য আহরণকালীন সামুদ্রিক নৌযান মনিটরিংয়ে VMS একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। বর্তমানে সারাবিশ্বে এই স্যাটেলাইট

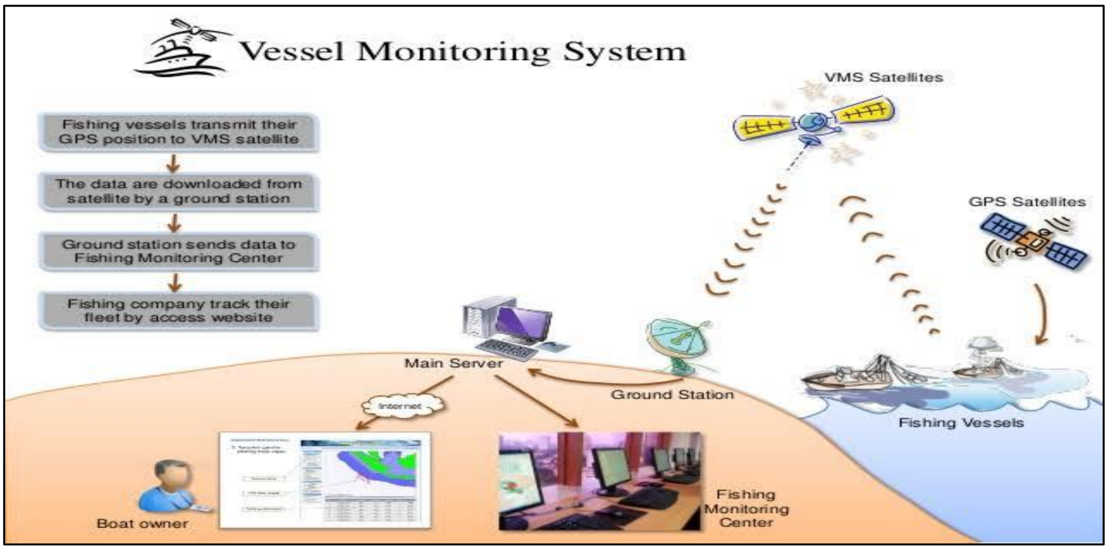

চিত্র ৩: স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে VMS প্রযুক্তিতে তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া

বেইজড এই প্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ঠগঝ খুবই কার্যকরি একটি পদ্ধতি।

সামুদ্রিক নৌযান গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সময় কর্তৃপক্ষের সব ধরনের মনিটরিংয়ের বাইরে চলে যায়। অনবোর্ড অবজারভার দ্বারা মনিটরিং সকল পর্যায় সম্ভব হয় না। ভিএমএস এর মাধ্যমে মৎস্য নৌযান গভীর সমুদ্রে থাকাকালীন তার অবস্থান সম্পর্কে কন্ট্রোলিং রুমে সিগন্যাল প্রদান করে ফলে সার্বক্ষনিক মৎস্য নৌযানের নজরদারি সম্ভব হয়। VMS প্রযুক্তিতে সকল নৌযানে একটি ট্রান্সমিটার থাকে যা কিছুক্ষণ সময় পর পর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সিগন্যাল প্রদান করে। সমুদ্র তীরে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত কন্ট্রোলিং রুমে VMS এর রিসিভার থাকে যা ট্রান্সমিটার কর্তৃক প্রেরিত সিগন্যাল রিসিভ করে মৎস্য নৌযানের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। বাংলাদেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান এর মনিটরিংয়ের জন্য VMS প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এআইএস (AIS)

একটি স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং সিস্টেম যা কাছাকাছি থাকা অন্যান্য জাহাজসমুহের অবস্থান প্রদর্শন করে। এটি একটি সম্প্রচার ট্রান্সপন্ডার সিস্টেম যা VHF মোবাইল মেরিটাইম ব্যান্ডে কাজ করে। **AIS** সুবিধাসম্বলিত সকল জাহাজ একে অপরের অবস্থান ট্র্যাক করতে পারে। **AIS** এর মুল সুবিধা হচ্ছে তা সর্বদা নিরবিচ্ছিন্ন তথ্য প্রদান করে থাকে। **IUU** ফিশিং নিয়ন্ত্রণে ও MPA সংরক্ষণে **AIS** একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক পদ্ধতি। **AIS** এর মাধ্যমে মৎস্য নৌযানের সমুদ্রে অবস্থাকলীন গতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। VMS ও **AIS** যৌথভাবে কাজ করলে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কোন মৎস্য নৌযানকর্তৃক মৎস্য আহরণ শনাক্ত করতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৮৫০০ আর্টিসানাল বোটে AIS প্রযুক্তি প্রয়োগ করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

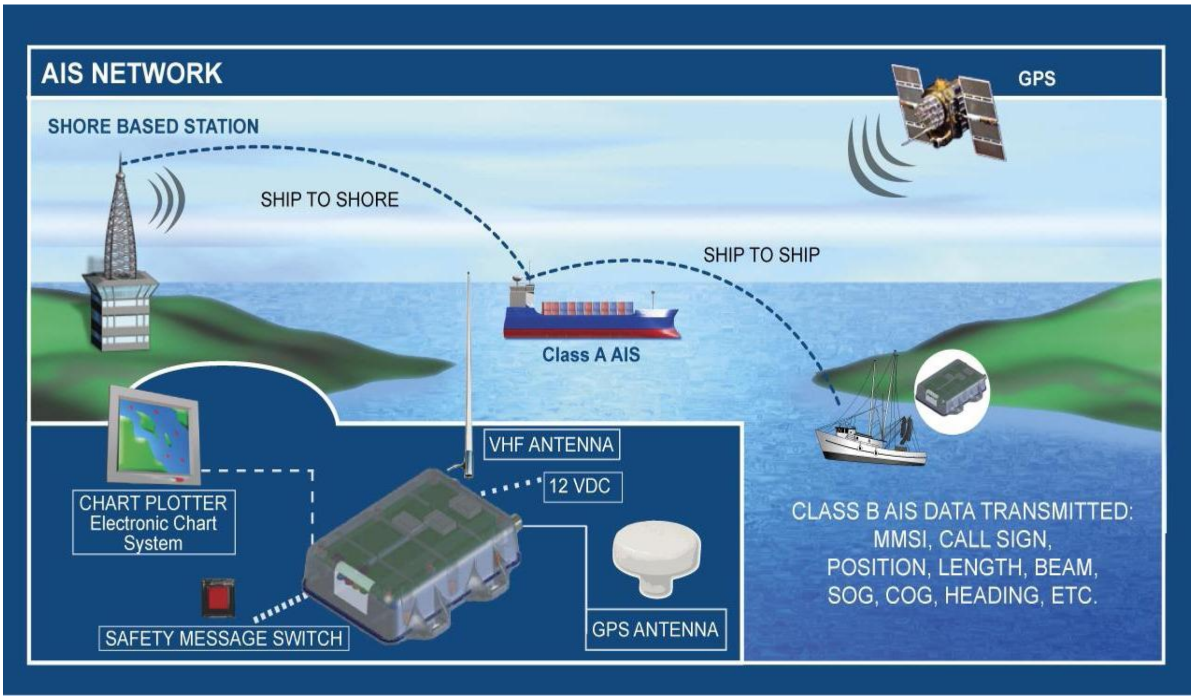

চিত্র ৪: এআইএস নেটওয়ার্ক সিস্টেম

মহাকাশীয় উপাদানসমূহ

নিম্নগামী উড়োজাহাজের মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মৎস্য আহরণকারী ট্রলার সমূহ মনিটরিং করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে আলাদা করা যায় এমন নির্দেশক ট্রলারে ব্যবহার করতে হবে। ফলে খুব অল্প সময়ে অনেক বিস্তৃত অঞ্চল মনিটরিং এর আওতায় আনা সম্ভব। অপরদিকে উচ্চগামী উড়োজাহাজের মাধ্যমে রাডার ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জামের সহায়তায় সাগরে মনিটরিং পরিপালন করা সম্ভব। যে তথ্য ভিএমএস বা অন্যান্য তথ্যের সাথে পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মূলত: যোগাযোগে ব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহ-ই ভিএমএস এর মূল উপাদান। রাডার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে উড়োজাহাজ থেকে বেশি বিস্তৃত এলাকা সহজে মনিটরিং করা সম্ভব।

INTRODUCTION TO PHOTOGRAMMETRY AND AIR SURVEY

MCS পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমঃ

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে-

- বেইজ লাইন সার্ভে করে মৎস্য আহরণে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং পদ্ধতি চালু করা
- ৪০ HP এর ওপর সকল যান্ত্রিক নৌকায় AIS সংযোগ করা
- ১০-৪০ HP এর মধ্যে সকল যান্ত্রিক নৌযানে GPRS স্থাপন করা
- ১০০টি বাণিজ্যিক ট্রলারে ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম চালু করে মনিটরিংকে জোরদার করা
- জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা
- ১৬টি সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন করা
- ১৬টি হাইস্পীড পেট্রল বোট এর সংস্থান করা
- ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট মনিটরিং উন্নয়নের জন্য সফটওয়্যার তৈরি

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৩	সময় ঃ ১৪:০০- ১৫:০০	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **আইইউইউ (IUU) ফিশিং নিয়ন্ত্রণ**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের আইইউইউ (IUU) ফিশিং এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে এবং IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যাতে তাঁরা এই অধিবেশন শেষে IUU ফিশিং সম্পর্কে জানতে পারেন এবং IUU নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- আইইউইউ (IUU) ফিশিং সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- IUU ফিশিং এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণ করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• আইইউইউ (IUU) ফিশিং • IUU ফিশিং এর ক্ষতিকর প্রভাব • IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন এবং বিধিবিধান • IUU ফিশিং এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে করনীয়	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা	
সারসংক্ষেপ			৭ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: পোস্টার, লিফলেট, ফ্লিপচার্ট, ভিপ কার্ড, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

আইইউইউ (IUU) ফিশিং নিয়ন্ত্রণ

অবৈধ, অগোচর ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated fishing) ফিশিং হলো কোন উন্মুক্ত জলাশয় থেকে যেকোন প্রকারে নিয়মবহির্ভুত ও অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ। বিশ্বের সকল সাগর মহাসাগর তথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় IUU ফিশিং বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে-যা বাংলাদেশের উন্মুক্ত তথা সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের জন্যও ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টি করছে। জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে উন্মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মোট মাছের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ যোগান আস্ছে IUU ফিশিং এর মাধ্যমে। IUU ফিশিং এর ফলে মৎস্যসম্পদের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ে এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ভবিষ্যতে মাছের মজুদ ধ্বংস প্রায় হওয়ায় সম্ভাবনা আছে। এর ফলে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠি বিশেষ করে প্রায় ৫.১৬ লক্ষ মৎস্যজীবী জেলেদের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এছাড়া, দেশ সামগ্রীকভাবে অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ের মৎস্য কূলের প্রাচুর্য্যতা দ্রুত হ্রাসমান হওয়ায় ৯০ দশকের শেষ দিক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও FAO এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ IUU ফিশিং প্রতিরোধে সোচ্চার হয়।

চিত্র: পিএল ধরার মশারি জাল

বর্তমানে, প্রায় সত্তর হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান উপকূল ও অগভীর সমুদ্রে এবং প্রায় আড়াই শত বাণিজ্যিক ট্রলার বহর বঙ্গোপসাগরের গভীর অংশে বাংলাদেশের EEZ এর ভিতর মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত আছে। আমাদের দেশে যে প্রক্রিয়ায় IUU ফিশিং হচ্ছে;

- অনিবন্ধিত ও লাইসেন্সবিহীন নৌযান (যাত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান)
- অবৈধ মৎস্য জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার
- ক্যাচ ডকুমেন্টশন অথবা মাছ আহরণ তথ্য এর অভাব (যাত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান)
- বিদেশি মৎস্য নৌযানের অনুপ্রবেশ
- বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক ৪০ মিটার গভীরতার ভিতর অনুপ্রবেশ
- সরকার ঘোষিত বন্ধ মোসুমে মৎস্য আহরণ

IUU ফিশিং এর ক্ষতিকর প্রভাব

- ফিশিং ট্রলার ও ফিশিং বোটকর্তৃক প্রচলিত আইন ও বিধিমালা ভঙ্গ করে মৎস্য আহরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়;
- এধরনের ফিশিং এর সাথে সম্পৃক্ত নৌযান হতে বৈধ রেজিষ্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স ফি আদায় না হওয়ায় রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত;
- উক্ত ফিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সাগরের সংরক্ষিত এলাকায়সহ অন্যান্য দেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, মাছ ও চিংড়ির পোনা ধ্বংস, কোরাল রীফ ধ্বংস, সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবসহ সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও মৎস্যকূলের ওপর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে;
- উক্ত ফিশিং কার্যক্রমে নির্ধারিত আকারের চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার, ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি অনুসরণ, নিষিদ্ধ প্রজাতির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আহরণ যেমনঃ সামুদ্রিক কচ্ছপ-এর ফলে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে;
- এধরনের ফিশিং এর সাথে সম্পৃক্ত নৌযানের নাবিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি, নিম্নজীবনমান এবং সর্বোপরি কাজের পরিবেশ নিম্নপর্যায়ের থাকে;
- এধরনের ফিশিং-এর সাথে সাধারণতঃ সমুদ্রে মৎস্য অহরণে অনুপোযুক্ত, রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স- বিহীন, অনুমতিহীন নৌযান ও ভেসেল মূলতঃ অধিক সংখ্যায় সম্পৃক্ত থাকে;
- উক্ত ফিশিংএর সাথে সম্পৃক্ত ভেসেল/ নৌযান কোন-রূপ আইনের বাধ্যবাদকতা প্রতিপালন না করে মুনাফা করায় বৈধ নৌযানের মালিকরা অর্থ ব্যয় করে আইন প্রতিপালনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে- যেটি নৌযান রেজিষ্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স না করার ক্ষেত্রে এদেশে একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে;
- এসকল নৌযানে মাছের আহরনোত্তর পরিচর্যা নিম্নমানের যা খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধানের সাথে অসামঞ্জ্যপূর্ণ বিধায় এসকল মাছ রপ্তানিযোগ্য নয়;
- IUU ফিশিং এর মাধ্যমে আহরিত মাছের ক্যাচ সার্টিফিকেট না থাকায় রপ্তনিযোগ্য নয়;
- IUU ফিশিং এর কারনে আইন বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
- সরকারের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

আইইউইউ (IUU) ফিশিং নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান

- সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্হাপনা ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করতে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ'১৯৮৩ জারী করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য রুলস ১৯৮৩ এবং ১৯৯২ সালে উক্ত রুলের সংশোধনী জারী করা হয়;
- অবৈধ, অগোচর ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ আইইউইউ ফিশিং ও ধ্বংসাত্নক মৎস্য আহরণ কার্যক্রমে কেউ জড়িত থাকলে বা কাউকে সহায়তা করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- প্রস্তাবিত সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৮ তে ৩৪ নং অনুচ্ছেদে অবৈধ, অগোচর ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ আইইউইউ ফিশিং নিয়ন্ত্রণ ধারা লঙ্ঘন করলে পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপরাধের গুরুত্ব ও মাত্রা বিবেচনায় এক লক্ষ হতে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ব্যবস্হা রাখা হয়েছে;
- বিদ্যমান সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ'৮৩ আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্হাপনা, সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নের সার্বিক দায় দায়িত্ব পরিচালকের ওপর ন্যস্ত;
- সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণ নিমিত্ত সকল ফিশিং লাইসেন্স পরিচালক কর্তৃক জারীকরণ (সূত্র:পার্ট III, ধারা-৮);

- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের বার্ষিক ফিশিং লাইসেন্সম ফি বাবদ টাঃ ১,৫০০ - ৫,০০০/= এবং ট্রলারের লাইসেন্স ফি টাঃ ২৫,০০০ - ১,৫০,০০০/= পর্যন্ত নির্দ্ধারিত;
- বিদেশি মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবৈধ মৎস্য নৌযান বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশ করলে নৌযান বাজেয়াপ্ত এবং এ আইনের আওতায় আটককৃত অফিসার ও নাবিকদের শাস্তির ব্যবস্হা রাখা হয়েছে;
- বিভিন্ন ট্রলার দ্বারা মৎস্য ও চিংড়ি আহরণে জালের সর্বনিম্ন ফাঁস নির্ধারণ করা আছে:

ক. চিংড়ি ট্রলারের জালের কড এন্ডের ফাঁস	: ৪৫ মি. মি.
খ. মৎস্য ট্রলারের জালের কড এন্ডের ফাঁস	: ৬০ মি. মি.
গ. বড় ফাঁসের ভাসান জালের ফাঁস	: ২০০ মি. মি.
ঘ. ছোট ফাঁসের ভাসান জালের ফাঁস	: ১০০ মি. মি.
ঙ. বেহুন্দি জালের মেলাং এর ফাঁস	: ৪৫ মি. মি.

- সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত এলাকায় এবং সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার এর কম গভীরতায় ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানগুলোর জন্য ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ এলাকা নির্ধারিত;
- চিংড়ি ট্রলারগুলোর বাই-ক্যাচ হিসেবে প্রাপ্ত সাদা মাছের ৩০% উপকূলে আনা বাধ্যতামূলক এবং মাছ অবতরণ ও ট্রান্সশীপমেন্টের সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্হিতি বাধ্যতামূলক;
- একজন ফিশিং লাইসেন্সধারী মৎস্য আহরণ ও বিক্রয় বিষয়ক সকল তথ্য নির্ধারিত ফর্মে সংরক্ষণ ও এর কপি পরিচালক সামুদ্রিককে প্রদান; (সূত্র: অধ্যাদেশ পার্ট ৩৩৩, ধারা-১৪);
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ভেসেল/ট্রলারের সকল কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক;
- একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার যে কোন ফিশিং ভেসেল থামাতে ও তা তল্লাশী বা পরীক্ষা করতে পারবে (সূত্র: অধ্যাদেশ পার্ট-৩ঢ, ধারা-৩২);
- ফিশিং ভেসেল/ট্রলারকর্তৃক ধৃত মাছ ল্যান্ডিং বা ট্র্যানশিপমেন্ট-এর সময় একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রতিটি ফিশিং ভেসেল/ট্রলারকর্তৃক মৎস্য আহরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মেরিন ফিশারিজ অফিস হতে সমুদ্র যাত্রার অনুমতি বাধ্যতামূলক;
- সমুদ্র হতে আহরিত মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের জন্য সেদেশের সরকার অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে IUU Catch Certificate গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে;
- IUU Catch Certificate ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগারে রপ্তানিতব্য মাছের পরিমাণের ওপরভিত্তি করে নির্ধারিত হারে রাজস্ব প্রদান করতে হয়;
- ২০১৫ খ্রি. সাল হতে প্রতি বছর ২০ মে’ থেকে ২৩ জুলাই’ পর্যন্ত ৬৫ দিন সমুদ্রে যেকোন ধরনের মৎস্য নৌযান দ্বারা সকল ধরনের মাছ বা চিংড়ি জাতীয় ক্রাষ্টেসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন ফিশিং গিয়ার-সরঞ্জামাদী, নৌযান, বিভিন্ন শ্রেণির ট্রলার ইত্যাদি কর্তৃক মৎস্য আহরণ এলাকা ও গভীরতা নির্ধারণ করা আছে;
- সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফিশিং ভেসেলকর্তৃক ব্যবহৃত জালের কন্ড-এন্ড ফাঁসের আকার ও পরিধি নির্ধারিত আছে;
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণ নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যেমন: সকল ফিশিং ভেসেল এর বৈধ ফিশিং লাইসেন্স থাকা, আইনসম্মত সার্টিফিকেট অব রেজিষ্ট্রেশন এবং ইন্সপেকশন থাকতে হবে;
- পোনাজাল, মোহনা বেহুন্দিজাল, টানাজাল ইত্যাদি ক্ষতিকারক জাল হিসেবে চিহ্নিত জালসমূহ দ্বারা যে কোন ধরণের মৎস্য ও চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ।

- অতি সম্প্রতি এফএও এর সহায়তায় National Plan of Action to Combat IUU Fishing এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।
- IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহঃ

  International Plan of Action-IUU (NPOA-IUU) 2001

  The Agrement of Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing (PSMA)-2009

বাংলাদেশে IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ বিদেশি মৎস্য নৌযানের অনুপ্রবেশ
- ❖ যাত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের নিবন্ধিত ও লাইসেন্স
- ❖ যাত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে দূর্বল ব্যবস্থাপনা
- ❖ দূর্বল এমসিএস কার্যক্রম
- ❖ ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার
- ❖ হালনাগাদ মৎস্যসম্পদের তথ্য ও জরীপ
- ❖ নিয়মিত ক্যাচ ডকুমেন্টশন অথবা মাছ আহরণ তথ্য সংগ্রহ
- ❖ মৎস্য অধিদপ্তরের স্বল্প লোকবল ও দূর্বল লজিস্টিক সার্পোট
- ❖ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের লোকবল ও সক্ষমতার অভাব
- ❖ অবজারভার স্কিমের অভাব
- ❖ IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- ❖ মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন

IUU ফিশিং এর নিয়ন্ত্রণে করণীয়

- ফিশিং ট্রলার ও নৌযান কর্তৃক প্রতিনিয়ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালা মেনে চলতে হবে।
- সকল মাছ ধরার নৌযানকে রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে।
- মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও বাংলাদেশ নেভী, কোস্ট-গার্ড, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (Monitoring, Control and Surveillance) পদ্ধতির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় (Exclusive Economc Zone) বিদেশি ফিশিং ট্রলার বা মৎস্য নৌযান এর অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ ও মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বাণিজ্যিক ফিশিং ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও যোগাযোগ রক্ষাকারী সরঞ্জাম যেমন: Vessel Tracking System (VMS), Automatic Identification System (AIS), Global System Mobile (GSM) ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- বাণিজ্যিক ট্রলার ও আর্টিসেনাল মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল ভেসেল-এর মালিক ও নাবিক/শ্রমিকদের আইইউউ ফিশিং হ্রাসে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও সচেতন করা;
- বাণিজ্যিক ট্রলার ও উচ্চ অশ্বশক্তি সম্পন্ন মৎস্য নৌযানে পর্যবেক্ষক (Observer) নিয়োজনের ব্যবস্থা করে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও সম্পৃক্ত কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট প্রদান।
- আর্টিসেনাল সেক্টরে নিয়োজিত জেলেদের দক্ষ করে অন্য পেশায় স্থানান্তরপূর্বক মৎস্য আহরণে চাপ কমিয়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ও যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা প্রায়াজন।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইইউউ ফিশিং হ্রাসের গুরুত্ব অপরিসীম। মাছের মজুদ ও বংশধারা অক্ষুন্ন রাখাসহ উন্মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র রক্ষা এবং সর্বোপরি মৎস্য সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত মৎস্যজীবীদের জীবিকার উন্নয়ন তথা সু-নীল অর্থনীতি (Blue Economy) ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন তরান্বিত নিশ্চিতকরণে আইইউইউ ফিশিং প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আজকে বাংলাদেশের ইলিশ সম্পদের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের ফলে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৩	সময় ঃ ১৫:১৫- ১৬:১৫	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: জেলে ও মৎস্য নৌযান নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের জেলেদের নিবন্ধন এবং স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে ফিশিং ভেসেলের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারবে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- জেলেদের নিবন্ধন এবং স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর লাইসেন্সিং কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• জেলেদের নিবন্ধন এবং স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম • বাণিজ্যিক ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি • যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর লাইসেন্সিং কার্যক্রম • যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর লাইসেন্সের আইনি প্রক্রিয়া • অন্যান্য দেশে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয় সমূহের সার সংক্ষেপ • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

জেলে ও মৎস্য নৌযান নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ নবায়নযোগ্য সম্পদ হলেও এ সম্পদ অফুরন্ত নয়। আইন বহির্ভূত মৎস্য আহরণ এবং নির্বিচারে মৎস্য নিধন সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম এর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকায় অন্তরায় হিসেবেও গণ্য হয়। তাই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরি পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবী্ক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি কার্যক্রমের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ জেলেদের নিবন্ধন এবং মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং।

জেলেদের নিবন্ধন এবং স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম

দেশের প্রায় এক কোটি ৮৫ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য উপ-খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে জেলে সম্প্রদায় অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করে থাকে। কোনো কোনো জেলে সারা বছরই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, আবার কেউ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। ২০১২ সালের আগে জেলেদের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান ছিল না। এতে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করা যেতো না। তাদের তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেত না। সরকারি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে জেলে নির্বাচনে সমস্যা হতো। সর্বোপরি, জেলেদের জীবন মানোন্নয়ন এবং মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেলেদের প্রকৃত তথ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মৎস্যজীবীদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৬ লাখ ২০ হাজার জেলে নিবন্ধিত হন। এরমধ্যে ১৪ লাখ ২০ হাজার জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। জেলে নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন প্রক্রিয়াধিন রয়েছে। নির্দেশিকায় জেলের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলেরা নিজ নিজ এলাকার সিনিয়র/উপজেলা কর্মকর্তার কাছে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করবেন। আবেদনের সঙ্গে নাগরিকত্ব সনদ, ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে 'উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি' যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন ও নিবন্ধন দেবে এবং উপজেলা মৎস্য অফিসে অনলাইন ডাটাবেইজে ডাটা এন্ট্রি করবে। উপজেলা নিবন্ধন কমিটি নিবন্ধিত জেলেদের পরিচয়পত্র দিতে সুপারিশসহ প্রস্তাব মহাপরিচালকের কাছে পাঠাবে। মহাপরিচালক ইস্যু করা পরিচয়পত্র নিজ নিজ উপজেলায় বিতরণের জন্য উপজেলা মৎস্য অফিসে পাঠাবেন। নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীদের ডাটাবেইজে মৃত জেলেদের নাম বাদ ও নতুন জেলেদের নাম অনলাইন ডাটা বেইজে অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিবছর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা মৎস্য অফিস ডাটাবেইজ হালনাগাদ করবে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জেলেদের তথ্যভান্ডার হালনাগাদ ও জোরদারকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করা, মৃত জেলেদের নাম বাদ দেয়া এবং বাদ পড়া বা নতুন জেলেদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদান এই কার্যক্রমের অংশ।

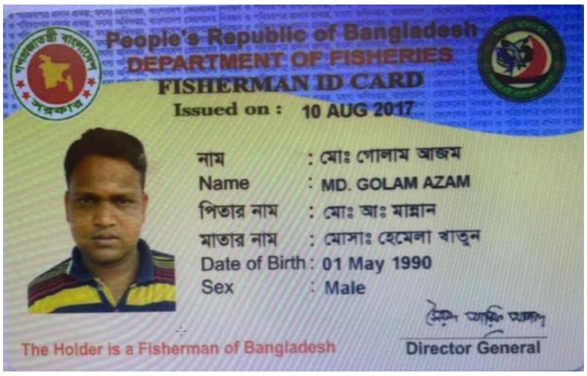

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে ফিশিং ভেসেলের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান

বাণিজ্যিক ট্রলারের লাইসেন্সিং কার্যক্রম:

বাংলাদেশের জলসীমা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রতিটি বৈধ ট্রলার বা মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অংশ ওওও সেকশন ৮ এ সকল প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষমতা পরিচালক (সামুদ্রিক) এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ট্রলার ব্যতিত অন্য কোন ট্রলার হতে ফিশিং লাইসেন্স ফি আদায় কিংবা ফিশিং লাইসেন্স প্রদান করা হয় না।

প্রাথমিকভাবে সরকার কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুকূলে ক্যাটাগরি নির্ধারণপূর্বক বিদেশ হতে ট্রলার আমদানি বা ক্রয়ের অথবা দেশে নতুন ট্রলার নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। উক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রোফরমা ইনভয়েজ অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রলার আমদানি/নির্মাণ/ক্রয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নৌবাণিজ্য দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তির আবেদন করে।

দি বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর CHAPTER -3 এর section 13: Application 13. “This Chapter shall apply to all sea going Bangladesh ships exceeding fifteen tons and fitted with mechanical means of propulsion, but shall not apply to ships registered under any law for the time being in force for the registration of inland ships plying on inland water.” মূলে নৌ বাণিজ্য দপ্তর উক্ত ট্রলারের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ ইস্যু করে।

অতঃপর নির্ধারিত লাইসেন্স ফি ও ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে পরিচালক (সামুদ্রিক) বরাবর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। অতঃপর ট্রলার পরিদর্শন প্রতিবেদন ও মালিক/সংস্থার আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভেসেলের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যাচাই সাপেক্ষে পরিচালক উক্ত ট্রলারের অনুকূলে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু করেন। প্রতিটি ফিশিং লাইসেন্স এর মেয়াদ প্রতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকে।

➢ সরকার কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ এস আর ও নং-২৫৪-আইন/২০১৩, তারিখ:-২২/০৭/২০১৩ খ্রি. মূলে মৎস্য নৌযান বা ফিশিং ট্রলারের বার্ষিক লাইসেন্স ফি সর্বনিম্ন ১,৫০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ১৫০,০০০/- টাকার পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।

চিংড়ি ট্রলার

মিডওয়াটার মৎস্য ট্রলার (স্টিল বডি)

বটমওয়াটার মৎস্য ট্রলার (কাঠ বডি)

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং কার্যক্রম

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা ১৭ ও ধারা ১৮ মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল নৌযানের লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের জুন ২০১৫ খ্রি.সালের সর্বশেষ জরিপ তথ্য অনুযায়ী বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় সর্বমোট ৬৭,৬৬৯ টি নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। সরকার কর্তৃক এস আর ও নং-২৭৫-আইন/৯২, তারিখ: ২৬/১২/১৯৯২ খ্রি. মূলে সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা এর Rule-6 সংশোধন হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল নৌযানের (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন (সিওআই) গ্রহণ বাধ্যতামূলক। Under Article 388 of Part IX of the Bangladesh Merchant Shipping Ordinance 1983 অনুযায়ী- "All sea-going fishing power driven vessels are liable to register under the Ordinance"|

যৌথ ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে লাইসেন্সিং

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের অনুকূলে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স প্রদান সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ-বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত যৌথ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স কার্যক্রমের সময় কমিটির টিম লিডারকে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অংশ (প্রশাসন), অংশ-৬, উপধারা-২ বলে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে one stop service এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। যৌথ ক্যাম্পের মাধ্যমে লাইসেন্স কার্যক্রমের পাশাপাশি, নৌযানের মালিক, নাবিক, মাঝি, মৎস্য আড়ৎদার, বরফকল মালিকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনবৃন্দকে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ আচরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সভা করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হয়।

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান লাইসেন্সিং-এর আইনি প্রক্রিয়া

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন নৌ-বাণিজ্য দপ্তর হতে জারী করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সেকশন ১৭ ও ১৮ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন ছাড়া যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদান করার সুযোগ নেই। অথচ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী সমদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য সকল ধরনের মৎস্য নৌযান এর ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অংশ (IV) section ১৭এবং ১৮ তে উল্লেখ রয়েছে-

১৭. **Local fishing vessels to be registered**: No Licence shall be issued in respect of a local fishing vessel that is required to be registered under any law for the time being in force unless the vessel has been registered.

১৮. **Local fishing vessels to hold valid Certificate of inspection**: No licence shall be issued in respect of a local fishing vessel that is required to hold a valid certificate of inspection under any law for the time being in force unless such a certificate is issued.

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে বিধি প্রণীত হওয়ার পর থেকে বিশেষ করে বিগত বৎসরসমূহে সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকে ফিশিং লাইসেন্স এর আওতায় আনার সর্বাত্নক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যেমন: সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা ৬ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপকূলীয় সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দকে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী/বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করা, নৌ-বাণিজ্য দপ্তর সমন্বয়ে যৌথ ক্যাম্প

পরিচালনা করা ইত্যাদি। কিন্তু এসব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ:

- নৌ-বাণিজ্য দপ্তর হতে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন প্রাপ্তিতে জটিলতা।
- চট্টগ্রাম ও খুলনা ব্যতীত ৭১০ কি. মি. দীর্ঘ সমুদ্র উপকূলীয় অন্য কোন জেলায় নৌ-বাণিজ্য দপ্তরের কোন অফিস নেই।
- সমুদ্র/উপকূলীয় জলাশয়ে চলাচলকারী বিভিন্ন ক্যাটাগরীর সকল প্রকার নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীর পাশাপাশি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীর জন্য নৌ-বাণিজ্য দপ্তরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নেই।
- যে কোন বাণিজ্যক জাহাজ বা ট্রলারের পাশাপাশি প্রতিটি নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প পেপার, নৌযান নির্মাণকারীর (মিস্ত্রির) নাম ও ঠিকানা ও আইডি কার্ড এর ফটোকপি, মালিকের নাম ও ঠিকানা, ভোটার আই ডি এর ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, নৌযান এর গায়ে খোদাই করে লেখা নাম, এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা এবং নৌযান এর ড্রাইভারের নাম ও ঠিকানা, নৌযানের রেজিস্ট্রেশন বাবদ নির্ধারিত ফি, নৌযানে কর্মরত নাবিকদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তালিকা দাখিল করতে হয়।
- স্বল্প শিক্ষিত বা স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জেলে/মালিকদের বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দাখিল করতে পারে না বিধায় নৌযান এর রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

উল্লিখিত কারণে উপকূলীয় সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নৌযান এর অনূকূলে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে না। আইন সংশোধন করে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

অন্যান্য দেশে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া:

ভারত, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া সহ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে মৎস্য নৌযান সমূহের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীসহ ফিশিং লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তর তথা কৃষি মন্ত্রণালয়/মৎস্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পন্ন হয়।

- ভারতে মৎস্য নৌযান সমূহের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীসহ ফিশিং লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- মালয়েশিয়ায় সকল ধরনের ফিশিং বোটের রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট অব ইন্সপেশন এবং ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ কর্তৃক সম্পন্ন হয়।
- মায়ানমারে ১২ এইচপি ও ৩০ ফুট দৈর্ঘ্যের নৌযানগুলো জেনারেল এডমিটিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট এবং ১২ এইচপি এর অধিক নৌযানগুলোর রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকট অব ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট অব মেরিন এডমিনিস্ট্রেশন হতে প্রদানের পর ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ কর্তৃক ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।
- থাইল্যান্ডে ২০ গ্রস টনেজের নীচে সকল ফিশিং নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীসহ লাইসেন্সিং ক্ষমতা ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ এর ওপর ন্যস্ত এবং তা মিনিস্টিরিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে করা হয়।

উল্লিখিত দেশের ন্যায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১৫ মে. টন গ্রস টনেজ এবং ৩০ ইঞ্জিন ক্ষমতা (Horse Power) পর্যন্ত মৎস্য নৌযানসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীসহ ফিশিং লাইসেন্স প্রদান মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নিকট ন্যস্ত করা যেতে পারে। এজন্য দি বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সেকশন ১৩ ও সেকশন ৪০২ এর আলোকে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফিশিং লাইসেন্স কার্যক্রম সহজীকরণে Notification Official Gazette এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট গ্রস টনেজ বা নির্দিষ্ট ইঞ্জিন ক্ষমতা (Horse Power) পর্যন্ত (গ্রস টনেজ ১৫ মে. টন অথবা ৩০ বিএইচপি পর্যন্ত) সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীর ক্ষমতা নৌ বাণিজ্য দপ্তরের আওতামুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্তকৃত নির্ধারিত গ্রস টনেজ বা এইচপি (Horse Power) মৎস্য নৌযানসমূহের সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীর ক্ষমতা মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরকে অর্পণ করে Notification Official Gazette এর মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর সংশোধন করা যেতে পারে। সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন জারীর ক্ষমতা মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরকে অর্পণ করা হলে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ফিশিং লাইসেন্স এর আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সেক্টরে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

চতুর্থ দিন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪	সময় ঃ ৯:৩৫-১০:৩৫	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট ও জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর গুরুত্ব, কার্যপরিধি, ফলাফল এবং জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার এর গুরুত্ব এবং প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর গুরুত্ব, কার্যপরিধি এবং ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর গুরুত • মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর কার্যপরিধি • মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের ফলাফল • এসসিএমএফপি কর্তৃক মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন কার্যক্রম • জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার কার্যক্রম	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর, ভিডিও ক্লিপ ও উন্মুক্ত আলোচনা	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: পোস্টার, লিফলেট, মানচিত্র, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট ও জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার

ভূমিকা

সামুদ্রিক পরিবেশ এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য/চিংড়ি ট্রলার ও যান্ত্রিক নৌযানের নিয়ন্ত্রণ রেখে সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য/চিংড়ি তথা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ অর্থে সার্ভেল্যান্স বলতে অতন্দ্র তত্ত্বাবধান বা নজরদারি বা তদারকী বোঝায়। যখন এ সার্ভেল্যান্স কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন সেটি সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট হিসেবে গন্য হয়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়িত্বশীল আহরণ বজায় রাখার জন্য মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান নিয়ন্ত্রণের কাজটি কাজে মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট হতে পরিচালিত হয়।

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের যৌক্তিকতা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল আহরণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ১৯ জুলাই এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার “The Marine Fisheries Ordinance 1983” জারী করে। উক্ত ঙৎফরহধহপব এর বিধানসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথোপযুক্ত সুফল প্রাপ্তির জন্য তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। মেরিন ফিশারিজের সমস্যাসমূহ যথাযথভাবে নিরূপনপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তরে সাংগঠনিক বিন্যাস ও জনবলের পদসমূহ পরীক্ষা করে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের বিধি বিধানসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য উক্ত কমিটি মার্চ ১৯৮৫ খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করে যাতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হয়:

“The Department of Fisheries shall take immediate actions towards obtaining a small piece of land from the port Authority for construction of a floating jetty/Barge along with a connecting bridge, office accommodation and inspection room for a check post.”

এছাড়া কমিটি প্রতিবেদনের ৬ নং পৃষ্ঠার ক্রমিক নং ৩ এর (ন) তে নিম্নোক্ত সুপারিশ করে: " Organizational arrangement and manpower position of the Fisheries and Livestock Division and the Department of Fisheries to ascertain their adequacy to deal effectively with the problem of fisheries development in view of its increasing importance in the national economy and particularly its export potential.”

একই সাথে কমিটি চেক পোস্ট স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং জনবল সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে

“The Council of Ministers in its meeting held on 13-1-1985 decided that the Department of Fisheries of Fisheries should establish a check post at mouth of the river Karanaphuli in order that close surveillance could be maintained on all vessels engaged in fishing in the estuarine waters as well as in the Bay. The check post could examine all equipment’s of the fishing vessels to ensure that they conform to the requirements of Marine Fisheries Ordinance & Rules. The check post should also verify the quantity of different types of shrimps and fin fishes landed by the fishing vessels. The check post would be the machinery for the enforcement of the conditions of fishing license and requirement of various Acts and Ordinance applicable to their operation."

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযানসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী বৃদ্ধি এবং অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধের জন্য ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদী তীরে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আওতায় দেশের একমাত্র মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর কার্যপরিধি

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর কার্যপরিধি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ এবং ফিশিং লাইসেন্স এর অবস্থা মনিটরিংপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন অনুযায়ী নৌযানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির উপস্থিতি যেমন: লাইফ সেভিং সামগ্রী, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি এবং নেভিগেশন সরঞ্জামাদি পর্যবেক্ষণ করা।
- মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত জালের প্রকৃতি, সংখ্যা ও জালের ফাঁস পর্যবেক্ষণ করা।
- সাগরে আহরণকৃত প্রজাতি/গ্রুপভিত্তিক মাছের পরিমাণ, সংরক্ষণ পদ্ধতি, মৎস্যজীবীগণের সাগরে দুর্ঘটনায় কবলিত হওয়া সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- মাঝি ও ইঞ্জিন ড্রাইভারের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ ফিশিং লাইসেন্সে উল্লিখিত নাবিক সংখ্যা যাচাই।
- নৌযানে কোনরূপ নন-কম্প্লায়েন্স যথা-অনুমোদিত আকারের চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল, কিংবা অবৈধ কোন সরঞ্জাম পেলে তাৎক্ষণিক জব্দসহ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ফিশিং লাইসেন্সবিহীন কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্সযুক্ত নৌযানের নতুন লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- জব্দকৃত জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত কমিটির উপস্থিতিতে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
- সরকার ঘোষিত বিভিন্ন বন্ধ মৌসুম যেমন মা ইলিশ রক্ষা, জাটকা সংরক্ষণ অভিযান, ৬৫ দিন সাগরে সকল প্রকার মৎস্য, চিংড়ি ও ক্রাস্টাসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধ কাজ বাস্তবায়ন ।
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সময় সময় সরকার ঘোষিত বিভিন্ন পরিপত্র, আইন/বিধি সম্পর্কে মতবিনিময় সভা/সচেতনতা সভা আয়োজন করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেলেদের কাছে পৌঁছে দেয়া, জলদস্যু কবলিত জেলেদের সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বালাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, নৌ পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের ফলাফল

চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদী তীরে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আওতায় একটি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের পর হতে চট্টগ্রাম জেলার বন্দর এবং কর্ণফুলী নদীতীরস্থ ফিশারী ঘাট এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণসহ বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিনিয়ত যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমূহ চেকপোস্ট অতিক্রম করে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

- মৎস্য নৌযান কর্তৃক সাগরে মৎস্য আহরণে শৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণসহ সংকটাপন্ন অনেক প্রজাতির মাছের বংশকূল রক্ষা পাচ্ছে।
- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার অধিকাংশ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকে লাইসেন্সের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- বিদেশি ট্রলার/নৌযানের অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়েছে।
- নৌযান কর্তৃক অতিআহরণ বন্ধ করা, অননুমোদিত জাল/সরঞ্জাম ব্যবহার কমানো, অনুমোদিত আকার/সাইজের চেয়ে ছোট আকারের মৎস্য প্রজাতি আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
- আইইউইউ ফিশিং নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সময় সময় সরকার ঘোষিত বিভিন্ন পরিপত্র, আইন/বিধি সম্পর্কে মতবিনিময় সভা/সচেতনতা সভা আয়োজনের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের জীবনের নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মানব পাচার, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য পাচার রোধে সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে।

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট কর্তৃক মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন কার্যক্রম

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রামে একটিমাত্র মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট রয়েছে। যার সাহায্যে বিশাল বঙ্গোপসাগরের ৭১০ কিলোমিটার উপকূলীয় সীমানায় অবস্থিত প্রায় ২৫০টি মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও ৬৭৬৬৯ টি যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক নৌযানের মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের স্বল্প সংখ্যক নৌযান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করা সম্ভব হলেও উপকূলীয় অধিকাংশ নৌযান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী এর বাইরে থেকে যাচ্ছে। বাস্তব এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গোপসাগরের এমসিএস অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার ২০১৫ সালে ৮টি সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টের অনুকূলে পদ অনুমোদন করেছে। অবশিষ্ট ৮টি সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টেও পদ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের সহায়তায় দেশের মোহনা ও উপকূলীয় উপযুক্ত এলাকায় ১৬ টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প হতে উপকূলীয় যেসব এলাকায় সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন করা হবে সেগুলোর তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	প্রস্তাবিত চেকপোস্ট/স্থানের নাম
১	খুলনা	খুলনা	খুলনা মেট্রোপলিটন	রূপসা ঘাট
২		বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	কে বি মাছঘাট
৩			মোংলা	মোংলা মাছঘাট
৪		বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল মৎস্য বন্দর
৫		পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মহিপুর মৎস্য বন্দর (বিএফডিসি ঘাট হতে ১.৫ কিমি দূরে)

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	প্রস্তাবিত চেকপোস্ট/স্থানের নাম
৬	বরিশাল	ভোলা	দৌলতখান	পাতারখাল
৭			চরফ্যাশন	কচ্ছপিয়া (কুকরি ফেরিঘাট সংলগ্ন ১.৫ কিমি দূরে কোস্টগার্ড
৮		পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	পাড়েরহাট (বিএফডিসি ঘাটের কাছে)
৯		বরগুনা	পাথরঘাটা	ডকইয়ার্ড সংলগ (বিএফডিসি ঘাট ও কোস্টগার্ড এর কাছে)
১০	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	হাতিয়া	জাহাজমারা ঘাট
১১		চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	বাংলাবাজার ঘাট
১২			আনোয়ারা	ফকিরহাট
১৩		কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	উ: নুনিয়ারছড়া
১৪			কুতুবদিয়া	বড়ঘোপ
১৫			টেকনাফ	জালিয়াপাড়া
১৬		লক্ষ্মীপুর	কমলনগর	মতিরহাট

চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গাতে ইতিমধ্যে নির্মিত চেকপোস্টের আদলে প্রস্তাবিত চেকপোস্টগুলো নির্মাণ করা হবে। এজন্য জমি অধিগ্রহণসহ তিনতলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এসব চেকপোস্ট আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও দক্ষজনবল সমৃদ্ধ হবে। পাশপাশি প্রত্যেক চেকপোস্টে একটি হাই-স্পীড বোট, একটি পিকআপ ভ্যানগাড়ি, আধুনিক সকল প্রকার সুবিধা সম্বলিত একটি পন্টুন, বিভিন্ন অংশীজনের বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের সহায়তার জন্য ওয়্যারলেস সিস্টেমে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভেসেল মনিটরিং ও স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা রাখা হবে। মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল জেলের আলাদা পরিচিতি ডিভাইস বা সীম থাকবে যার সাহায্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামী বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ-জলদস্যুদের কবলে কোন জেলে পতিত হলে অথবা পর্যবেক্ষণকালে সমুদ্রে বা উপকূলীয় এলাকায় তাৎক্ষণিক তাঁদের সাহায্যের পদক্ষেপ গ্রহণ বা জীবন রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা যাবে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রস্তাবিত চেকপোস্টগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে সাগরে মাছ আহরণে গমনের পূর্বে স্থানীয় মৎস্য দপ্তর হতে মৎস্য আহরণ অনুমতিপত্র গ্রহণ ও মাছ আহরণ শেষে বন্দরে প্রত্যাবর্তন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। এসকল মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হলে আর্টিশনাল সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। মৎস্য আহরণে ও এর সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠির জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে এবং বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সমৃদ্ধির সোপান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার

জয়েন্ট মনিটরিং বলতে সম্মিলিতভাবে পরিবীক্ষণকে বোঝায়। যখন এ জয়েন্ট মনিটরিং কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে পরিচালনা করা হয় তখন সেটি জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার হিসেবে কাজ করে। বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার/নৌযানসমূহ নিবিড় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী, বিজিবি, র‌্যাবসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী/সংস্থা সহযোগে যৌথভাবে ট্রলার/নৌযান পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। আর এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টকে সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এসসিএমএফপি কর্তৃক জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম

বিশ্বব্যাংক এর ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়িত ''সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প'' এর অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণে সমন্বিত অংশীজন সমভিব্যাহারে একটি কার্যকর Monitoring Control and Surveillance (MCS) পদ্ধতির টেকসই বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে একটি জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (Joint Monitoring Center- JMC) প্রতিষ্ঠার সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার কো-অর্ডিনেশন কমিটি (JMC-CoordinationCommittee) কার্যকরকরতঃ বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Exclusive Economic Zone) নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সুযোগ রয়েছেঃ

- সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান এর অনুকূলে ফিটনেস সনদ ও রেজিস্ট্রেশন এবং এর অনুবর্তীক্রমে ফিশিং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজতর করা
- Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing নিয়ন্ত্রণ
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য আইন এর সঠিক প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ এবং সংগঠিত নন-কমপ্লাইন্স এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তায় (Safety of Life at Sea) সহায়ক সেনা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বিদেশি ট্রলার/নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ ও অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ
- সর্বোপরি সামুদ্রিক জলাশয়ের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে Blue Economy এর অপার সম্ভাবনা ও সুযোগের প্রসার ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সহায়ক পরামর্শ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে মৎন্য অধিদপ্তরকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করা।

জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার এর সদস্যবৃন্দ

মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল বাহিনী ও প্রশাসন, মানব ও মাদক দ্রব্য পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট অংশী প্রতিষ্ঠান, শুল্ক ও গোয়েন্দা সংস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস প্রদান কারী সংস্থা জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত রাখা বাঞ্চনীয়। সেজন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী, র‌্যাব, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, কাস্টম্‌স, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন,বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ পরিবহণ অধিদপ্তর, নৌ বাণজ্য দপ্তর, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানী লিঃ, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার- কো-অর্ডিনেশন কমিটি (JMC-Coordination Committee) গঠন করা যেতে পারে।

জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার পরিচালনা পদ্ধতি

পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (JMC) এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমযোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪	সময় ঃ ১০:৫০-১১:৫০	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ ক্যাচ ডকুমেন্টেশন ও উপাত্ত সংগ্রহ

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ক্যাচ ডকুমেন্টেশন বা আহরণ উত্তর দলিলাদি/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা ক্যাচ ডকুমেন্টেশন এর গুরুত্ব ও বিভিন্ন প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে সাম্যক ধারনা লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- ক্যাচ ডকুমেন্টেশন বা আহরণ উত্তর দলিলাদি/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• মজুদ নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকারভেদ • মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য প্রজাতি/স্টকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ • মৎস্য অবতরণকেন্দ্রসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ • অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ • বাণিজ্যিক ট্রলারের ফিশিং লগ-বুকের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• সেশনের সারসংক্ষেপ • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, পোস্টার, মার্কার, ভিডিও ক্লিপ ও মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

ক্যাচ ডকুমেন্টেশন ও উপাত্ত সংগ্রহ

ক্যাচ ডকুমেন্টেশন বা আহরণ উত্তর দলিলাদি/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফিশারিতে প্রতিনিয়ত কি কি ঘটনা ঘটছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। এ সকল ঘটনাবলী জানতে হলে আমরা ফিশারি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে থাকি। সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন হয় সেগুলো প্রধানত দুই ধরনের উৎস থেকে পাওয়া যায়।

- মৎস্য অবতরণকেন্দ্রসমূহ থেকে
- গবেষণাযানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে

১. মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকারভেদ ও জিপিএস ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ

সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন হয় সেগুলো প্রধানত দুই ধরনের উৎস থেকে পাওয়া যায়। এর একটি হলো, মৎস্য আহরণ জনিত কর্মকাণ্ড যা মৎস্য অবতরণকেন্দ্রসমূহ থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং অন্যটি হলো গবেষণা তরীর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে। প্রথমোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে সহজ ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। অন্যদিকে গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি হলেও ইহা নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া অনেক ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রধানত অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক তথ্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল। তবে, বর্তমানে বিভিন্ন তথ্যের বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের জন্য জিপিএস ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব বাড়ছে।

১.১ মজুদ নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকারভেদ

সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন হয় সেগুলো প্রধানত দুই প্রকার:

১) ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা-যাহা মৎস্য আহরণজনিকত কর্মকাণ্ড যা মৎস্য অবতরণকেন্দ্রসমূহ থেকে বা মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং
২) ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা-যাহা সময়ে সময়ে গবেষণাযানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা প্রধানত ০৫ প্রকার:
ক) ফিশিং ম্যাটেরিয়াল বা মাছ আহরণের সরঞ্জাম সংক্রান্ত তথ্য যা আবার ০২ প্রকার হয় যথা-
- ফিশিং ক্রাফ্‌ট (নৌকা সংক্রান্ত) তথ্য, এবং
- ফিশিং গিয়ার (জাল, বড়শি, ইত্যাদি সংক্রান্ত) তথ্য।

খ) ফিশিং অপারেশন বা মাছ আহরণ কার্যক্রমের তথ্য যেমন - কখন, কত সময়ে, কিভাবে মাছ আহরিত হয় সে সম্পর্কিত তথ্যাবলী।
গ) ফিশিং গ্রাউন্ড সংক্রান্ত তথ্য, যেমন-কোথা থেকে মাছ ধরা হয়েছে এবং সেখানকার পানির গভীরতা, রং, তাপমাত্রা, স্রোত ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।
ঘ) আহরিত মাছ সংক্রান্ত তথ্য যেমন- পরিমাণ, আকার, পরিপক্কতা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য
ঙ) পোস্ট হার্ভেস্ট সংক্রান্ত তথ্য যেমন- ব্যবহার, বাজারজাতকরণ, স্থানান্তর, সংরক্ষণ ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য ছাড়াও আধুনিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় আরো দুই ধরনের ডাটা বা তথ্যের প্রয়োজন হয়। এগুলো হলো-
ক) পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংক্রান্ত তথ্য যেমন- হ্যাবিট্যাট বা আবাসস্থলের পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন, দূষণের মাত্রা, ইত্যাদি।
খ) আর্থসামাজিক তথ্য যেমন- জেলেদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, শিক্ষা, পরিবার, জীবন যাত্রা, ইত্যাদি।

১.২ জিপিএস ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ

বর্তমানে বিভিন্ন ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট, ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের জন্য জিপিএস ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব বাড়ছে। জিপিএস হলো 'গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম' (Global Positioning System) শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ যা ব্যাপকভাবে কোন যানবাহন বা স্থাপনার তাৎক্ষনিক অবস্থান অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্ণয় করে প্রদর্শণ ও সংরক্ষণ করতে পারে। আধুনিক গবেষণাযান ও উন্নতমানের ট্রলার বহরে এটা সংযুক্ত থাকে। তবে আর্টিসানাল ফিশারিতে জিপিএস-এর তেমন একটা ব্যবহার নাই। তাই অবতরণকেন্দ্র ও সরাসরি ফিশিং বোট থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যথাসম্ভব বৃদ্ধি করতে হবে।

২. মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য প্রজাতি/স্টকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ

ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা প্রজাতি/স্টক ভিত্তিকভাবে সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। ফিশারি ইনডিপেন্ডেন্ট ডাটা প্রজাতি/স্টক ভিত্তিকভাবে সংগ্রহ করা বেশ কঠিন। তবে ব্যবহারের দিক বিবেচনা করলে ফিশারি ইনডিপেন্ডেন্ট ও ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট সকল প্রকার তথ্যই প্রজাতি/স্টক ভিত্তিকভাবে সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি। প্রজাতি/স্টকভিত্তিকভাবে সংগ্রহ করা তথ্য না হলে সঠিকভাবে মাছের মজুদ নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

**কোন ধরণের তথ্য কখন কী পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে তার নির্দেশনা সংযোজনী- ১ এ প্রদান করা হলো।

২.২ প্রজাতি/স্টকভিত্তিক তথ্যের সুবিধাসমূহ

- মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য লেন্থ-ফ্রিকোয়েন্সি ডাটার সাথে আহরণ সংক্রান্ত তথ্য ও জৈবিক তথ্যের সঠিক সমন্বয় করে সঠিকভাবে মাছের মজুদ নিরূপণ করা যায়
- ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রজাতি/স্টক সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ রাখা যায়
- সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থাপনা সহজ ও সঠিক হয়

২.৩ প্রজাতি/ স্টকভিত্তিক তথ্যের অসুবিধাসমূহ

- তথ্য সংগ্রহের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের বিশেষ করে কোন প্রজাতির, ট্যাক্সনমী, মাইগ্রেশনসহ, পরিপক্কতা, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা কঠিন
- অবতরণকেন্দ্র থেকে অতি অল্প সময়ে অনেকগুলো প্রজাতির আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়

৩. মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য জৈবিক তথ্য সংগ্রহ

মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য যে সকল পদ্ধতি বিদ্যমান আছে সেগুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করার জন্য সহায়ক তথ্য হিসাবে মাছের জৈবিক অবস্থা, বিশেষ করে পরিপক্কতা ও প্রজনন সম্পর্কিত তথ্যাবলী অত্যন্ত জরুরি। এই জন্য অন্যান্য ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটার সাথে মাছের জৈবিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। জৈবিক অবস্থা, বিশেষকরে পরিপক্কতা ও প্রজনন সম্পর্কিত তথ্যাবলী জানতে মাছের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এই নমুনার প্রধান উৎস হলো ফিশিং বোট যাহা সরাসরি মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং মাছ ধরার পর নিয়মিত বা অনিয়মিভাবে অবতরণকেন্দ্রে আসে।

৩.১ জৈবিক তথ্য সংগ্রহের সুবিধাসমূহ

- মজুদ নিরুপণের জন্য যে সকল পদ্ধতি বিদ্যমান আছে সেগুলোর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করার জন্য মাছের জৈবিক অবস্থা সহায়ক তথ্য হিসাবে কাজ করে।
- অবতরণকেন্দ্রে প্রায় সব সময় মাছের নমুনা পাওয়া যায় এবং এখান থেকে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৩.১ জৈবিক তথ্য সংগ্রহের অসুবিধাসমূহ

- মাছের জৈবিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন হয়।
- পর্যাপ্ত মাছের নমুনা সংগ্রহ ও ব্যবচ্ছেদ করা বেশ ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য।

**কোন ধরণের তথ্য কখন কী পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে তার নির্দেশনা সংযোজনী- ১ এ প্রদান করা হলো।

৪. মৎস্য অবতরণকেন্দ্রসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ

গবেষণাযানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি হলেও তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া অনেক ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রধানত অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক তথ্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল। বাংলাদেশেরমত উন্নয়নশীল দেশে তাই মাছের মজুদ নিরূপণের জন্য অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪.১ অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক তথ্যের সুবিধাসমূহ

- মৎস্য আহরণজনিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য মৎস্য অবতরণকেন্দ্র থেকে বেশি পাওয়া যায়
- অবতরণকেন্দ্র থেকে তথ্য তুলনামূলকভাবে সহজে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়
- তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বেশি উপযোগী

৪.২ অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক তথ্যের অসুবিধাসমূহ

- মৎস্য আহরণজনিত কর্মকান্ডের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া কঠিন
- অবতরণকেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মৎস্যজীবীদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হতে হয় বলে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মৎস্যজীবীদের বিরক্তির কারণ হয়
- তথ্য সংগ্রহের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের ও তথ্য সংগ্রহকারীগণের অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে সাবজেকটিভ ভুল বেশি হয়।

৫. অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ

- অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক যান্ত্রিক ফিশিং বোটের তথ্য সংগ্রহ
- অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক ক্যারিয়ার বোটের তথ্য সংগ্রহ
- অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক অযান্ত্রিক ফিশিং বোটের তথ্য সংগ্রহ
- মাছের অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক লেন্থ-ফ্রিকোয়েন্সি ডাটা সংগ্রহ
- মাছের অবতরণকেন্দ্রভিত্তিক লেন্থ-ওয়েট ডাটা সংগ্রহ
- মাছ আহরণকারী সরঞ্জামের (Gear) তথ্য সংগ্রহ
- বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলারের তথ্য সংগ্রহ
- বাণিজ্যিক সাদামাছ ও অন্যান্য ট্রলারের তথ্য সংগ্রহ
- ফিশিং বোট বা ট্রলারের ফিশিংরত অবস্থায় সরাসরি তথ্য সংগ্রহ

****কোন ধরণের তথ্য কখন কী পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে তার নির্দেশনা সংযোজনী- ১ এ প্রদান করা হলো।**

৬. বাণিজ্যিক ট্রলারের ফিশিং লগ-বুকের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার

বাণিজ্যিক ট্রলারের ফিশিং লগ-বুকের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া হলো বিপুল পরিমাণ ডাটা থেকে নিজেদের ব্যবহার উপযোগী ডাটা তৈরির প্রক্রিয়া মাত্র। সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরুপণের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন হয় সেগুলোর প্রধানত দুই ধরনের উৎস থেকে পাওয়া যায়। একটি হলো ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা বা গবেষণা তরীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যটি হলো ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা বা অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য। ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটার প্রধান উৎস হলো ফিশিং বোট বা ট্রলার যাহা সরাসরি মাছ/চিংড়ি ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং মাছ/চিংড়ি ধরার পর নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে অবতরণকেন্দ্রে আসে। অবতরণকেন্দ্রে তারা সরাসরি বা মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে মাছ/চিংড়ি বিক্রয় করে এবং পরবর্তী ট্রিপে মাছ/চিংড়ি ধরার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী, খাদ্য, বরফ, ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করে পুনরায় মাছ ধরতে যায়। যেহেতু ফিশিং বোট/চিংড়ি ট্রলার সরাসরি মাছ/চিংড়ি ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং মাছ/চিংড়ি ধরার সময় বাধ্যতামূলকভাবে যে লগ-বুক পূরণকরে থাকে তা সাথে থাকে, সেহেতু এখান থেকে প্রায় সকল ধরণের তথ্য তুলনামূলকভাবে বেশি নির্ভরতার সাথে পাওয়া যায়।

৬.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

ট্রলারের লগ-বুক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ চট্রগ্রামের নির্ধারিত ট্রলার অবতরণকেন্দ্রে যেতে হবে। সেখানে উপস্থিত ফিশং ট্রলারে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গিয়ে সরাসরি ট্রলারের মাস্টারের নিকট থেকে ফিশিং লগ-বুক থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তবে, বিকল্প হিসাবে, মৎস্য অধিদপ্তরের চট্রগ্রামস্থ সামুদ্রিক ইউনিটে জমাকৃত লগ-বই এর কপি থেকেও এই সকল তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা যেতে পারে। পূরণ এই ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান তথ্যসমূহ হলো- মাছ/চিংড়ি/স্কুইড আহরণের এলাকার নাম, পানির গভীরতা, জোয়ার/ভাটা, জিপিএস লোকেশন, আবহাওয়া, আহোরিত মোট মাছ/চিংড়ি/স্কুইড পরিমাণ, প্রতিটি প্রজাতির আনুমানিক % কম্পোজিশন, ইত্যাদি। সম্ভব হলে আকার ও ইঞ্জিনের শক্তি (HP, Horse Power) বিবেচনা করে প্রতিধরনের জন্য কম পক্ষে ০৩টি ট্রলার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সংগ্রহকৃত তথ্যসমূহ বিভিন্ন টাইম-সিরিজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে যারে।

৬.২ তথ্য সংগ্রহের সুবিধাসমূহ

- ট্রলার সরাসরি মাছ/চিংড়ি/স্কুইড ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং বাধ্যামূলকভাবে লগ-বই পূরণ করে থাকে, তাই এখান থেকে প্রায় সকল ধরণের তথ্য তুলনামূলকভাবে বেশি নির্ভরতার সাথে পাওয়া যায়।
- ট্রলারসমূহ চট্রগ্রামের/খুলনার নির্ধারিত অবতরণকেন্দ্রে প্রায় সব সময় পাওয়া যায় এবং এখান থেকে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। বিকল্প হিসাবে, মৎস্য অধিদপ্তরের চট্রগ্রামস্থ সামুদ্রিক ইউনিটে এবং খুলনায় জমাকৃত লগ-বই এর কপি থেকেও এই সকল তথ্যসমূহ সহজে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৬.৩ তথ্য সংগ্রহের অসুবিধাসমূহ

- ট্রলারের মাস্টার বা অন্যান্য সদস্যরা সব সময় সঠিকভাবে লগ-বই পূরণ করে না বা করতে পারে না।
- তথ্য সংগ্রহের সময় ট্রলারের মাস্টার বা অন্যান্য সদস্যদের কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে, তাই তারা বিরক্ত প্রকাশ করতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪ | সময়: ১১:৫৫- ১২:৫৫ | মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ ব্যবস্থাপনা: ভেসেল বেইজড্ সার্ভে (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা)**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভেসেল বেইজ্ড সার্ভের (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহ) গুরুত্ব এবং বাংলাদেশে বর্তমানে ভেসেল বেইজ্ড সার্ভের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হবে যাতে তাঁরা ভেসেল বেইজ্ড সার্ভের গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ভেসেল বেইজ্ড জরিপ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- বাংলাদেশে ভেসেল বেইজ্ড সার্ভের (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহের) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- মাছের মজুদ নিরূপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে পরিচালিত ভেসেল বেইজড্ (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহের) জরিপ কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- মীন সন্ধানী জাহাজে গবেষণা ভেসেল বেইজড্ সার্ভে কার্যক্রমের পর্যায় ক্রমিক কাজের ধাপ ও ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• বাংলাদেশে ভেসেল বেইজ্ড সার্ভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস • মাছের মজুদ নিরূপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা • বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে পরিচালিত ভেসেল বেইজ্ড জরিপ • মীন সন্ধানী জাহাজে গবেষণা ভেসেল বেইজ্ড সার্ভে কার্যক্রম	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• সেশনের সারসংক্ষেপ • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, পোস্টার, ভিডিও ক্লিপস্, মার্কার ও মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ ব্যবস্থাপনা: ভেসেল বেইজড্ সার্ভে (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাটা)

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিনে অবস্থিত অপার সম্ভাবনাময় ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ফানেল আকৃতির বঙ্গোপসাগর। বর্তমানে বিশাল এ জলরাশিকে দেশের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যত অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মূলত এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বিপুল ও বৈচিত্রময় এবং নবায়নযোগ্য এ মৎস্যসম্পদ সম্পদের সঠিক মাত্রায় আহরণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রায়োগিক ও ধারাবাহিক জরিপ এবং গবেষণা। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সাগর উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট গুরত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যত দেশ বিনির্মাণে সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণই এই সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

২. বাংলাদেশে ভেসেল বেইজড্ (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট) সার্ভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও আহরণের সূচনাকল্পে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। ১৯৭২খ্রি. সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ‘মাছ হবে দেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ’। একই বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০(দশ) টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রথমবারেরমত বাণিজ্যিকভাবে সাগর থেকে মৎস্য আহরণ শুরু করে (DoF, ২০১৭)। এরপর ১৯৭৯ খ্রি. বাংলাদেশ, জাপান সরকার এবং ইউএনডিপি'র অনুদানে ‘সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প’ গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ খ্রি. সালে প্রকল্পটি সংশোধিত ‘সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প’ নামে দুই বৎসর মেয়াদী ২য় পর্যায়ে অনুমোদিত হয় এবং ১৯৯১ খ্রি. সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৯৮০-৮৩ খ্রি. সালে গবেষণা জাহাজ ‘অনুসন্ধানী’ যোগে স্থানীয় গবেষকদের দ্বারা এবং ১৯৮৪-৮৭ খ্রি. সাল মেয়াদে বিদেশি বিশেষজ্ঞবৃন্দের সাথে যৌথভাবে তলদেশীয় মাছ (Demersal) ও চিংড়ি (Shrimp) এবং মহাসাগরীয় (Oceanic) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক ভিত্তিতে জরিপ ও গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর ১৯৯৫ খ্রি. সালের ১ জুলাই হতে প্রকল্পটি ‘সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট’ নামে স্থায়ী ভাবে সরকারের রাজস্ব খাতভূক্ত হয় (MFSMU, ২০১৭)।

১৯৮০ খ্রি. সাল হতে ২০০১ খ্রি. সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে আরভি অনুসন্ধানী কর্তৃক ৮৪(চুরাশি) টি এবং ১৯৮৬ খ্রি. সাল থেকে ১৯৯৭ খ্রি. সাল পর্যন্ত আরভি মাছরাঙ্গা কর্তৃক ২১(একুশ) টি জরিপ ক্রুজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে গবেষণা জাহাজদ্বয় মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ায় বঙ্গোপসাগরে জরিপ ক্রুজ পরিচালনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ খ্রি. সাল থেকে জরিপ কার্যক্রম সীমিত পর্যায়ে ল্যান্ড বেইজ্ড জরিপ কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে।

এরপর দীর্ঘ দিনের অমিমাংসিত সমুদ্রসীমা ২০১২ খ্রি.সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ খ্রি. সালে ভারতের সাথে নিষ্পত্তি হওয়ার ফলে ১১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় বাংলাদেশের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনা ও বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৬ খ্রি. সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এর যৌথ অর্থায়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষণা জাহাজ ‘মীন সন্ধানী’ মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে। একই সাথে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য শিক্ষক এবং FAO প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষিত সায়েন্স টীম গঠন করা হয়েছে। যে টিমের পরিচালনায় ওই বছরের নভেম্বর মাস হতে বঙ্গোপসাগরে ৩(তিন) ধরনের (Demersal, Pelagic and Shrimp) মৎস্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে প্রায় দেড় যুগ ধরে বন্ধ থাকা জরিপ কার্যক্রম আবারও শুরু হয়েছে যা দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩. মাছের মজুদ নিরূপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা উপাদান হল প্রজাতি ভিত্তিক বা পপুলেশন ভিত্তিক মৎস্যসম্পদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরণের গবেষণার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের মজুদের গতি-প্রকৃতি সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যার ফলে সাধারণত কোন একটি জলজ পরিবেশে মাছের বর্তমান মজুদ ও এর বিভিন্ন প্যারামিটার সম্পর্কে জানা যায়।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং আইন তৈরিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাছের মজুদ সম্পর্কিত তথ্য, সেদিক বিবেচনায় মৎস্যসম্পদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং এর প্রকৃত বিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত সার্ভে বা জরিপের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪. গবেষণা জাহাজ আরভি মীন সন্ধানীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

গবেষণা জাহাজ মীন সন্ধানী মূলত: ২০০০ খ্রি. সালের পর থেকে বঙ্গোপসাগরে বন্ধ হয়ে যাওয়া সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ (ভেসেল বেইজড্) কার্যক্রমকে পূণরায় চালু, বর্তমান সময়ে সাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রাপ্যতা, উপস্থিতিসহ (Abundance) ক্রমবর্ধমান মৎস্য আহরণ চাপের (Fishing Pressure) সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করতে বহুমাত্রিক মৎস্য জরিপের লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রমকে নিখুত করতে আধুনিক সকল সরঞ্জামাদি সজ্জিত আরভি মীন সন্ধানী জাহাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

জাহাজের নাম	আরভি মীন সন্ধানী
দৈর্ঘ্য	৩৭.৮ মিটার
প্রস্থ	৯.২০ মিটার
গভীরতা	৪.৬০ মিটার
ড্রাফ্‌ট	৩.২০ মিটার
ইঞ্জিন শক্তি	১৪০০ এইচপি
গ্রস টনেজ	৩৬৩ টন
জনবল ধারণ সুবিধা	২৮ জন
সাগরে অবস্থানের মেয়াদ	২৫ দিন

চিত্র: সাগরে ভাসমান আর. ভি. মীন সন্ধানী

ছকে বর্ণিত কাঠামো ও সুবিধাদির পাশাপাশি জাহাজ পরিচালনার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি যেমন- RADAR, SONAR, Echo-Sounder, Gyro-compass সহ বিভিন্ন ধরণের জাল (Shrimp Trawl Net, Demersal Trawl Net and Pelagic Trawl Net) অপারেশনের জন্য আধুনিক মানের হাইড্রলিক সিস্টেম জাহাজটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

৫. বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে পরিচালিত ভেসেল বেইজ্‌ড (ফিশারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট) জরিপ কার্যক্রম

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ (Standing Stock) নিরূপন, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ মাত্রা (Maximum Sustainable Yeild) নির্ণয়, সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির তালিকা প্রণয়ন, ওশেনাগ্রাফিক গবেষণা ও নতুন মৎস্য ও চিংড়ি আহরণ ক্ষেত্র নির্ণয়ই মূলত: গবেষণা ও জরিপ জাহাজ আরভি মীন সন্ধানীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে আরভি মীন সন্ধানী সায়েন্স টিম ভেসেল বেইজড্ জরিপ কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে।

ক. তলদেশীয় মৎস্যসম্পদ জরিপ (Demersal Survey)

খ. চিংড়ি সম্পদ জরিপ (Shrimp Survey)

গ. ওপরস্তরীয় মৎস্যসম্পদ জরিপ (Pelagic Survey)

সাধারণত যেকোন জরিপের জন্য প্রাথমিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় হল সার্ভে ডিজাইন (জরিপ নকশা/পরিকল্পনা)। সামাগ্রিকভাবে এ ডিজাইন জরিপের জন্য সময়, এলাকা, পদ্ধতি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ধরণ, জনবলসহসার্ভে সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করবে। সার্ভে ডিজাইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হল- সার্ভে ম্যাপ, যেটি ভৌগলিকভাবে সার্ভে এরিয়া ও সার্ভে স্টেশন চিহ্নিত করবে। বঙ্গোপসাগরেতলদেশীয় মৎস্যসম্পদ জরিপের ক্ষেত্রে সার্ভে ম্যাপ তৈরির সময় গভীরতা ভিত্তিক ৪ টি জোন (Depth Zone: Inshore: 10-40m, Midshore: 40-80m, Offshore: 80-100m and Deep Offshore: 100-200m depth)ও ৩ টি গ্রাউন্ডে (Swatch, Middle and South) সমগ্র সার্ভে এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে। অপরপক্ষে চিংড়ি সম্পদ জরিপের ক্ষেত্রে গভীরতা ভিত্তিক ৩টি জোন (Inshore: 10-40m, Midshore: 40-80m and Offshore: 80-100m) ও ৩ টি গ্রাউন্ডে (Swatch, Middle and South) সার্ভে এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে।

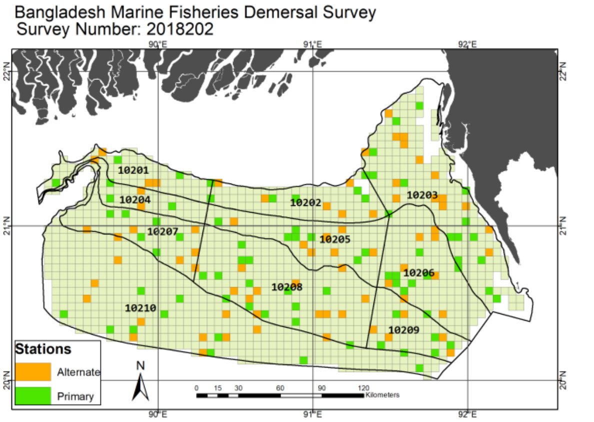

২০১৭-১৮ খ্রি. সালে আরভি মীন সন্ধানী পরিচালিত ডিমার্সাল সার্ভে ম্যাপ।

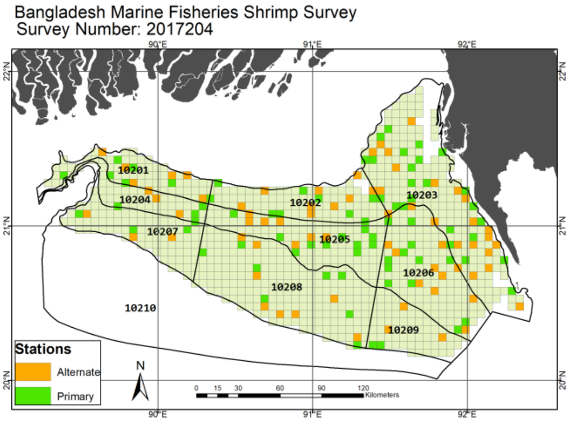

২০১৭-১৮ খ্রি. সালে আরভি মীন সন্ধানী পরিচালিত শ্রিম্প সার্ভে ম্যাপ।

পেলাজিক সার্ভের ক্ষেত্রেও ১০-২০০ মি. গভীরতা অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দিষ্ট দুরুত্ব বজায় রেখে সরলরৈখিক রেখা ভিত্তিক ম্যাপ অংকন করে সার্ভে অপারেশন শুরু হয়েছে। ডিমার্সাল ও শ্রিম্প সার্ভের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট Sampling Station I Trawling খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও পেলাজিক সার্ভের ক্ষেত্রে Sighting কে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

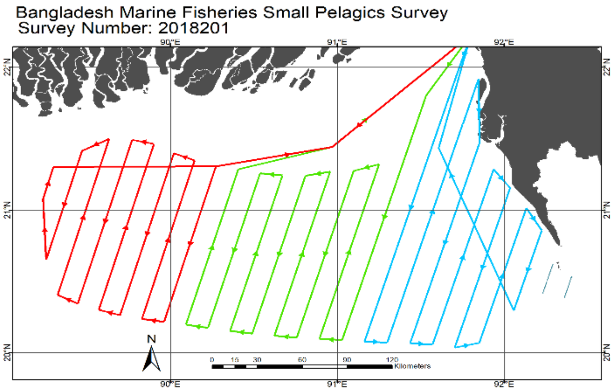

২০১৭-১৮ খ্রি. সালে আরভি মীন সন্ধানী পরিচালিত পেলাজিক সার্ভে ম্যাপ

৬. মীন সন্ধানী জাহাজে গবেষণা ভেসেল বেইজড্ সার্ভে কার্যক্রমের পর্যায় ক্রমিক ধাপ

বিজ্ঞানী ও ক্রুদের সম্মিলিত ক্রুজ আদেশ প্রণয়ন
⇩
জরিপের উদ্দেশ্যে মীন সন্ধানীর যাত্রা
⇩
নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে জাল প্রস্তুতকরণ ও অপারেশন
⇩
নির্দিষ্ট সময় পরে জাল উত্তোলন
⇩
আহরিত মৎস্য ও অন্যান্য প্রজাতির প্রাথমিক বাছাইকরণ
⇩
অভিজ্ঞ টেক্সোনমিস্ট দ্বারা প্রজাতিভিত্তিক বাছাইকরণ
⇩
বাছাইকৃত প্রজাতি সমূহের দৈর্ঘ্য ও ওজনের তথ্য লিপিবদ্ধকরণ
⇩
সফটওয়্যারে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ
⇩
সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষণ
⇩
মৎস্যসম্পদের মজুদ সম্পর্কে ধারনালাভ

৭. আরভি মীন সন্ধানী জাহাজের জরিপ কাজের ফলাফল (ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত)

মীন সন্ধানী জাহাজ এখন পর্যন্ত ২৪ টি ক্রুজ সফলভাবে পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে ১০ টি শ্রিম্প, ১০ টি ডিমার্সাল ও ৪ টি পেলাজিক ক্রুজ রয়েছে। এ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল ও গভীরতায় সর্বমোট প্রাপ্ত ৪৫৭ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণিকূলের মধ্যে ৩৯৪ প্রজাতির মাছ, ৪৯ প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান (চিংড়ি-লবস্টার ও কাঁকড়া) ও ১৪ প্রজাতির সেপালোপোড শনাক্ত করা হয়েছে।

৮. আরভি মীন সন্ধানী জাহাজে মৎস্যসম্পদের মজুদ বহির্ভূত অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম

১) সাগরের বিভিন্ন অঞ্চল ও গভীরতায় ওশানোগ্রাফিক তথ্যসংগ্রহ (লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেন)।

২) সাগর তলদেশের মাটি সংগ্রহ এবং বেন্থোস সম্পর্কে ধারণালাভ।

৩) বিভিন্ন অঞ্চলে সাগরের উপরিস্তরের পানিরপ্লাংকটনের ঘন্ন এবং প্রজাতি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণালাভ।

৪) নতুন মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিকূল শনাক্তকরণ।

৫) মাইক্রোপ্লাস্টিক এর উপস্থিতি, ধরন এবং পরিমাণ নিরূপন।

৯. উপসংহার:

বঙ্গোপসাগরের জরিপ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। সাধারণত একটি মৎস্যসম্পদ জরিপের ৫-১০ বছরের ধারাবাহিক ডাটার বিশ্লেষণ থেকে ওই জলসীমায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জলজ প্রাণীর Standing Stock ও স্ব-স্ব প্রজাতির Population Parameter সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ থাকার পর পুণরায় মাত্র দুটি ধারাবাহিক বছরের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে আরভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে। ফলে জরিপের একটি পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল পেতে আরো কমপক্ষে ৭-৮ বছরের ধারাবাহিক ডাটার প্রয়োজন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪	সময়: ১৪:০০- ১৫:০০	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ ব্যবস্থাপনা: ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভে (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা)

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ল্যান্ড বেইজ্‌ড সার্ভের (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহ) ইতিহাস এবং বাংলাদেশে বর্তমানে ল্যান্ড বেইজ্‌ড সার্ভের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হবে যাতে তারা ল্যান্ড বেইজ্‌ড সার্ভের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন পূর্বক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ল্যান্ড বেইজড্ জরিপ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- বাংলাদেশে ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভের (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহের) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বর্তমানে সমুদ্র উপকূলে পরিচালিত ল্যান্ড বেইজড্ (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহের) জরিপ কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভে সংক্রান্ত বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ও করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন • মাছের মজুদ নিরূপণে ল্যান্ডবেইজড্ সার্ভের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• সকল প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, পোস্টার, ভিডিওক্লিপস্, মার্কার ও মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।			

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ ব্যবস্থাপনা: ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভে (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা)

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় আহরিত চিংড়ি ও মৎস্য প্রজাতি ছাড়াও রয়েছে অনাহরিত এবং আহরণযোগ্য বিপুল পরিমাণ মৎস্যসম্পদ। অনাহরিত, আহরণযোগ্য মৎস্যসম্পদ জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হলে এ খাত থেকে দেশের বিদ্যমান প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণসহ অতিরিক্ত সম্পদ রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নিমিত্তে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপের স্বার্থে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সেক্টরে ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভের মাধ্যমে (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি।

২. বাংলাদেশে ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভের (ফিশারি ডিপেন্ডেন্ট ডাটা সংগ্রহের) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭৯ খ্রি. বাংলাদেশ, জাপান সরকার এবং ইউএনডিপি'র অনুদানে 'সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প' গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ খ্রি. সালে প্রকল্পটি সংশোধিত 'সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প' নামে দুই বৎসর মেয়াদী ২য় পর্যায়ে অনুমোদিত হয় এবং ১৯৯১ খ্রি. সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৯৮০-৮৩ খ্রি. সালে গবেষণা জাহাজ 'অনুসন্ধানী' যোগে স্থানীয় গবেষকদের দ্বারা এবং ১৯৮৪-৮৭ খ্রি. সাল মেয়াদে বিদেশি বিশেষজ্ঞবৃন্দের সাথে যৌথভাবে তলদেশীয় মাছ (Demersal) ও চিংড়ি (Shrimp) এবং মহাসাগরীয় (Oceanic) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক ভিত্তিতে জরিপ ও গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর ১৯৯৫ খ্রি. সালের ১ জুলাই হতে প্রকল্পটি 'সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট' নামে স্থায়ী ভাবে সরকারের রাজস্ব খাতভূক্ত হয় (MFSMU, ২০১৭)।

পরবর্তীতে ২০০১ খ্রি. সালে ভেসেল বেইজড সার্ভে বন্ধ হয়ে গেলে এবং ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

৩. চলমান ল্যান্ড বেইজড সার্ভে কার্যক্রম

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ খ্রিঃ সময়ের জরিপ কাজের জন্য মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক মৎস্যসম্পদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত ১৫ টি অবতরণকেন্দ্র/ঘাট নির্বাচন করা হয়। অবতরণকেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জালের ব্যবহার, প্রজাতির প্রকৃতি এবং নৌযানের সংখ্যা ইত্যাদি প্রাধান্য দেয়া হয়।

৩.১ অবতরণকেন্দ্র সমূহের নাম

সাধারণত কেন্দ্র সমূহকে ফিশারিজের ধরণের ওপর ভিত্তি করে দুভাগে ভাগ করা হয়। যা নিম্নরুপ-

ক) হাঙ্গর ফিশারীজ : ফিশারি ঘাট, চট্টগ্রাম ও বিএফডিসি ঘাট, কক্সবাজার। মোট ২ টি।

খ) আর্টিসানাল ফিশারিজ:

চট্টগ্রাম: গহিরা, জাহাজঘাটা, কাটগড়, আনন্দবাজার, কাট্টলী, খেজুরতলা, কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, বাড়বকুন্ড ও সীতাকুন্ড ঘাট। মোট ১১ টি ঘাট।

কক্সবাজার: নাজিরটেক, বিএফডিসি ঘাট, মহেশখালী ও টেকনাফ ঘাট: মোট ০৪ টি ঘাট।

উল্লেখিত ১৫ টি (১১+৪) ঘাট হতে অবতরণকৃত মাছের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

৩.২ জরিপ কাজে ল্যান্ড বেইজ্ড তথ্যের ধরন ও বিবরণ

ক) মোহনা বেহুন্দি জাল- Estuarine Set Bag Net (ESBN), সাগর বেহুন্দি জাল -Marine Set Bag Net (MSBN), পেকুয়া জাল, (রূপান্তরিত বেহুন্দি জাল-Modified set bag net) এ আহরিত মাছের প্রজাতি শনাক্তকরণ, দৈর্ঘ্য ও ওজন এবং উপস্থিতির হার নির্ণয় করা হয়।

খ) অবতরণকৃত / আহরিত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য, ওজন ও পরিমাণ নিরূপন করা; টং জাল (Fixed drift gill net), ছোট ভাসান জাল (Small mesh drift gill net), বড় ভাসান জাল (Large mesh drift gill net), হাঙ্গর জাল (Modified large mesh drift gill net), রগ জাল (Monofilament small mesh drift gill net) দ্বারা ধৃত মাছের নমুনা সংগ্রহ, শনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

৩.৩ অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক কাজের ধারা

ক) পেকুয়া জাল, মোহনা বেহুন্দি জাল, সাগর বেহুন্দি জাল ও রগ জাল দ্বারা উপকূলীয় এলাকার ফিসারীঘাট, গহিরা, জাহাজঘাটা, কাটগড়, আনন্দবাজার, কাট্টলী, খেজুরতলা, কুমিরা, বাঁশবাড়িয়া, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, নাজিরটেক, বিএফডিসি ঘাট, মহেশখালী ও টেকনাফ মৎস্য অবতরণকেন্দ্র / ঘাট হতে জোয়ার- ভাটার সময় অনুযায়ী প্রতি ঘাটে একজন কর্মকর্তা অথবা একজন কর্মচারী (০১টি গ্রুপ) আহরিত মাছের নমুনা (পেকুয়া জাল ও মোহনা বেহুন্দি জাল হতে অবাছাইকৃত) সংগ্রহ করা হয়। উক্ত নমুনা বিশ্লেষণ পূর্বক আহরিত বিভিন্ন প্রজাতি সমূহ শনাক্ত করা এবং মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন নির্ণয় করা হয়।

খ) উপকূলীয় অঞ্চলে সাধারণত টং জাল এবং গভীর সমুদ্রে ছোট ভাসান জাল এবং বড় ভাসান জাল দ্বারা ইলিশ মাছ আহরিত হয়ে থাকে। আহরিত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি ও গড় দৈর্ঘ্য, ওজনের বিস্তৃতি ও গড় ওজন এবং অবশেষে মোট আহরণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

গ) চট্টগ্রামস্থ ফিশারীঘাট এবং কক্সবাজারস্থ বিএফডিসি ঘাট হতে হাঙ্গর জাতীয় মাছের (হাঙ্গর এবং হাউস) তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ কাজে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার হতে প্রতিমাসে ০১টি গ্রুপের মাধ্যমে ০৪ দিন করে হাঙ্গর জাতীয় মাছের অবতরণের পরিমাণ, প্রজাতি শনাক্তকরণ, প্রজাতির সংখ্যা ও অবতরণকৃত হাঙ্গরের গড় ওজন নির্ণয় করা হয়।

চিত্র: আর্টিসানাল ফিশারিজে ব্যবহৃত নৌবহর

চিত্র: সাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান

৪. ল্যান্ড বেইজ্‌ড সার্ভে কার্যক্রমে বিদ্যমান সমস্যা:

- সংগৃহীত আর্টিসানাল ফিশারিজের ডাটা বিশ্লেষণের জন্য দক্ষ জনবলের অভাব।
- ল্যান্ড বেইজ্‌ড সার্ভে কার্যক্রমে অপ্রতুল জনবল এ সেক্টরের সবচেয়ে বড় সমস্যা।
- বর্তমানে প্রচলিত বাজেট কাঠামোতে যথেষ্ট বাজেট সংকুলান না থাকায় তথ্য সংগ্রহে তথা সার্ভে কার্যক্রমে শিথিলতা দেখা যায়।
- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বাহিরে অন্যান্য উপকূলীয় জেলায় আর্টিসেনাল ফিশারিজের তথ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সময় জেলেদের নিকট থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়া।
- আর্টিসানাল ফিশারিজের ডাটাবেজ না থাকা।
- গাড়ীসহ অন্যান্য লজিস্টিকসের অপ্রতুলতা।

৫. ল্যান্ড বেইজ্‌ড সার্ভে কার্যক্রমের উন্নতিকল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নে ভবিষ্যত করণীয়

দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই একটি দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হয়। সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টর বর্তমানে দেশের অন্যতম উদীয়মান অর্থনৈতিক খাত। এ দিক বিবেচনায় সমুদ্র এলাকায় মৎস্যখাতকে আরো বিকশিত করতে দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই। সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের মানবসম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত বিষয়ে নজর দেওয়া যেতে পারে।

- সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ গবেষণায় দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিশেষজ্ঞ দল গঠন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞদেরকে প্রাধান্য দিয়ে এবং একইসাথে নতুনদের সমন্বয়ে বিশেষ কাঠামো গঠন করা যেতে পারে।
- সমুদ্র সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে দীর্ঘদিন যারা বঙ্গোপসাগরের জলজ সম্পদ নিয়ে কাজ করেছেন তাদের সমন্বয়ে পরামর্শক দল তৈরি করা।
- বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের শূন্য পদসমূহ পূরণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী এক একজনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিক ও প্রয়োজন সাপেক্ষে দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং একই সাথে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন কঠোরভাবে যাচাই করা যাতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়।
- সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে নতুন জনশক্তি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এ খাতে কাজ করতে আগ্রহী ও তরুণদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- স্বল্প মেয়াদি ফলাফলের চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদি ও টেকসই ফলাফলকে গুরুত্ব দেওয়া। এক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় সামগ্রিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নকল্পে প্রায়োগিক গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং জরিপ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা।
- জনশক্তির মানোন্নয়নে পাক্ষিক বা মাসিক কাজের মূল্যায়ন সাপেক্ষে অগ্রগামীদেরকে পুরস্কৃত করা। কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার অগ্রগতিকে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

৬. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ সংক্রান্ত সুপারিশ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষনে ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জেলেদের সক্রিয় সহযোগীতা ও অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে মৎস্য আহরণ বিষয়ক সঠিক জ্ঞান ও উদ্বুদ্ধকরণ খুবই জরুরি। সঠিকভাবে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লেখিত বিষয়ে দৃষ্টিদান একান্ত জরুরী।

- জেলেদেরকে সচেতন করে ক্ষতিকর বেহুন্দি জালের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব জাল (তিন পরল্যা জাল ও ফাঁস জাল) ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহারের দিকে আগ্রহ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। সম্ভব হলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বহি:র্ভূত বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- মোহনা অঞ্চলে ও যে সকল ঋতুতে বানিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি যেমন লটিয়া, পোয়া, কাটা মাছ, চেউয়া, ছুরি, ও অন্যান্য কিশোর মাছ অধিকহারে ধরা পড়ে, সে সব অঞ্চল ও ঋতু চিহ্নিত করে স্থানীয়ভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ করা যেতে পারে, যাতে কিশোর বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মূল্যবান প্রজাতিগুলো রক্ষা পায়।
- মৎস্য আহরণে চাপ কমাতে ক্ষতিকর জাল ব্যাবহারকারী মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের বিকল্প হিসেবে এবং উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য চাষ (Mariculture) প্রবর্তন করা অপরিহার্য। মৎস্যসম্পদ চাষের মধ্যে কোরাল, কাঁকড়া, শৈবাল ও ওয়েস্টার জাতীয় মৎস্যসম্পদ চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকার ১০ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত এলাকাকে নার্সারী গ্রাউন্ড হিসেবে সংরক্ষণ করা এবং সকল জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ আইনটি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলে বানিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি প্রাণী তাদের জীবনচক্রের Estuary অঞ্চলে আসা/ কাটানো দশায় আহরণ থেকে মুক্তি পাবে এবং পরবর্তীতে প্রজননে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭. উপসংহার

সামুদ্রিক জলসীমার আয়তন দেশের মূল ভূ-খন্ডের আয়তনের কাছাকাছি হলেও দেশের সর্বমোট মৎস্য উৎপাদনের মাত্র ১৫-১৫ ভাগ সামুদ্রিক মৎস্যের অবদান। এক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষে ল্যান্ডবেইজড জরিপসহ অন্যান্য সকল জরিপের মাধ্যমে আমাদের সমুদ্র সম্পদের সঠিক অবস্থা নির্ণয় সময়ের দাবি।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৪	সময় ঃ ১৫:১৫- ১৬:১৫	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ জীবতাত্ত্বিক গবেষণাঃ শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস ও শনাক্তকরণ এর প্রয়োজনীয়তা, শনাক্তকরণে করণীয় ও পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রাপ্ত মৎস্য প্রজাতি শনাক্ত করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- শেণিবিন্যাস (Taxonomy) ও শনাক্তকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মৎস্য শেণিবিন্যাসের (Fisheries Taxonomy) প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্য শনাক্তকরণে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মৎস্য শনাক্তরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মৎস্য শনাক্তকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• শেণিবিন্যাস (Taxonom) ও শনাক্তকরণ • মৎস্য শেণিবিন্যাসের (Fisheries Taxonomy) প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্য শনাক্তকরণে করণীয় • মৎস্য শনাক্তরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মৎস্য শনাক্তকরণ পদ্ধতি	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: শনাক্তকরণ সহায়ক বই, সামুদ্রিক মাছের নমুনা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ডিসেকশন বক্স (স্কালপেল, ফরসেপ, কাচি), স্লাইড ক্যালিপার্স, পরিমাপক ফিতা, পেট্রিডিস, জিপার প্লাস্টিক ব্যাগ, ট্রে, ক্যালকুলেটর, পিন/সুঁই, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

জীবতাত্ত্বিক গবেষণাঃ শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস

১. শ্রেণিবিন্যাস (Taxonomy) ও শনাক্তকরণ

বিচিত্র ধরনের জীবকে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল-অমিলে ভিত্তিতে এক জাতীয় জীবকে একসাথে রেখে বিশ্বের বিভিন্ন জীবকে পর্যায়ক্রমে জগৎ (Kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species) প্রভৃতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে শ্রেণীবিন্যাস বা ট্যাক্সোনমি বলে। শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিটি ধাপে তার আগের ধাপের বৈশিষ্ট্যের সাথে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ হয়।যত নিচের ধাপ,তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা তত বেশি এবং অন্তর্ভুক্ত জীবের সংখ্যা তত কম। প্রজাতি (Species) হচ্ছে শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক একক। শনাক্তকরণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের প্রতিটি জীবকে আলাদা নামে সহজে ও অল্প সময়ে সঠিকভাবে জানা। সারা বিশ্বে জীবের শনাক্তকরণে প্রজাতির দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৩৪৭২৫ প্রজাতির মাছ শনাক্ত করা হয়েছে (Catalog of fishes, 2018) যার প্রায় অর্ধেক এর বেশি হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ শনাক্ত করা হয়েছে।

২. মৎস্য শ্রেণিবিন্যাসের (Fisheries Taxonomy) প্রয়োজনীয়তা

- মৎস্য শনাক্তকরণের ও সংরক্ষণের মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণিবিন্যাস বা ট্যাক্সোনমি।
- গবেষণা ভেসেল ও অবতরণকেন্দ্র হতে সামুদ্রিক মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণশীল মাত্রা (MSY) নিরূপণে প্রজাতিভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা অপরিহার্য। প্রজাতিভিত্তিক সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মৎস্য শ্রেণিবিন্যাস (Fish Taxonomy) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।
- টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রজাতির সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ, বণ্টন ও প্রধান প্রজাতি (Keystone species) নির্ণয়ের শ্রেণিবিন্যাস বা ট্যাক্সোনমির মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।
- সমুদ্রে জীববিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা (Biological Research) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিবিন্যাস ও শনাক্তকরণ অত্যাবশ্যক।
- মেরিকালচারে উপযুক্ত মাছ নির্বাচনে শ্রেণিবিন্যাস ও শনাক্তকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- মৎস্য পরিসংখ্যান (Fisheries Statistics) সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শ্রেণিবিন্যাস ও শনাক্তকরণ জ্ঞান থাকা জরুরী।

৩. মৎস্য শনাক্তকরণে করণীয়

৩.১. নমুনা বা স্পেসিমেন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র্য শনাক্তকরণ ও বর্ণনার প্রধান ধাপ হচ্ছে নমুনা সংগ্রহকরণ। মাছের নমুনা সংগ্রহ করার পর মাছের শরীরে লেগে থাকা কাঁদা বা বালি পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মাছকে বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না কারণ মাছের রং ও অবয়ব নষ্ট হতে পারে। নমুনা সংগ্রহ করার পর সাথে সাথে চিত্রগ্রহণ (Photography) শ্রেয়।

৩.১.১. রেফ্রিজারেটরে সাময়িক সংরক্ষণ

প্রাথমিকভাবে নমুনা বা স্পেসিমেন সংগ্রহ করে স্পেসিমেন নাম্বার, প্রজাতি বা গ্রুপ, তারিখ, প্রাপ্তিস্থান ও সংগ্রহকারীর নাম সম্বলিত ওয়াটারপ্রুফ ট্যাগ লাগিয়ে জীপার প্লাস্টিক বা পলি ব্যাগে রেখে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.১.২. ফরমালিন ও ইথানল দ্রবণে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ

পরবর্তীতে ১০% ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ করতে হবে (১ অংশ পূর্ণ শক্তির ফরমালিন ও ৯ অংশ বিশুদ্ধ পানি)। সংরক্ষণের পূর্বে মাছের শরীর সোজা ও মুখ বন্ধ রাখতে হবে। বড় মাছ বিশেষকরে তৃণভোজী (Herbivorous) মাছ সংরক্ষণের পূর্বে মাছের পেট ও মাংশে ফরমালিন সিরিঞ্জ দিয়ে ইনজেক্ট করতে হবে কারণ মাছের নাড়িভুড়িতে (Guts) তাড়াতাড়ি পঁচন ধরে। ফরমালিন বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর বিধায় গ্লাভস ও মুখোশ পরিধান করতে হবে। এছাড়া দীর্ঘদিন সংরক্ষনের জন্য স্পেসিমেন ফরমালিনের দ্রবণ হতে ৭০% ইথানলের দ্রবণে (৭০% ইথানল ও ৩০% পানি) স্থানান্তর করা যায়। ফরমালিনের দ্রবণ হতে ৭০% ইথানলের দ্রবণে স্থানান্তরের পূর্বে প্রথমে এক বা দুইদিন ফ্রেশ ওয়াটারে ভিজিয়ে (Soak) রাখতে হবে এরপর পর্যায়ক্রমে ১০% ইথানলের দ্রবণে দুই দিন ও ৫০% ইথানলের দ্রবণে দুই দিন ওয়াশ করতে হবে। ইথানল উদ্বায়ী বিধায় তা যাতে না উড়ে যায় সেজন্য ভাল ঢাকনাসহ প্লাস্টিক বা কাঁচের জার ব্যবহার করতে হবে। অতপর নমুনা সংরক্ষিত জারে স্পেসিমেন নাম্বার, তারিখ, প্রাপ্তিস্থান ও সংগ্রহকারীর নাম সম্বলিত ওয়াটারপ্রুফ লেভেলিং বা ট্যাগ লাগিয় দিতে হবে।

৩.২. চিত্রগ্রহণ (Photography)

প্রিজারভেটিভ এ সংরক্ষিত মাছ ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে থাকে। ফলে ফ্রেশ অবস্থায় মাছের চিত্রগ্রহণ (Photography) করলে মাছের প্রকৃত রং ও অবয়ব ফুটে তোলা সম্ভব হয়। শুকনো কাপড় বা পেপার টিস্যু দিয়ে মাছকে মুছে নিতে হবে। মাছকে মোমের ট্রে, স্টাইরোফোম ও কার্ডবোড ইত্যাদির ওপর রেখে পাখনাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে সুঁই বা পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। তারপর ছোট পেইন্ট ব্রাশ দ্বারা সামান্য পরিমানে ফরমালিন পাখনাগুলোতে ব্যবহার করে কয়েক মিনিট পর সুঁই বা পিন উঠিয়ে ফেলতে হবে।মাছের মুখ বামদিকে রেখে মাছকে কালারড ব্যাকগ্রাউন্ডের ম্যাট বা পেপারের ওপর স্থাপন করে তার সাথে পরিমাপক রুলার ও হাতে লিখিত ট্যাগ (স্পেসিমেন নাম্বার, প্রজাতি বা গ্রুপ, তারিখ, প্রাপ্তিস্থান এবং সংগ্রহকারীর নামসহ) সহকারে চিত্রগ্রহণ করতে হবে। ক্যামেরা মাছের ওপর খাড়াভাবে (Perpendicular to the fish) ধরে চিত্রগ্রহণ করতে হবে। ফ্ল্যাটফিশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠদেশের (Dorsal) পাশাপাশি বক্ষদেশের (Ventral) ছবি তুলতে হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য (Diagnostic features) যেমন- চিংড়ির ক্ষেত্রে রোস্টাম (Rostrum), ক্যাটফিশের প্যালাটাল দাঁতের (Palatal tooth) প্যাটার্ণ ও এঃৎরমষরফধব গোত্রের মাছে পার্শ্ব পাখনার (Pectoral fin) ভিতরের দিকে বেশকিছু নিবিড় (Close snap) ফটো তুলতে হবে।

৩.৩. জেনেটিক বিশ্লেষণের জন্য টিস্যু সংগ্রহকরণ

প্রজাতির বন্টন (Distribution), সঠিক মজুদ সীমানা (Stock boundaries) শনাক্তকরণ ও প্রজাতি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস (History of life stage) শনাক্তকরণে ক্লাসিক্যাল মরফোলজির (Classical morphology) স্টাডির পাশাপাশি DNA ভিত্তিক মলিকুলার বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেশ বা হিমায়িত (Frozen) অথবা ইথানলে সংরক্ষিত স্পেসিমেন জেনেটিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। ফরমালিন স্পেসিমেনের নিউক্লিক অ্যাসিড নষ্ট করে বিধায় ফরমালিনে সংরক্ষিত স্পেসিমেন জেনেটিক বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যায় না। মাছের বাম পার্শ্ব নষ্ট না করে ডানদিকের অংশ থেকে ৫ বর্গ মি.মি. আকৃতির ফ্লেশ বা ফিন কেটে ৯৫% ইথানল দ্রবণে ভায়ালে সংরক্ষণ করতে হবে। নমুনা সংরক্ষিত প্রতিটি ভায়ালে স্পেসিমেন নাম্বার, তারিখ, প্রাপ্তিস্থান ও সংগ্রহকারীর নাম সম্বলিত লেভেলিং করতে হবে। নমুনাসমূহ কক্ষ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. মৎস্য শনাক্তরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ

মৎস্য প্রজাতি পর্যন্ত শনাক্তকরণের জন্য প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ফিশারিজ ট্যাক্সোনমি বিশেষকরে বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকতে হবে। শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন ট্যাক্সোনমিক বই ও ম্যানুয়াল সাথে রাখতে হবে। ট্যাক্সেনমিক সহায়ক গাইড হিসেবে নিম্নোক্ত বইসমূহ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ শনাক্তকরণে ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

- FAO species Identification Guide for fisheries purposes: The living marine resources of Western Central Pacific Vol 1-6
- Field Identification Guide to the Living Marine Fisheries Resources of Myanmar
- Field Identification Guide to the Living Marine Fisheries Resources of Pakistan
- Species Album of Marine and Coastal Fisheries Resources of Bangladesh, DoF publication
- Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh: Marine Fishes, Volume 24

ট্যাক্সেনমিক কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য নিম্নোক্ত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয়-

- ম্যাগনিফাইং গ্লাস
- ডিসেকশন বক্স (স্কালপেল, ফরসেপ, কাচি)
- স্লাইড ক্যালিপার্স
- পরিমাপক ফিতা
- পেট্রিডিস
- জিপার প্লাস্টিক ব্যাগ
- ট্রে
- ক্যালকুলেটর
- পিন/সুঁই

৫. মৎস্য শনাক্তকরণ পদ্ধতিঃ

নমুনা শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসমুহের ওপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে বর্গ থেকে প্রজাতি পর্যন্ত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য যাচাই করা হয়।

- মাছের ক্ষেত্রে বাহ্যিক গঠন, দেহের রং, দাতের প্রকৃতি, মুখের অবস্থান, পাখনা সমুহের সংখ্যা এবং অবস্থান, আইশের ধরণ, ফুলকার ধরণ, ইত্যাদি;

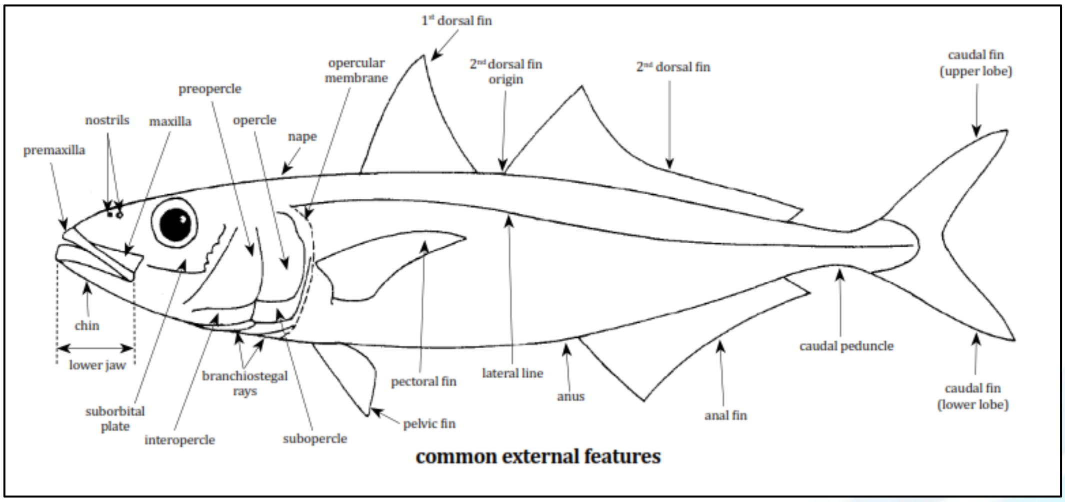

চিত্র ০১ঃ অস্থিময় (Bony Fish) মাছের বাহ্যিক গঠন (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড)

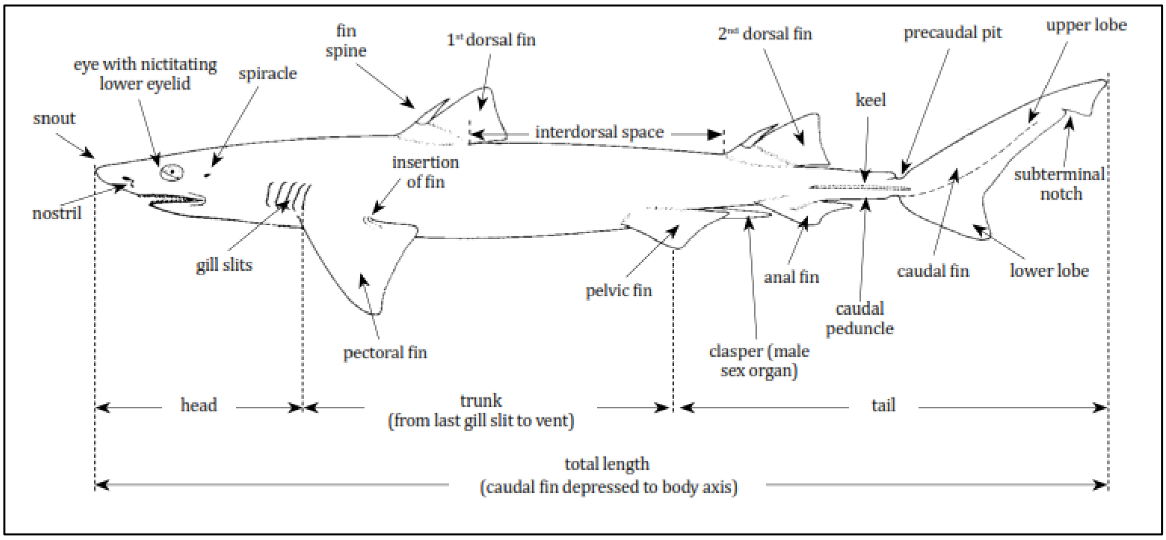

চিত্র ০২ ঃ তরুণাস্থিময় (Cartilaginou Fish) মাছ হাঙ্গরের বাহ্যিক গঠন (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড)

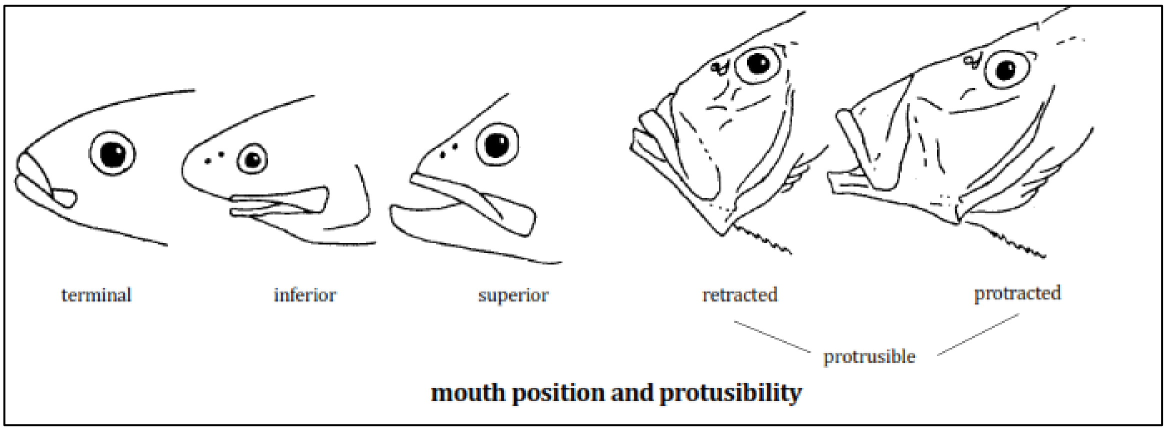

চিত্র ০৩ঃ অস্থিময় মাছের (Bony Fish) মুখের গঠন ও অবস্থান (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড)

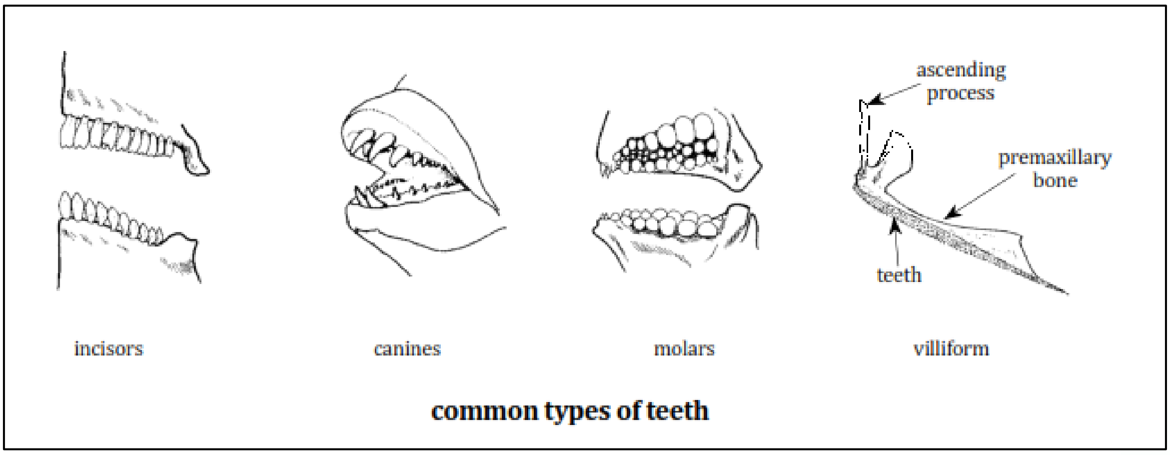

চিত্র ০৪ঃ অস্থিময় (Bony Fish) মাছের দাঁতের প্রকারভেদ (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড)

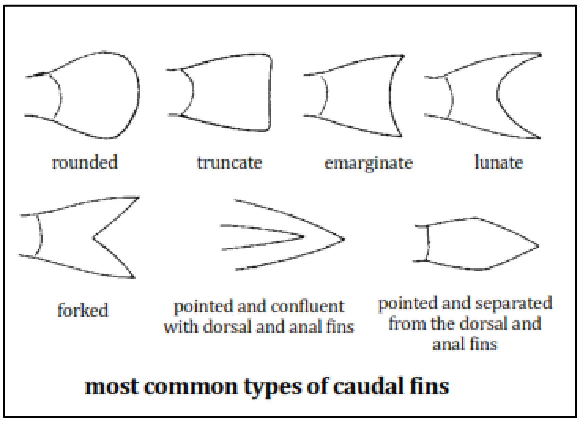

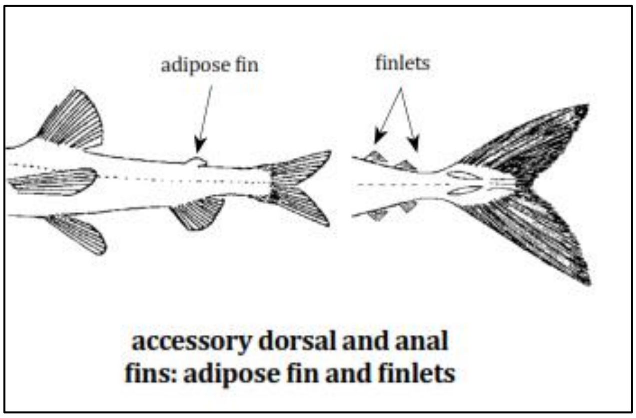

চিত্র ০৫ ঃ অস্থিময় মাছের (Bony Fish) পুচ্ছ পাখনা, ফিনলেট ও এডিপোজ ফিনের ধরণ (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড

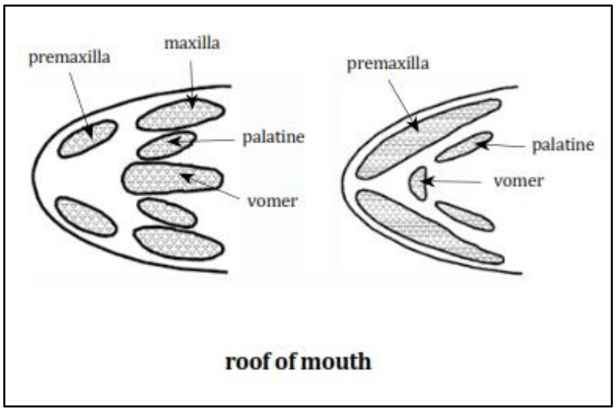

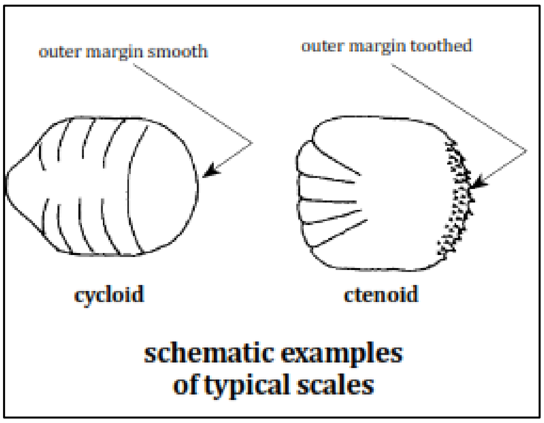

চিত্র ০৬ঃ অস্থিময় মাছের (Bony Fish) আঁইশ এর ধরণ এবং মুখের ভিতরে দাঁতের ধরণ (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড

- চিংড়ির ক্ষেত্রে দেহের রং ও রোস্ট্রামের গঠন ইত্যাদি;

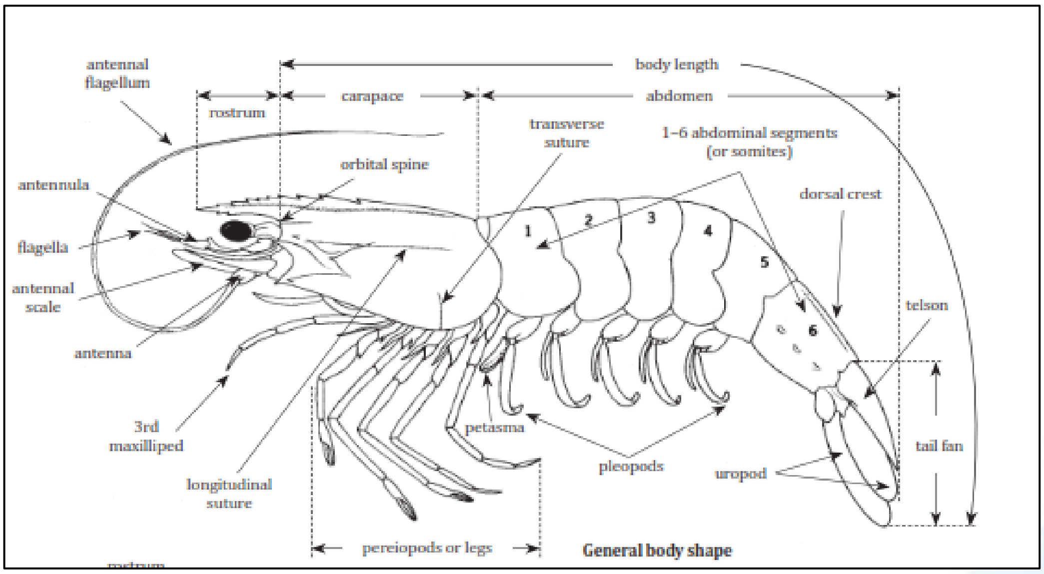

চিত্র ০৭ঃ চিংড়ির দেহের বাহ্যিক গঠন (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড)

➢ কাঁকড়ার ক্ষেত্রে শির:বক্ষের (Carapace) গঠন, রং এবং স্পট, পার্শ্বীয় কাটা (Lateral teeth/spine)

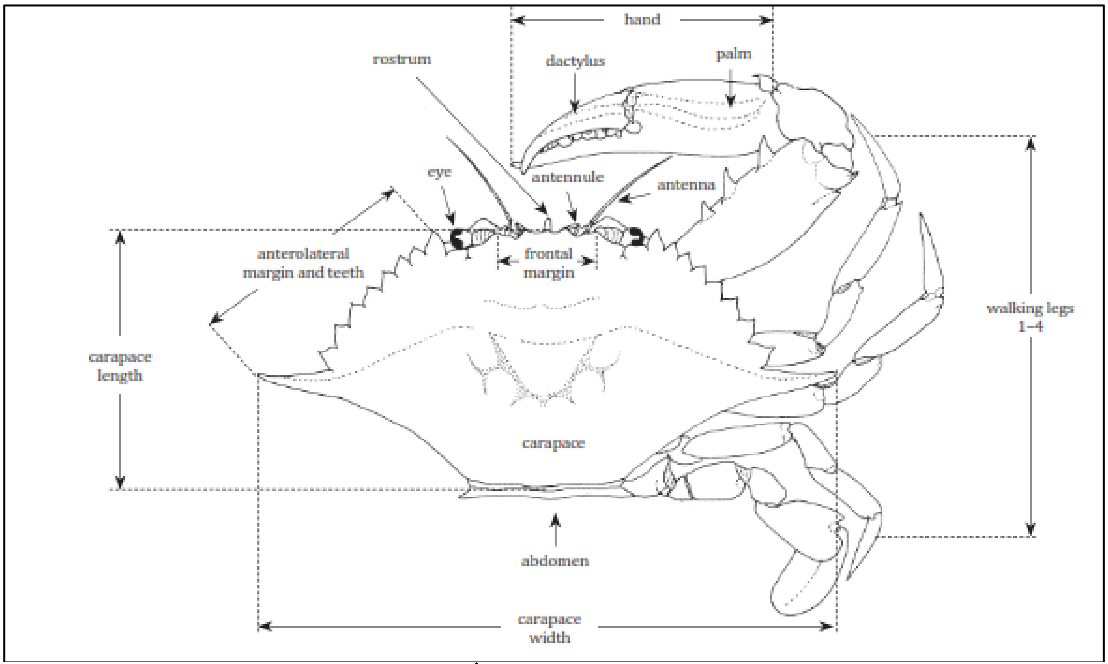

চিত্র ০৮ ঃ কাঁকড়ার বাহ্যিক গঠন (উৎসঃ এফএও প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড)

পঞ্চম দিন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৫	সময় ঃ ০৯:৩৫- ১০:৩৫	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের মাছের গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণের গুরুত্ব এবং পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে যাতে করে তাঁরা মাছের প্রজনন মৌসুম নির্ধারণে গোনাডাল হিস্টোলজির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- মাছের গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বলতে পারবেন
- গোনাডাল হিস্টোলজির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ • গোনাডাল হিস্টোলজির বিভিন্ন পদ্ধতি	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: চিত্র, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি			

জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ

হিস্টোলজি মাছের প্রজনন স্বাস্থ্য গবেষণায় শক্তিশালী টোল হিসেবে কাজ করে। এটি নিয়মিত যৌন যাচাইকরণ, বিকাশের পর্যায় শনাক্তকরণ, আন্তঃরেখা, টিউমার, পরজীবী এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতা লিপিবদ্ধকরণ এবং অ্যাট্রেসিয়া (Atresia) নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি আরও সূক্ষ্ম পরিবর্তনের জন্য যেমন বিভিন্ন পর্যায়ে ভিটেলিন (Vitelline) এনভেলপের ঘন্ন, কুসুম চেহারা, শুক্রাণুর নেক্রোসিস (Necrosis) এবং সের্তোলি (Sertoli) কোষের বিস্তার জানতে ব্যবহার করা যেতে পারে। গোনাডাল হিস্টোলজি প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর বিভিন্ন পরিবেশগত স্ট্রেসের প্রভাবগুলো নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। বহুবছর ধরেই ওয়াইল্ড মাছের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য হিস্টোলজির ব্যবহার হয়ে আসছে। গোনাডাল হিস্টোলজি জানার মাধ্যমে খুব সহজেই মাছের প্রজনন মৌসম সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। কোন প্রজাতির মাছ বছরের কোন সময়ে, কতবার ডিম ছাড়ে তা জানার মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ ও মৎস্যসম্পদের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়।

গোনাড কি?

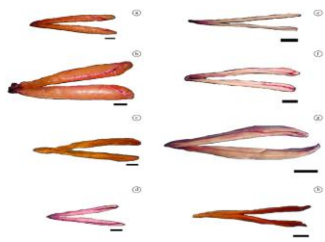

গোনাড একটি মিশ্র গ্রন্থি যা একই সাথে যৌন কোষ ও যৌন হরমোন তৈরি করে। স্ত্রী মাছের যৌন কোষ হল ডিম আর পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে শুক্রানু। স্ত্রী মাছের গোনাড কে ওভারি ও পুরুষ মাছের গোনাড কে টেস্টিস নাম অবহিত করা হয়।

কলাস্থান (Histology)

কলাস্থানবিদ্যা (Histology) বিশুদ্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা, এ শাখায় বহুকোষী জীবেদের (অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ) বিভিন্ন কলার অবস্থান, গঠন, আকার, আয়তন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কোষবিজ্ঞান বা সাইটোলজি (Cytology), ও কলাবিজ্ঞানের (হিস্টোলজি) প্রধান পার্থক্য হল কোষ বিজ্ঞানে মূলতঃ আলাদা আলাদা ভাবে ভাসমান কোষেদের বর্ণনা করা হয়। কলার মধ্যে অবস্থান কালে কোষের যে ত্রিমাত্রিক আকৃতি থাকে, বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাসমান কোষে তা থাকে না। ফলে কোষের আকৃতি কেবল কলা বিজ্ঞানে কাজে লাগে কোষবিজ্ঞানে কোন কাজে আসে না। কোষবিজ্ঞান প্রধানত কেন্দ্রকের (নিউক্লিয়াস) চেহারা ও সাইটোপ্লাজমের আয়তন ও রং এর পার্থক্য দ্বারা চালিত হয়। কলাবিজ্ঞানে শুধু কোষেদের আকৃতিই নয়, কোষদের অবস্থান, পারস্পরিক নৈকট্য ও আন্তঃকোষীয় সংযোগ, ও ধাত্র ইত্যাদির সাহায্যে কলার পরিচয়, কলার মধ্যে কোন অসঙ্গতি আছে কিনা, পরিচয়হীন কলার উ্তপত্তিগত সূত্র, অসমবৃদ্ধি, অবৃদ্ধি, অতিবৃদ্ধি ইত্যাদি সন্ধান করা হয়।

গোনাড কালেকশন

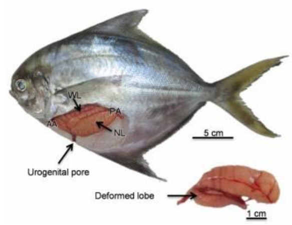

মাছের এনাস থেকে মাথার দিকে কাঁচি দ্বারা কেটে নাড়িভুড়ি সরিয়ে ফেলে খুব সাবধানে নিডল আর ফরসেপের অন্যান্য অঙ্গ থেকে আলাদা করে নিতে হবে। তারপর পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করে ব্লটিং পেপার এর সাহায্যে মুছে নিতে হয়। ওভারি কে ১০% বাফার্ড ফরমালিনে সংরক্ষণের পূর্বে ওজন নিয়ে তা লিপিবদ্ধ করতে হয়।

গোনাডোসোমাটিক ইনডেক্স (জিএসআই) নির্ধারণ

মাছের যৌন (ওভারি ও টেস্টিস ডেভেলপমেন্ট) পরিপক্কতার নির্ণয়ের একটি নির্দেশক হল জিএসআই। জিএসআই হল গোনাডের ভর আর দেহের ভরের অনুপাত।

GSI = [gonad weight / total tissue weight] × 100

হিস্টোলজির ধাপসমূহঃ

ফিক্সেশন

টিস্যু এবং কোষের কাঠামো সংরক্ষণ এবং ঠিক রাখতে রাসায়নিক ফিক্সেটিভ গুলো ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোস্কোপের নীচে পর্যবেক্ষণের জন্য টিস্যুগুলোকে পাতলা করে কাটার জন্য টিস্যুগুলোকে শক্ত করে তোলতে ফিক্সেশন প্রক্রিয়া যা প্রয়োজনীয় সহায়তা করে। ফিক্সেটিভগুলো সাধারণত অপরিবর্তনীয়ভাবে ক্রস লিঙ্কিং প্রোটিনের মাধ্যমে টিস্যুগুলোকে (এবং কোষগুলো) সংরক্ষণ করে। লাইট মাইক্রোস্কোপের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত ফিক্সেটেটিভ হল ১০% নিরপেক্ষ বাফারড ফরমালিন, বা এনবিএফ (ফসফেট বাফার স্যালাইনে ৪% ফর্মালডিহাইড)।

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত ফিক্সেটেটিভ হল গ্লুটারেলডিহাইড, সাধারণত ফসফেট বাফার স্যালাইনের একটি ২.৫% দ্রবণ হিসাবে। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সংশোধনীগুলো হল অ্যাসিমিয়াম টেট্রক্সাইড বা ইউরাইল এসিটেট।

এই অ্যালডিহাইড ফিক্সিটিভ গুলোর প্রধান কাজ হল মিথিলিন ব্রিজ গঠনের মাধ্যমে প্রোটিনগুলোর সাথে অ্যামিনো গ্রুপ গুলোর ক্রস লিঙ্ক করা (-CH2-), ফর্মালডিহাইডের বা গ্লুটারেলডিহাইড এর ক্ষেত্রে (-C5H10-) ক্রস-লিঙ্ক এর মাধ্যমে ব্রিজ গঠন করে।

সিলেকশন ও ট্রিমিং

নির্বাচন হল এমন একটি যেখানে প্রয়োজনীয় টিস্যুগুলো পছন্দ করে অপ্রোজনীয় অংশ পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা। । পরবর্তী সময়ে এটি পরীক্ষা করার প্রায়োজন হলে ফিক্সিং অবস্থায় পাওয়া যায়।

ট্রিমিং হল টিস্যু নমুনা গুলো এমন ভাবে কাটা যাতে পরবর্তী সেকশনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠ দৃশ্যমান হয়।

এমবেডিং

এম্বেডিং হল টিস্যুগুলোকে শক্ত রূপ প্রদান করা যাতে পাতলা টিস্যু গুলোকে স্লাইস করে কাটা যায়। সাধারণভাবে, প্রথমে টিস্যুগুলো থেকে অন্য কোন মিডিয়ামের সাহায্যে ডিহাইড্রেট করে নেওয়া। এম্বেডিং করার ক্ষেত্রে প্যারাফিন ওয়াক্স ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।প্যারাফিন ওয়াক্স যেহেতো পানির সাথে মিশে যায় তাই প্রথমে টিস্যু থেকে তার জলীয় অংশ ডিহাইড্রেশন প্রসেস এর মাধ্যমে শুষে নিতে হয়। ডিহাইড্রেশন প্রসেস শেষ করার পর গলিত প্যারাফিন ওয়াক্স এর সাহায্যে টিস্যু গুলো কে ছোটছোট মোমের ব-কে রূপ দিয়ে নিতে হয়।

সেকশনিং

মোমের ব্লক গুলো থেকে মাইক্রোটোম এর সাহায্যে কাঙ্খিত পুরুত্বে (৫-১৫ মাইক্রোমিটার) কেটে নিতে হয়। প্রাপ্ত টিস্যু গুলো গরম পানিতে কিছুক্ষন রেখে স্লাইডে নিয়ে স্টেইনিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

স্টেইনিং

সেলের ভিতরের অর্গানেল গুলো সাধারণত মাইক্রোস্কোপের নিচে ভালভাবে দৃশ্যমান হয় না বিধায় স্টেইনিংয়ের প্রয়োজন হয়। হেমাটোক্সিলিন ও ইয়োসিন ব্যবহার করে স্টেইনিং করা হয়। হেমাটোক্সিলিন কোষের নিউক্লিই কে নীল আর ইয়োসিন কোষের সাইটোপ্লাজম কে গোলাপি রং প্রদান করে যা মাইক্রোস্কোপের নিচে সহজে দৃশ্যমান হয়।

Fish Sample Collection

↓

Collection and Recording of fish Gonad and Length-Weight data

↓

Preservation of fish Gonad (10% of Formalin Solution)

↓

A small block of Gonad Tissue is taken to a cassette for histological procedure

↓

Histological Procedure 1st Step **Dehydration**

Sample Cassette should be kept in the solution

1. 80% Ethanol Solution
2. 95% Ethanol Solution
3. 95% Ethanol Solution
4. 99% Ethanol Solution
5. 99% Ethanol Solution
6. 99% Ethanol Solution
7. Benzene-1 Solution (1 hour)
8. Benzene-2 Solution (1 hour)

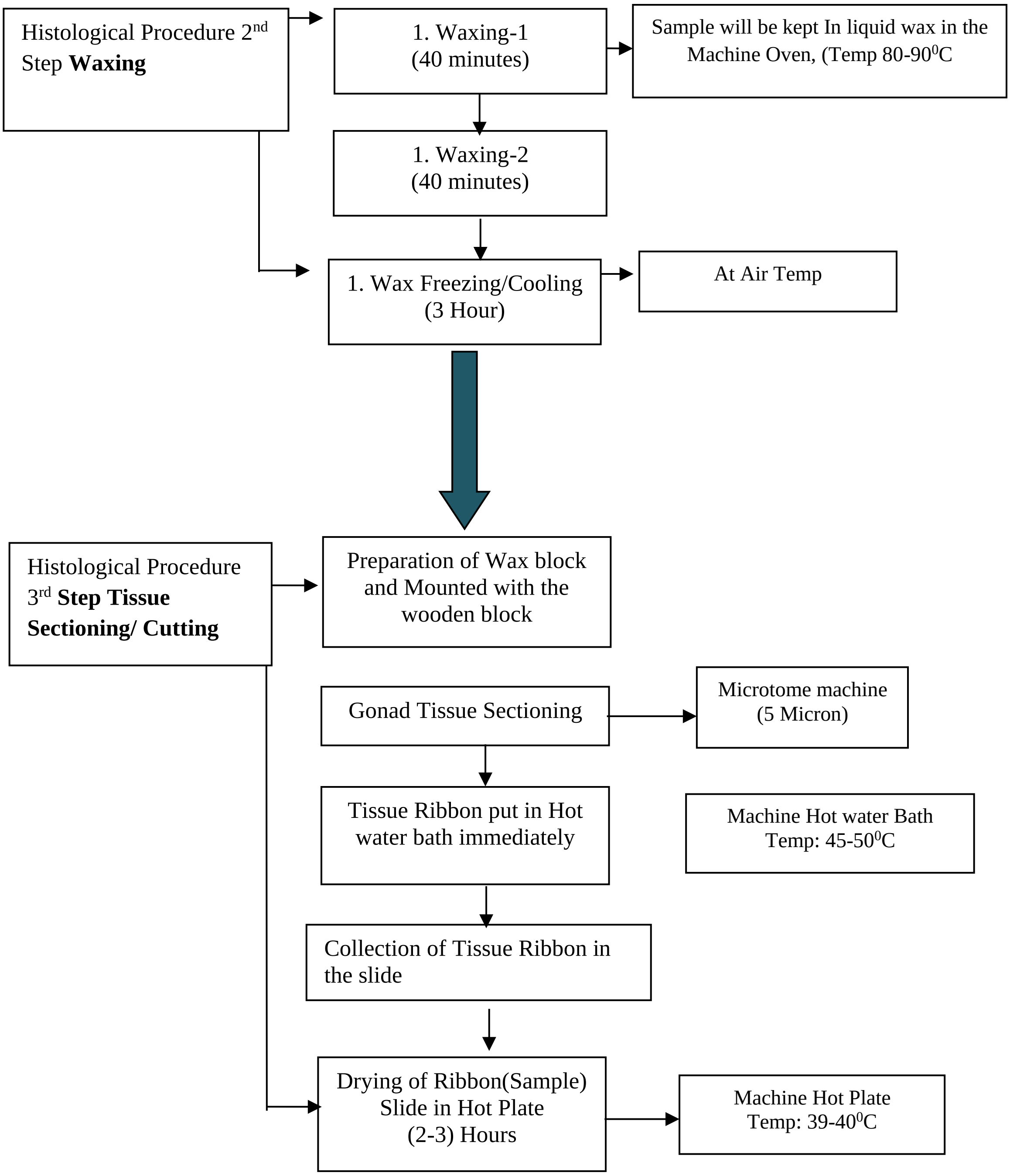
Histological Procedure 2nd Step Waxing
1. Waxing-1 (40 minutes)
Sample will be kept In liquid wax in the Machine Oven, (Temp 80-90^{0}C
1. Waxing-2 (40 minutes)
1. Wax Freezing/Cooling (3 Hour)
At Air Temp
Histological Procedure 3rd Step Tissue Sectioning/ Cutting
Preparation of Wax block and Mounted with the wooden block
Gonad Tissue Sectioning
Microtome machine (5 Micron)
Tissue Ribbon put in Hot water bath immediately
Machine Hot water Bath Temp: 45-50^{0}C
Collection of Tissue Ribbon in the slide
Drying of Ribbon(Sample) Slide in Hot Plate (2-3) Hours
Machine Hot Plate Temp: 39-40^{0}C

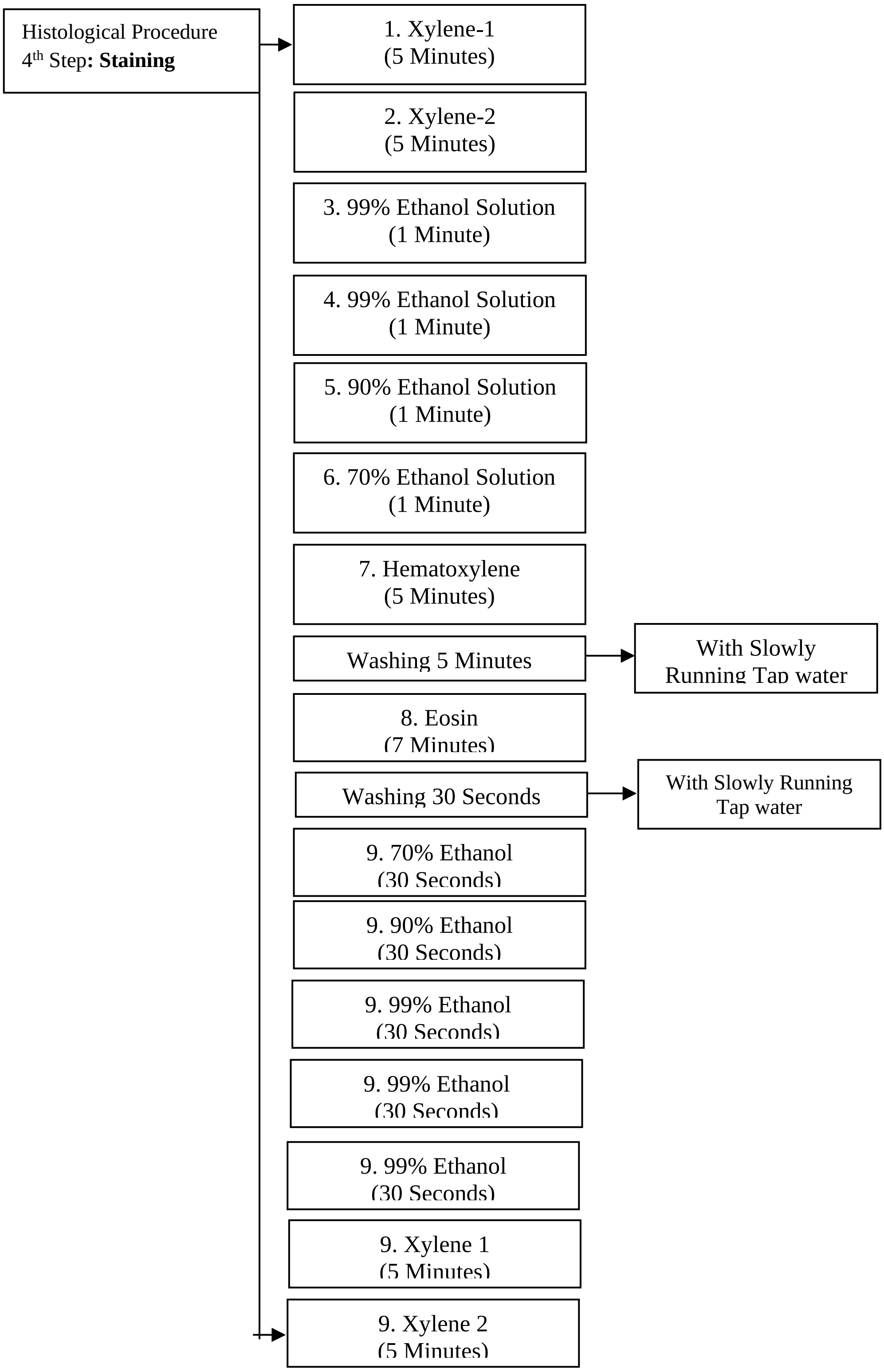
Histological Procedure
4th Step: Staining
1. Xylene-1
(5 Minutes)
2. Xylene-2
(5 Minutes)
3. 99% Ethanol Solution
(1 Minute)
4. 99% Ethanol Solution
(1 Minute)
5. 90% Ethanol Solution
(1 Minute)
6. 70% Ethanol Solution
(1 Minute)
7. Hematoxylene
(5 Minutes)
Washing 5 Minutes
With Slowly
Running Tap water
8. Eosin
(7 Minutes)
Washing 30 Seconds
With Slowly Running
Tap water
9. 70% Ethanol
(30 Seconds)
9. 90% Ethanol
(30 Seconds)
9. 99% Ethanol
(30 Seconds)
9. 99% Ethanol
(30 Seconds)
9. 99% Ethanol
(30 Seconds)
9. Xylene 1
(5 Minutes)
9. Xylene 2
(5 Minutes)

মাউন্টিং

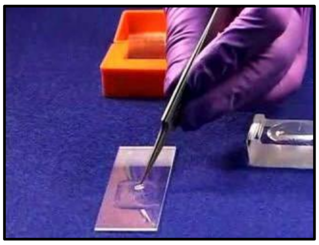

পেরাফিন ওয়াক্স এর মাধ্যমে এম্বেডিং করার পর বালসাম কানাডা ব্যবহার করে মাউনটিং করা হয়। মাউন্টিং করে কভার স্লিপ লাগিয়ে মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করার জন্য উপযোগি করা হয়।

অবজারভেশন

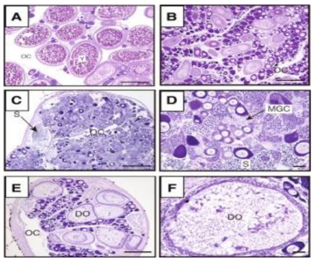

মাউন্টিং করে পার্মানেন্ট স্লাইড তৈরি করার পর স্লাইডগুলো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ওসাইটের পরিপক্কতার অবস্থা দেখা হয়। ডিমের আকারের ওপর নির্ভর করে মাইক্রোস্কোপের লেন্সের কনফিগারেশন ঠিক করে নিতে হয়।

ওসাইট ডেভেলপমেন্ট

ওসাইটের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ৫ টি ক্রমিক ধাপ পরিলক্ষিত হয়। ধাপগুলো-

ধাপ-১ প্রি-ভাইটেলোজেনেসিস / প্রাথমিক ওসাইট

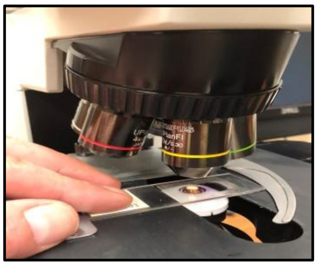

ওসাইট গুলো খুব ছোট আকারে ৭ থেকে ১০ মাইক্রন এবং কুসুম এর উপস্থিতি দেখা যায় না।প্রাইমারি ওসাইটের সংখ্যা মাইটোটিক বিভাজনের জন্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই ধাপের শেষে ওসাইটের আকার বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ মাইক্রন পর্যন্ত হয়। এই পর্যায়ে,ওসাইটের নিউক্লিয়াসে অনেকগুলো নিউক্লিওলি দৃশ্যমান হয়।ফলিকলের () চারপাশের পর্দা ততটা পুরু হয় না।

ধাপ-২: এন্ডোজেনাস ভাইটেলোজেনেসিস

এই পর্যায়ে ওসাইটে কুসুমের তৈরি হয় এবং ওসাইট নিজেই তার কুসুমের উৎস হিসেবে কাজ করে।

ধাপ-৩: এক্সজেনাস ভাইটেলোজেনেসিস

ওসাইটের আকার সর্বোচ্চ ১০০০ থেকে ১২০০ মাইক্রন (১ থেকে ১.২ এমএম) পর্যন্ত হয়। এই পর্যায়ে কেন্দ্রের কিছুটা বাইরের দিকে বড় আকারের নিউক্লিয়াস (০.২ এমএম) খুব স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান হয়।তখন ওসাইট গুলোকে "রাইপ এগ" নামেও ডাকা হয়।

ধাপ-৪: ওভোলেটেড এগ

এই পর্যায়ে ওভারিয়ান টিস্যু থেকে ওসাইটগুলো অবমুক্ত হয়। ওভোলেশন প্রক্রিয়ার সময় কুসুম একটি ড্রপলেটের মধ্যে জমা হয়, পর্যায়ক্রমে ডিমগুলো স্বচ্ছ হতে থাকে এবং নিউক্লিয়াস সম্পর্ণরূপে ডিমের আউটের সাইডে (এনিমেল পোল) চলে যায়।

ধাপ-৫: এট্রেটিক এগ

যে ডিম গুলো ভালোভাবে ওভোলেট হয় না সেগুলো মাছের দেহে পুনঃশোষিত হয়।

ধাপ-১ থেকে ধাপ-৩ এ রূপান্তর পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশের তাপমাত্রা যখন ২০ থেকে ২২ এর মধ্যে থাকে তখন এই পরিবর্তন গুলো সংঘঠিত হয়ে থাকে। এই ধাপ গুলো অতিক্রম করতে ৬ সপ্তাহের মতো সময় লাগে

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৫	সময় ঃ ১০:৫০- ১১:৫০	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: বয়স নিরূপণ**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের মাছের বয়স নিরূপণের গুরুত্ব এবং বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে যাতে করে তাঁরা নমুনাকৃত মাছের প্রকৃত বয়স নির্ণয় করতে পারে এবং পপুলেশন ডিনামিক্সে এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক ধারণা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- মাছের বয়স নিরূপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারবেন ।
- বয়স নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• মাছের বয়স নিরূপণের গুরুত্ব • বয়স নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, ভিপ কার্ড ইত্যাদি।			

মাছের বয়স নিরূপণ

ভূমিকা

মাছের সঠিক বয়স নির্ণয় পপুলেশন ডিনামিক্সের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এটি পপুলেশন ডিনামিক্স যেমন বৃদ্ধি হার, মৃত্যুর হার এবং অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ভিত্তি গঠন করে। গাছের ক্ষেত্রে যেমন কান্ডের বলয় গণনা করে বয়স নির্ণয় করা হয় মাছের ক্ষেত্রেও অনেকটা একই রকমভাবে আঁইশ বা অটোলিথের বলয় গণনা করতে হয়। মাছের অনেক প্রজাতির কঙ্কালের সংঘটিত পরিবর্তন থেকে তাদের বয়স নির্ণয় করা হয়। এই পরিবর্তন সমূহ হতে পারে তাদের পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য (যেমন তাপমাত্রা) বা তাদের দেহতাত্ত্বিক/ফিজিওলজিক্যাল (Spawning) পরিবর্তনের জন্য। যাইহোক, অনেক মাছ এমন ইউনিফর্ম পরিবেশে বাস করে যেখানে তাদের কঙ্কালে কোন ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না সেক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তাদের বয়স নির্ণয় করতে হয়, যা প্রায়শই অসম্ভব।

কঙ্কাল ভিত্তিক বয়স নিরূপণ

মাছের কংকাল তন্ত্রের (Skeletal structure) প্রায় প্রতিটি অংশই তার বয়স নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারমধ্যে অটোলিথ (Otolith), আঁইশ (Scales), ফিন স্পাইন, দাঁত, চোখের লেন্স, ভার্টিব্রা, চোয়ালের অস্থি বা কানকোর অস্থি যা সহজে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায় বিধায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মাথার পাতলা অস্থি ও পেকটোরাল এবং পেলভিক ফিন গার্ডল ও অনেক সময় বয়স নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়। যদিও অস্থি সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ সহজ কিন্তু তা করা সময়সাপেক্ষ। মাথার অস্থি বা ফিন গার্ডল সংরক্ষণের জন্য প্রথমে সিদ্ধ করে ফ্লেশ ভালভাবে দূর করতে হয় তারপর সলে্ভন্টের মাধ্যমে চর্বি দূর করতে হয়। তা না করলে সংরক্ষণ করার সময় নষ্ট হতে পারে। যে সকল মাছের বড় অটোলিথ নাই যেমন টোনা, রে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভার্টিব্রা ব্যবহার করা হয় যদিও তা সময়সাপেক্ষ। রে ভার্টিব্রাসোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর গরম দ্রবণ দ্বারা পরিষ্কার করে মিথানল সংরক্ষণ করতে হয় আর টোনার ভার্টিব্রারোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। গবেষণা কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখে নেয়া উচিত এগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে। কিছুকিছু ক্ষেত্রে দুটির ফলাফল প্রায় একই রকম হয়ে থাকে।

অটোলিথ

অটোলিথ হল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্য কর্ণের স্যাকিউলি (Saccule) বা আর্টিকলে (Utricle) অবস্থিত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটেড একটি অস্থি, যা তাদের হরিজন্টাল ও ভার্টিকাল (Gravity) ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে। অটোলিথ কে কখনো কখনো স্ট্যাটকোনিয়াম (Statoconium), অটোকোনিয়াম (Otoconium) বা স্টাটোলিথ (Statolith) নামেও ডাকা হয়।

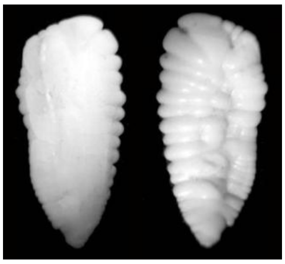

চিত্র: মাছের অটোলিথ

অটোলিথ সংগ্রহ

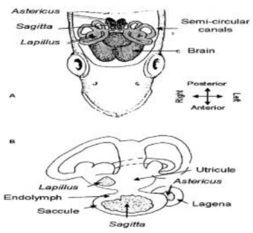

চিত্র: মাছের অটোলিথের অবস্থান

বেশির ভাগ মাছের বয়স নির্ণয়ের জন্য সেগিটাল (Sagittal) অটোলিথ যা মধ্য কর্ণের সেকুলাসে থাকে, ব্যবহার করা হয়। মাছের প্রকারের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

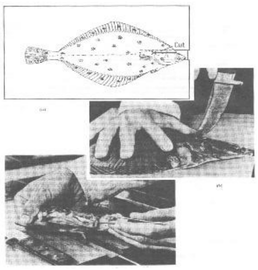

চিত্র: ফ্ল্যাট ফিস মাছের অটোলিথ কালেকশন

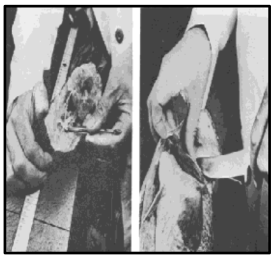

চিত্র: রাউন্ড ফিস মাছের অটোলিথ কালেকশন

বাছাই ও মাউন্টিং

বেশির ভাগ মাছের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল প্রথমেই খুব ভাল ভাবে অটোলিথ ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে কাগজের খামে বা প্লাস্টিকের ব্যাগে সংরক্ষণ করা। যা লেভেলিং করে বক্সে গুছিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য।

প্রস্তুতি ও দেখার পদ্ধতি

যদিও অটোলিথের গঠন ত্রিমাত্রিক (Three Dimension) তারপরও সব পাশে এর বৃদ্ধি একই রকম হয় না। যদি অটোলিথে কোন প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয় তবে তা অবশ্যই বিভিন্ন বলয় (radii) সহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় শেলের সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রতিটি শেলে বা অঞ্চলের জৈব উপাদানের পরিমানের ওপর নির্ভর করে অটোলিথের রং পরিবর্তিত হয় (স্বচ্ছ থেকে গাঢ়) । সাধারণত অটোলিথের দুইটি আলাদা জোনের সমন্বয়ে একটি গাঢ় (Opaque) ও একটি স্বচ্ছ অঞ্চল (Hyaline), গঠিত হয় যার প্রথমটিকে সাধারণত নিউক্লিয়াস বলা হয়।

চিত্র: উপর থেকে আলো ফেলে মাছের অটোলিথ

মাছ থেকে অটোলিথ সংগ্রহের পরপরই বলয়গুলো দৃশ্যমান হতে পারে। যদি তাই হয় তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো কাউন্ট করা উচিত। কিছুকিছু মাছের ক্ষেত্রে বলয় গুলো শুধু এই একবারই দেখা যায়। অটোলিথ পরীক্ষার অনেক গুলো পদ্ধতি বিদ্ধমান আছে। তারমধ্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো অটোলিথ কে স্বচ্ছ তরলে ডুবিয়ে ডার্ক বেকগ্রাউন্ড এ রেখে ওপর থেকে আলো ফেলে পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতি শুধু তুলনামূলক পাতলা (Thin)ও স্বচ্ছ (Translucent) অটোলিথের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে বলয় গুলো ভালভাবে দেখা যেতে পারে।

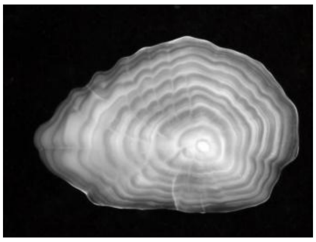

চিত্রঃ আলো প্রক্ষেপনের মাধ্যমে মাছের অটোলিথ পর্যবেক্ষণ

যে সকল মাছের অটোলিথের আউটার রিং খুব সরু সেক্ষেত্রে ক্রস-সেকশন করে বলয় পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সাধারণ গ্রেন্ডিংমেশিন ব্যাবহার করে অটোলিথ এর সেন্টার বরাবর সেকশন করে পরীক্ষা করতে হবে। ক্রস সেকশন করার পর ট্রান্সমিটেড লাইট ব্যাবহার করে বা ওপর থেকে আলো ফেলে খুব ভালোভাবে বলয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও গণনা করতে হবে। প্রস্তুতকৃত সেকশনটি কে প্লাস্টিসিন (Plasticine) দ্বারা আড়াআড়ি ভাবে মাউনটিং করে নিতে হবে। তারপর সাইড থেকে আলো প্রক্ষেপনের (Transmitted light) মাধ্যমে খুব ভালভাবে বলয়গুলো দৃশ্যমান হবে।

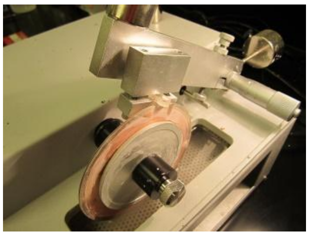

চিত্রঃ গ্রেন্ডিংমেশিন

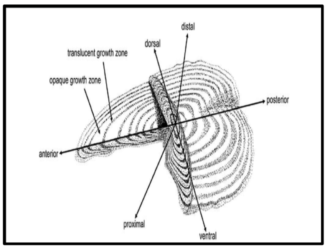

চিত্রঃ অটোলিথ ক্রস-সেকশন

কোনকোন মাছের ট্রান্সমিটেড লাইট বা ইলিউমিনেট লাইট (Illumination Light from above) কোন পদ্ধতিই তেমন কার্যকরী হয় না সেক্ষেত্রে বার্নিং পদ্ধতি (Burning technique) ব্যাবহার করতে হয়। স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে অল্প তাপে আস্তে আস্তে বার্ন করলে বলয় গুলো দৃশ্যমান হতে থাকে।

চিত্রঃ মাছের অটোলিথ পর্যবেক্ষণ (বার্নিং ট্যাকনিক)

Methods for Age Determination by Otoliths			
Condition	Observation Technique	Mounting Technique	Viewing Process
Whole Otoliths	Direct	Water, Alcohol, Xylene	Transmitted or direct from above
	Embedding followed by grinding	Dry	Direct from above
Broken Otoliths	Direct	Dry, Surface is moistened with xylene, Cedar wood oil	Direct from above or horizontal
		Water, Alcohol Xylene	
	After grinding	Dry, Surface is moistened with xylene or with cedar wood oil	Direct from above or horizontal
		Water, alcohol xylene	
	Burning	Dry, surface is moistened with xylene or with cedar wood oil	Direct from above

আঁইশ (Scale)

আঁইশ ত্বকোদ্ভূত অস্থিময় (bony) বা শৃঙ্গায়িত (horny) ক্ষুদ্রাকৃতির পাতলা পাত (Plate) বিশেষ যা অধিকাংশ মাছ ও সরীসৃপের ত্বক রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাধারণত একটি আঁইশের শেষ প্রান্ত পরবর্তী আঁইশের শুরু প্রান্তের সামান্য অংশ আবৃত করে রাখে। মাছের আঁইশ ত্বকের ডার্মিস (Dermis) হতে উদ্ভূত ও অস্থিময়। আঁইশের নিচের দিকের স্তর তন্তুময় এবং মূলত কোলাজেনে (collagen) গঠিত এবং উপরের দিকের স্তর ক্যালসিয়াম ভিত্তিক লবণে (calcium-based salts) গঠিত। ত্বকের ডার্মাল স্তর (Dermal layer), সুনির্দিষ্টভাবে বললে মেসডার্ম স্তর (mesoderm layer) থেকে এটি উৎপত্তি লাভ করে। একটি কেন্দ্রকে বৃত্তাকারে ঘিরে অবস্থিত একাধিক বৃদ্ধি রেখা দেখতে

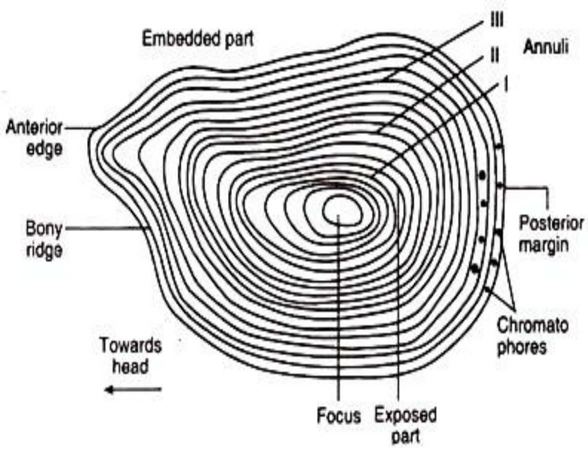

Fig. 14.1 : Scale method fish scale showing growth rings.

পাওয়া যায় যা মাছের বয়স নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রটি ফোকাস (Focus) নামে পরিচিত এবং কেন্দ্র ঘিরে বৃত্তাকারে অবস্থিত রেখাগুলো সারকুলি (Circuli, একবচনে Circulus) নামে পরিচিত। যখন বৃদ্ধি কমে যায় তখন পাশাপাশি অবস্থিত সারকুলি একত্রে মিশে যায় তুলনামূলক মোটা রেখার সৃষ্টি করে যা অ্যানুলি (annuli, একবচনে annulus)। প্রতিবছর একটি করে অ্যানুলাস গঠিত হয় বিধায় এর মাধ্যমে মাছের বয়স নির্ণয় করা যায়।

মাছের বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আঁইশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ এতে মাছের কোন ক্ষতি হয় না। আঁইশ এ বিদ্যমান বলয় এর সংখ্যা গণনার মাধ্যমে মাছের বয়স গণনা করা হয়। প্রতিটি মাছের ডর্সাল ফিন ও লেটারাল লাইন এর মাঝের অংশ থেকে ১০ টি করে আঁইশ সংগ্রহ করা হয়। কোনভাবেই লেটারাল লাইনের আঁইশ নেওয়া হয়না। সংগ্রহের পরে আঁইশ গুলো ভালভাবে পানি (Distilled Water) দিয়ে ধুয়ে নিয়ে হাতের দুই আংগুলের সাহায্যে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হয়। স্ক্যাল গুলো গ্লাস স্লাইডে মাউন্ট করে হালকা তাপে (৩৭) শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর মাইক্রোস্কোপ ব্যাবহার করে বলয় (Annuli) গুলো গণনা করে বয়স নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

অস্থি কাঠামো (Bony Structure)

বিভিন্ন মাছের ক্ষেত্রে একই ধরণের অস্থি কাঠামো দ্বারা বয়স নিরূপণ করা হয় না। প্রজাতি অনুসারে আলাদা আলাদা অস্থি কাঠামো ব্যাবহার করতে হয়। সকল অস্থি কাঠামোতে বৃদ্ধি বলয় সমানভাবে পরিলিক্ষিত হয় না। প্রায়শই অস্থি কাঠামো হতে প্রাপ্ত ফলাফল অটোলিথ এর ফলাফলের সাথে তুলনা করে যৌক্তিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা হয়। কিছু অস্থি কাঠামো যেমন ফিন রে এবং পেকটোরাল স্পাইন মাছের কোন ধরণের ক্ষতিসাধন না করেই সংগ্রহ করা যায়, যা অটোলিথেরে ক্ষেত্রে কখনোই সম্ভব নয়। প্রথমে বোনি পার্ট টিকে ভালভাবে ব্লিচ বা গরম পানি দ্বারা ধৌত করে মাংসল অংশ দূর করতে হয়। তারপরের প্রক্রিয়া অটোলিথের মতোই।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৫	সময় ঃ ১১ঃ৫৫- ১২ঃ৫৫	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• বিভিন্ন দেশে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ • বাংলাদেশে মৎস্যবিষয়ক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ • বাংলাদেশে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করন	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া, ভিপ কার্ড, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ

ভূমিকা

সমুদ্র আমাদের খাদ্যের জোগান দেয়, বেঁচে থাকা ও জীবনধারণের জন্য সমুদ্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সমুদ্র আমাদের টিকে থাকার নিশ্চয়তা দেয়। বেশ কিছু জরুরি চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে সহায়তা করে, যার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং এক হাজার কোটি মানুষের জন্য চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত খাদ্যের সুষম জোগানের নিশ্চয়তা। এ কারণে বিশ্বের দেশগুলো একটি বিস্তৃত ও সর্বজনীনভাবে সমুদ্র রক্ষার পরিকল্পনার বিষয়ে একমত হয়েছে। সুষম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৪ নম্বরে সমুদ্রের নিচের জীবন ও এর ১০টি বিশেষ লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে।

বিশ্ব সমুদ্র দিবস ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''Gender and the Ocean''। এতে নারী পুরুষের সমন্বিত অংশগ্রহনের মাধ্যমে কীভাবে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অবহেলিত সমুদ্র রক্ষায় কাজ করা যায় সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজে ক্ষমতার ক্ষেত্রে সমান সুযোগপ্রাপ্তি থেকে নারীরা বঞ্চিত হওয়ার মূল কারণ হলো জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজন। সেজন্য সমগ্র মানব জাতির স্বার্থেই সমতার ভিত্তিতে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করাটা জরুরি। আর এর অর্থ হলো জেন্ডার সচেতন হয়ে উঠা এবং সেজন্যই জেন্ডার আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু হয়ে উঠেছে। নারীদের অংশগ্রহনে সুষম সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানে যে সুযোগ তৈরি করা যেত, তাও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ব্যাংক মূলধন সংগ্রহ, আর্থিক সংস্থান, প্রযুক্তি, বাজার তথ্যপ্রাপ্তি ও উদ্যোক্তা হতে সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারীরা উল্লেখযোগ্য হারে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর নারীদের অবস্থান জানা প্রয়োজন। মৎস্যখাতে নিয়োজিত নারীরা প্রায় অর্ধেক কর্মীর চাহিদা পূরণ করতে পারে। অথচ এখন পর্যন্ত তারা কম দক্ষতার ও স্বল্প মজুরির মৌসুমি কাজেই বেশি জড়িত। এমনকি তাদের শ্রম অধিকারও সংরক্ষিত নয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থার তথ্যানুযায়ী, সমুদ্রতীরবর্তী ও উচ্চ চাহিদার মৎস্য আহরণ কাজে পুরুষরা ব্যাপকভাবে জড়িত। অন্তঃত ৮১ শতাংশ পুরুষ মাছ ও জলজ সম্পদ সংগ্রহে কাজ করে থাকে। অপরদিকে মৎস্যবিষয়ক পরবর্তী পর্যায়ের কাজে, বিশেষতঃ মাছ প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে অন্তঃত ৯০ শতাংশ নারী যুক্ত। অথচ প্রায় একই ধরনের শ্রমের বিনিময়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় মাত্র ৬৪ শতাংশ মজুরি পায়। পুরুষের মতো সমানভাবে স্থানীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীল থাকলেও সেগুলোর প্রায়োগিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বলার অধিকার কম।

বিভিন্ন দেশে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ

ভারতঃ সাইক্লোন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ভারতের উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূলীয় নারী কৃষকদের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। লিঙ্গগত উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় ম্যানগ্রোভ নার্সারি পরিচালনার মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এসব নার্সারির গাছ জলাভূমিতে লাগিয়ে সেখানকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, যা প্রাকৃতিক বায়োশিল্ড বা রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। এগুলো তীব্র ঝড়ের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস ঠেকিয়ে দিচ্ছে এবং উপকূলীয় অধিবাসীদের জীবন বাঁচিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি তাদের সম্পদও রক্ষা করছে। জীববৈচিত্রতা সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এসব বনভূমি বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করছে, যার মধ্যে খাদ্য, উপকরণ ও মাছের মতো জলজ প্রাণীও রয়েছে। এছাড়া এই বনভূমি বিপুল পরিমাণ কার্বন গ্রহণ করছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কাজ করতে সাহায্য করছে।

পানি বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা থেকে ভূমিকে রক্ষা করতে নারীরা বাঁশ ও স্থানীয় অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে প্রচলিত পন্থায় এক ধরনের ভাসমান স্থাপনা তৈরি করছে। এসব উপকরণের মধ্যে কচুরিপানা, সার, জৈবসার ও পলি রয়েছে। এই ভাসমান বাগানে তারা মসলা ও সবজি উৎপাদন করছে। সেখান থেকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তাদের আয়ের পথও তৈরি হয়েছে।

মেক্সিকোঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজারো মানুষ জলাভূমি ও সৈকত পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এতে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফিলিপাইনঃ নারীদের উদ্যোগ দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। তাদের মৎস্যবিষয়ক কর্মকান্ডের কারণে মাছ উৎপাদন, ম্যানগ্রোভ উন্নয়ন ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এতে সেখানে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশে মৎস্যবিষয়ক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ

যদিও নারীরা দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক তথাপি মাছচাষে ও আহরণে নারীদের অংশ গ্রহণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান। সামাজিক ও সংস্কৃতিগতভাবেই নারীরা বৃহৎ আকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কম অংশগ্রহণ করে থাকে। গ্রামীণ নারীরা গৃহস্থালির যে সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে খুব একটা অবদান হিসাবে গণ্য করা হয় না। যেমন- বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজিচাষ, ক্ষেত তদারকি করা ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীদেরকে বাইরে কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাকে তেমন সম্মতি দেয় না কিন্তু নীতিনির্ধারক মহল ও নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের নীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে পুরুষ ও নারীকে সম্পৃক্ত করার নীতিমালা গ্রহণ করেছে। ফলে জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের নারীগণ তাদের পরিবারের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ। তারা নদী, মোহনা ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, যেমন-মাছ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারেও বিক্রি করে থাকে। তারা মাছের শুঁটকি করা, জাল মেরামত ও জ্বালানী সংগ্রহের কাজে ও নিয়োজিত। প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি/ মাছের পোনা ধরেও সংসারের আয়বর্ধণ করে থাকে (আইন বহির্ভূত)।

বাংলাদেশে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের নিম্নোক্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায়

উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী নারীদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান খুবই নিন্মমানের। অধিকাংশ নারী আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং অশিক্ষিত। উপকূলীয় নারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এদের অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপকূলীয় নারীদের নিম্নোক্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় ঃ

- নদী, মোহনা ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছ, চিংড়ি,কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক আহরণে।
- রান্নার জন্য জ্বালানি/কাঠ সংগ্রহে ।
- শুঁটকি মাছ উৎপাদনে।
- জাল বুনন, জাল মেরামত ও মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ।
- মৎস্য পরিবহণ, মৎস্য পণ্য সংরক্ষণে।
- মাছ বরফায়ন, মাছ বিক্রিতে।
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরনে।
- গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালনে ।
- বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ, ক্ষেত তদারকি করনে ।
- মাছ চাষ, চিংড়ি চাষে।

এ ছাড়াও নারীদের নিম্নোক্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা যেতে পারে ঃ

- সীউইড চাষ, ওয়েস্টার চাষ, মাসেল ও মুক্তা চাষে ও প্রক্রিয়াজাতকরনে অংশগ্রহণ করানো।
- আয় বর্ধক বিকল্প কর্মসংস্থান- যেমনঃ সেলাই কাজ, ছোট ছোট দোকান এর ব্যবস্থা করানো।
- ম্যানগ্রোভ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করানো।
- প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করানো।
- সমুদ্র উপকূল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে (কক্সবাজারে স্বল্প পরিসরে কাজ হচ্ছে) ।
- উপকূলীয় বিভিন্ন গবেষণায় অংশগ্রহণ করানো।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়।

উপসংহার

সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্পদ রক্ষায় যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা সমাধানের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনের ব্যাপারটি যুক্ত করতে হবে। সমুদ্রকেন্দ্রিক সব ধরনের খাতসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষ বুঝতে শুরু করেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা এবং ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি সমুদ্র, বন্দর, মৎস্য আহরণ ও সংশ্লিষ্ট শিল্পে নারীদের অংশগ্রহনের বিষয়টি তুলে ধরা শুরু করেছে। অনেক সরকার, অলাভজনক সংস্থা, মানবপ্রেমী , বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তা পূর্বঘোষণা ছাড়াই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে আমাদের সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে। সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টায় অবশ্যই নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্পদ রক্ষায় ব্যাপকহারে গতি সঞ্চার করতে পারি।

অন্যান্য শিল্প ও কৃষির মতো খাতে যেভাবে নারীদের অংশগ্রহনে সমাধান বের করা হয়েছে, সমুদ্র ও উপকূলীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈশ্বিক নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় এখন নারীদের যুক্ত করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। নারীদের যখন ভূমির অধিকার প্রদান,কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে, তখন তারা খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, খাদ্যের উৎপাদন অন্তঃত ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মানে হলো উৎপাদনশীলতা ও সুষম জীবিকা নির্বাহ, মৎস্য আহরণ ও জলজসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০৫	সময় ঃ ১৪:০০- ১৫:০০	মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**

অভীষ্ট দল: মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

লক্ষ্য: এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা সমুদ্র ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

- সমুদ্র ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয় বিষয়ে বলতে পারবেন ।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			**৩ মিনিট**
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			**৫০ মিনিট**
	• দুর্যোগ ও এর প্রকারভেদ • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা • বাংলাদেশে দুর্যোগ ও এর সময়কাল • সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন • সমুদ্রবন্দর ও নদী বন্দরের জন্য আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত • মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্যোগকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য	বক্তৃতা ও একক কাজ	
সারসংক্ষেপ			**৭ মিনিট**
	• মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে পুনরালোচনা • পরবর্তী কোর্সের সাথে সংযোগ স্থাপন • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: আলোকচিত্র, মাল্টিমিডিয়া, ভিপ কার্ড, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

ভৌগোলিক অবস্থান এর কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন বাংলাদেশের ৭১০কিঃ মিঃ উপকূল দিয়ে প্রায় প্রতি বছরই মাঝারি থেকে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় এর আবির্ভাব ঘটে যার প্রভাবে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। দুর্যোগ কখনও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসে না। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হবে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দুষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও বিশ্ব পরিমন্ডলে গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নির্মূলের কোন পদ্ধতি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য দরকার বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ও সর্বোপরি গণসচেতনতা। দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সমুদ্রগামী জেলে ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের সচেতনা তৈরি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

দুর্যোগ ও এর প্রকারভেদ

দুর্যোগ হলো এমন একটি বিপর্যয়কর চরম ঘটনা বা পরিস্থিতি যা কোন বিপদাপন্নব্যক্তি বা জনগোষ্ঠির ওপর এমনভাবে পতিত হয়, যার ফলে ঐ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠির স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করে ও পারিপার্শ্বিকতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, বাইরের সাহায্য ছাড়া যা মোকাবিলা করা ঐ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠির পক্ষে সম্ভব হয় না। দুর্যোগ হঠাৎ বা ধীরগতিতে সংঘটিত হয়।

দুর্যোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার ঃ

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্ণেডো, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রপাত, ভূমিধ্বস, নদী ভাংগন ইত্যাদি।

২। মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ ঃ গৃহযুদ্ধ, যুদ্ধ, দাঙ্গা, সন্ত্রাস, শরণার্থী সমস্যা, শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিপর্যয়, রাসায়নিক দুষণ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের প্রধান কারণ হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী ভরাট, অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন, পরিবেশ বিপর্যয় ও গ্রীণ হাউসের প্রভাব প্রভৃতি। মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের কারণ হচ্ছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, হিংসা, লোভ, অসহযোগিতা, অজ্ঞানতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ও এর সময়কাল

বাংলাদেশে বহুবার বহুভাবে দুর্যোগ এসেছে। ১৭৯৫ জুন হতে ২০০৭ জুন পর্যন্ত ২১৩ বছরের বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, টর্ণেডে,খরা, শৈতপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ১৭৯৫ (জুন), ১৮২২ (মে), ১৮৭২ (অক্টোবর), ১৮৭৬ (অক্টোবর), ১৮৯৭ (অক্টোবর), ১৯৬০ (অক্টোবর), ১৯৬১ (মে), ১৯৬৩ (মে), ১৯৬৫ (মে), ১৯৭০ (নভেম্বর), ১৯৮৫ (মে), ১৯৯১ (এপ্রিল) এর ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, জলোচ্ছ্বাস, ১৮৯৭ (অক্টোবর) এর ভূমিকম্প , ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০০ বন্যা, ১৯৫৭ ও ১৯৭৯ সালের খরা এবং ১৯৯৭/৯৮ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) ও ২০০৩ সালের শৈতপ্রবাহ এবং ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে অতিবর্ষণজনিত পাহাড়ি ধ্বস, ২০০৭ সিডর, ২০০৮ আইলা, ২০১৩ মহাসেন, ২০১৫ কোমেন, ২০১৬ রোয়ানো এবং ২০১৭ সালের ঘূর্ণিঝড় মোরা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও স্মরণীয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭৯৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৪৩টি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য মানুষ, পশুপাখী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করেছে। ১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশে এ যাবতকালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময়(ঋতু/মাস) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছর মৌসুমী বায়ু আগমনের প্রাক্কালে এপ্রিল-মে এবং প্রস্থানের সময় অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মুলত অধিক তাপ মাত্রার কারণে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপসমূহ থেকে প্রায়শই এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে কতিপয় নিম্নচাপ কখনও কখনও প্রচন্ড সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের রূপ লাভ করে বিপুল জলোচ্ছ্বাসসহ উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে জীবন ও সম্পদের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতিসহ জনজীবন বিপর্যস্থ করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এমন কিছু অগ্রিম পদক্ষেপ যাতে জনগোষ্ঠি দুর্যোগের হুমকি সম্পর্কে অবগত ও সচেতন হতে পারে এবং এমন কিছু প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম যাতে কোন সংঘটিত দুর্যোগের ফলে জনগোষ্ঠির পরিবেশ ও অবকাঠামোর সাম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চারটি পর্যায় রয়েছে ঃ

১. প্রস্তুতি (Preparedness)
২. প্রশমণ (Mitigation)
৩. উদ্ধার (Response) এবং
৪. পুনর্বাসন (Recovery)

দুর্যোগ প্রস্তুতি ঃ দুর্যোগ প্রস্তুতি হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ। প্রস্তুতি আবার তিন ভাবে নিতে হয়- ব্যক্তিগত প্রস্তুতি, কমুনিটি বা আপনি যে এলাকায় থাকেন সে এলাকার প্রস্তুতি এবং রাষ্টীয় প্রস্তুতি। রাষ্টের কাজ হলো রাষ্টীয়ভাবে দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ছাড়াও এলাকা ও মানুষের ব্যক্তিগত প্রস্তুতিতে সাহায্য করা। এ পর্যায়ের কাজ গুলোর মধ্যে রয়েছে সব রকম দুর্যোগ চিহ্নিত করা, সময়মতো দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া, জনসাধারনকে অবহিত করা, উদ্ধার কাজ যেন তরান্বিত হয় তার পরিকল্পনা করে রাখা, নাগরিক এবং উদ্ধারকারীদের জন্য বিভিন্ন রকম ট্রেনিং, এক্সারসাইজ ও ওয়ার্কশপ এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

প্রশমণ ঃ দুর্যোগ প্রশমণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে থামিয়ে বা বন্ধ করে রাখতে পারি না। কিন্তু নানা প্রশমণ মূলক ব্যবস্থা নিয়ে এগুলো থেকে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারি। প্রশমণ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

উদ্ধার ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এই পর্যায়টি শুরু হয় কোন এলাকায় দুর্যোগ আসন্ন এবং তা সংঘটিত হওয়ার পর। এই পর্যায়ের মূল কাজ হলো দুর্যোগ প্রবন এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়া এবং দুর্যোগ হওয়ার পর উপদ্রুত এলাকায় যারা বেঁচে আছে তাদের দ্রুত খোঁজা এবং উদ্ধার করা, ত্রাণ বিতরন, আহতদের চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি।

পুনর্বাসন ঃ পুনর্বাসন হলো দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর দুর্যোগ পূর্ব পরিস্থিতিতে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়া।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সাধারণতঃ এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর, বছরের এই দুই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানার আশংকা বেশি থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি হঠাৎ বেড়ে যায় তবে সেখানকার বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং সেখানে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন চারপাশের ঠান্ডা ও ভারি বাতাস প্রবলবেগে ঘুর্ণায়মান ভাবে নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এই কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বগামী প্রবল বায়ু প্রবাহকেই ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বলে।

- ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রলয়ংকরী বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ২৬০ কি.মি. বা তারও বেশি হতে পারে।
- ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে বাতাসের চাপ খুব কম থাকায় কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি উপরের দিকে ফুলে ওঠে যাকে জলোচ্ছ্বাস বলে।
- এ সময় উপকূলীয় অঞ্চল ২০-৩০ ফুট জলোচ্ছ্বসে প্লাবিত হতে পারে ।
- ঘূর্ণিঝড় সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে উপকূল অতিক্রম করে।
- একটি ঘূর্ণিঝড়ের পরিধি ৮০০ কি.মি. পর্যন্ত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারনে সমুদ্রে ও উপকূলীয় এলাকায় জেলে, মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার, মাছ ধরার জাল, সরঞ্জাম, উপকূলীয় এলাকার ঘরবাড়ী, ফসল, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং ধন সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় এর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়।

ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত

সমুদ্রবন্দরের জন্য আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত ঃ

- ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত ঃ সমুদ্রের কোন একটি অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং সেখানে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৫০ কি:মি:।
- ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সংকেত ঃ সমুদ্রে একটি ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৬১ কি:মি:।
- ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ঃ বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৬১ কি:মি:।
- ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত ঃ বন্দর ঝড়ের সম্মুখীন তবে বিপদের আশংকা এমন নয় যে, চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৮৭ কি:মি:।
- ৫ নম্বর বিপদ সংকেত ঃ অল্প বা মাঝারি ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের **দক্ষিণ দিক** দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় **পূর্বদিক** দিয়ে এবং বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১১৭ কি:মি:।
- ৬ নম্বর বিপদ সংকেত ঃ অল্প বা মাঝারি ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। ঝড়টি বন্দরের **উত্তর দিক** দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় **পশ্চিম দিক** দিয়ে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১১৭ কি:মি:।
- ৭ নম্বর বিপদ সংকেত ঃ অল্প বা মাঝারি ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। ঝড়টি বন্দরের **নিকট অথবা ওপর** দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১১৭ কি:মি:।
- ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঃ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের **দক্ষিণ দিক** দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় **পশ্চিম দিক** দিয়ে। বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ কি:মি: থেকে ২৫০ কি:মি: পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঃ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। ঝড়টি বন্দরের **উত্তর দিক** দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় **পশ্চিম দিক** দিয়ে। বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ কি:মি: থেকে ২৫০ কি:মি: পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঃ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘূর্ণিঝড়টি বন্দরের **নিকট অথবা ওপর** দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ কি:মি: থেকে ২৫০ কি:মি: পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ১১ নম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংকেত ঃ ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সংগে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে করতে হবে যে, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে যাচ্ছে।

নদী বন্দরের জন্য সংকেত সমূহ ঃ

- ১-নং নৌ সতর্ক সংকেত ঃ বন্দর এলাকা ক্ষণস্থায়ী ঝড়ো আবহাওয়ার কবলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কিঃমিঃ গতিবেগের কালবৈশাখী ক্ষেত্রেও এই সংকেত প্রদর্শিত হয়। এই সংকেত আবহাওয়ার চলতি অবস্থার ওপর সতর্ক নজর রাখারও তাগিদ দেয়।
- ২-নং নৌ হুঁশিয়ারী সংকেত ঃ বন্দর এলাকায় একটি ঝড় যার গতিবেগ ঘন্টায় অনূর্দ্ধ ৬১ কিঃমিঃ বা একটি কালবৈশাখী ঝড়, যার বাতাসের গতিবেগ ৬১ কিঃমিঃ বা তদুর্দ্ধ। নৌ-যান এদের যে কোনটির কবলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৬৫ ফুট বা তার কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নৌ-যানকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।
- ৩-নং নৌ- বিপদ সংকেত ঃ বন্দর এলাকা ঝড়ে কবলিত। ঘন্টায় সর্বোচ্চ একটানা ৬২-৮৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত গতিবেগের একটি সামূদ্রিক ঝড় সহসাই বন্দর এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সকল প্রকার নৌ-যানকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।
- ৪নং নৌ-মহাবিপদ সংকেত ঃ বন্দর এলাকা একটি প্রচন্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার সামূদ্রিক ঝড়ে কবলিত এবং সহসাই বন্দর এলাকায় আঘাত হানবে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তদুর্দ্ধ। সকল প্রকার নৌ-যানকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্যোগকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের স্বাভাবিক দায়িত্ব নির্বাহ ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করবেন ঃ

স্বাভাবিক সময়ে

- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রতিবৎসর ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলার, ফিসিং, গিয়ার, মাছ ধরার কারিগরি যন্ত্রপাতি, মৎস্য পুকুর, খামার, ঘের সমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা, মৎস্যজীবী জেলে ও মৎস্যচাষিদের সজাগ করবে।
- অধীনস্থ অফিসমূহ, মৎস্যচাষি এবং মৎস্যজীবী প্রতিনিধি প্রভৃতির সহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবে।
- মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং ফিসিং গিয়ারসমূহ দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবে।
- ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রতিটি ট্রলারের ওয়্যারলেস ও রেডিও সেট থাকার বিষয় নিশ্চিত করবে।
- প্রতিদিন আবহাওয়া পূর্বাভাস (টোল ফ্রি নং-১০৯০) শোনার জন্য মৎস্যজীবী জেলে ও মৎস্যচাষিদের সজাগ করবে।
- উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকাররত নৌকাসমূহ/ট্রলারসমূহে রেডিও রিসিভিং সেট ও ট্রলার/নৌকায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিত করবে।
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য বিষয়ক সম্পদসমূহের নবায়নকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবে।
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের মৎস্যজীবী জনসংখ্যা, মৎস্যচাষি ও মৎস্য চাষ ক্ষেত্রসমূহের জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর পর তাহা হাল নাগাদ করবে।
- সংশ্লিষ্ট এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের মালিক/চালকের ঠিকানাসহ তালিকা সংরক্ষণ করবে।

- সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।
- স্লুইসগেটসমূহের যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করবে।
- প্রয়োজনের সময় পুকুরসমূহ থেকে লবণাক্ত পানি বের করে দেয়ার কাজে শক্তিচালিত পাম্প এর প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।
- ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা, প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।
- মৎস্যজীবী জেলে ও মৎস্যচাষিদের দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দুযোর্গ পর্যায়ে

- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবে (ঘূর্ণিঝড়/দুর্যোগকালীন)।
- নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবে এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবে।

পুনর্বাসন পর্যায়ে

- সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এ খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবে।
- স্থানীয় প্রশাসন এর সাথে সমন্বয়পূর্বক সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শক্তিচালিত পাম্প এর ব্যবস্থা করবে।
- মৎস্য উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।
- ক্ষতিগ্রস্থ পুকুর/মৎস্যচাষিদের পুনর্বাসনের জন্য অনুপ্রাণিত এবং সহায়তা করবে।
- স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবে।
- মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষিদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবে।

উপসংহার

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকানোর শক্তি মানুষের নেই। কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতির প্রচন্ডতা ও মাত্রা কমানোর পথ মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে। দুর্যোগ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রতিটি দুর্যোগে সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্টকে অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব । বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার, প্রশিক্ষণ ও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের বিশেষতঃ মৎস্যজীবী জেলে,মৎস্যচাষি ও যুব সমাজকে দুর্যোগ প্রাক-প্রস্তুতি, প্রশমন ও নিবারণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং অধিকতর সম্পৃক্ত করলে যে কোন দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হ্রাস পাবে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা যা শিখলাম ঃ

- দুর্যোগ কি ও এর প্রকারভেদ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- বাংলাদেশে দুর্যোগ ও এর সময়কাল
- সামুদ্রিক ঘুর্ণিঝড় বা সাইক্লোন
- সমুদ্রবন্দর ও নদী বন্দরের জন্য আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত সমূহ
- মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্যোগকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা: প্রশিক্ষণ মডিউল-১

প্রশিক্ষণ পরবর্তি মূল্যায়নপত্র

সকল প্রশ্নের মান সমান। সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ২০ মিনিট

নাম ঃ...পদবী ঃ ....

কর্মস্থল

ঃ...

১) ব্লু ইকোনমি বলতে কি বুঝায়?

ক) মৎস্য ভিত্তিক অর্থনীতি খ) কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি গ) নীল অর্থনীতি ঘ) সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতি

২) মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত একটিভ গিয়ার নয় কোনটি?

ক) শ্রিম্প ট্রলিং খ) পার্স সেইনিং গ) লং লাইনার ঘ) বটম ট্রলিং

৩) ট্রান্সবাউন্ডারি প্রকৃতির মাছ কোনটি?

ক) পোয়া খ) রূপচাঁদা গ) টুনা ঘ) হাউস মাছ

৪) বাংলাদেশের সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous zone) বেইজলাইন থেকে কত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত?

ক) ১২ ন. মাইল খ) ২৪ ন. মাইল গ) ১৮ ন. মাইল ঘ) ২০ ন. মাইল

৫) নিচের কোন উপাদানের কারণে পটকা মাছ খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ?

ক) মাইকোটক্সিন খ) সায়ানোটক্সিন গ) টেট্রোডোটক্সিন ঘ) সিগোয়াটক্সিন

৬) গভীর সমুদ্রে টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ আহরণে কি ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়?

ক) Long line খ) Purse seine গ) Pole and line ঘ) উপরের সবগুলো

৭) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG তে কয়টি Goal এর উল্লেখ রয়েছে?

ক) ১৫ টি খ) ১৭ টি গ) ১৬৯ টি ঘ) ১২ টি

৮) নিচের কোনটি সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার কৌশল নয়?

ক) ইফোর্ট কন্ট্রোল খ) এমপিএ গ) এমসিএস ঘ) IUU ফিশিং

৯) নিচের কোনটি সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা (Marine Spatial Planning) এর বিবেচ্য বিষয় নয়-

ক) সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্থানিক সুষম বন্টন
খ) এমএসপি তে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নাই
গ) ইকোসিস্টেম এবং অঞ্চল ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা

ঘ) এমএসপি এর একাধিক উদ্দেশ্য থাকে

১০) পরিবীক্ষণ (Monitoring) বলতে বুঝায়?

(ক) তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ এবং তথ্য বিশ্লেষণ (খ) সাগরে অবজার্ভার হিসেবে গমন

(গ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন প্রয়োগ (ঘ) কোনটিই নয়

১১) MCS বাস্তবায়নে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি কোনটি?

ক) Vessel Monitoring System (VMS) খ) Automatic Identification System (AIS)

গ) Global Positioning System (GPS) ঘ) সব কয়টি

১২) কোনটি MCS কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্তরায়?

ক) নৌযানের রেজিস্ট্রেশন এবং ফিশিং লাইসেন্স না থাকা খ) সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন

গ) নৌযানে আধুনিক সরঞ্জামাদি সংযুক্তকরণ ঘ) সব কয়টি

১৩) কোনটি বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক সংগঠিত নন-কমপ্লায়েন্স?

ক) ৪০ মি. এর কম গভীরতায় মৎস্য/চিংড়ি আহরণ খ) মৎস্য আহরণে ট্রল জালের কড এন্ডের মেস সাইজ ৬০ মি.মি. এর কম হওয়া

গ) জাটকা আহরণ করা ঘ) সব কয়টি

১৪) IUU এর পূর্ণরূপ লিখুন?

....

১৫) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় কোনটি?

ক) নৌ বাণিজ্য দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন খ) মৎস্য অধিদপ্তরের ফিশিং লাইসেন্স

গ) জীবন রক্ষাকারী সামগ্রীসমূহের উপস্থিতি ঘ) সব কয়টি

১৬) সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন(COI) প্রদান করে কোন দপ্তর?

ক) সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর খ) নৌ বাণিজ্য দপ্তর

গ) বন্দর কর্তৃপক্ষ ঘ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ

১৭) JMC এর পূর্ণ রূপ কি ?

ক) Joint Meeting Center খ) Joint Monitoring Committee

গ) Joint Monitoring Center ঘ) Joint Monitoring Cell

১৮) মাছের ল্যান্ড-বেজ্‌ড বা অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ বলতে বুঝায়-

ক) অবতরণকেন্দ্রের অবস্থান ও সংখ্যা জানা খ) অবতরণকৃত মাছের পরিমাণ জানা

গ) অবতরণকৃত মাছের প্রজাতি ও আকার ভিত্তিক পরিমাণ জানা ঘ) সবগুলো

১৯) বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র সক্রিয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজের নাম কি?

ক) আরভি অনুসন্ধানী খ) এফভি মীন সন্ধানী

গ) আরভি মাছরাঙা ঘ) আরভি মীন সন্ধানী

২০) বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় ল্যান্ড বেইজড্ সার্ভে বলতে কী বোঝায়?

ক) ভূমি ভিত্তিক জরিপ খ) এলাকা ভিত্তিক জরিপ

গ) মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক জরিপ ঘ) বাজার ভিত্তিক জরিপ

২১) জেনেটিক্যাল বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক) ৭০% ইথানল খ) ১০% ফরমালিন গ) ৯৫% ইথানল ঘ) ৫০% ইথানল

২২) অটোলিথ কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

ক) লিঙ্গ নির্ধারণে খ) পুষ্টিকর খাবার হিসেবে গ) বয়স নিরূপণে ঘ) কোন কাজে লাগে না

২৩) ওসাইট ডেভেলপমেন্টের ধাপ কয়টি?

ক) ৬টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৮ টি

২৪) আবহাওয়া পূর্বাভাস শোনার টোল ফ্রি নম্বর কত?

ক) ০০০৯ খ) ১০৯০ গ) ১০৩০ ঘ) ৯৯৯

২৫) সমুদ্রবন্দরের জন্য আবহাওয়া সতর্ক সংকেত নয় কোনটি ?

ক) দূরবর্তী/স্থানীয় সতর্ক সংকেত খ) দূরবর্তী/স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত

গ) ঘূর্ণিঝড়ের হুঁশিয়ারি সংকেত ঘ) মহাবিপদ সংকেত

প্রাক ও পরবর্তী মূল্যায়ন উত্তরপত্র

১) ঘ	২) গ	৩) গ	৪) খ
৫) গ	৬) ঘ	৭) খ	৮) ঘ
৯) খ	১০) ক	১১) ঘ	১২) ক
১৩) ঘ	১৪) Illegal, Unreported and Unregulated		
১৫) ঘ	১৬) খ	১৭) গ	১৮) গ
১৯) ঘ	২০) গ	২১) গ	২২) গ
২৩) গ	২৪) খ	২৫) গ	

প্রশিক্ষণ কোর্সে পরিচালিত বিভিন্ন অধিবেশনের ওপর আপনার মতামত দিন (বৃত্তাকারে)

অধিবেশনের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, বোধগম্যতা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং সময় বিবেচনা করে সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করুন।

ক্রম.	অধিবেশন	খুব খারাপ (Very Poor)	খারাপ (Poor)	ভাল (Good)	খুব ভাল (Very good)	অসাধারণ (Excellent)
১.	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ব্লু ইকনোমি	১	২	৩	৪	৫
২.	মেরিটাইম জোন ও মেরিন জিওগ্রাফি	১	২	৩	৪	৫
৩.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: জোন ভিত্তিক	১	২	৩	৪	৫
৪.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: মৎস্য গ্রুপ ভিত্তিক	১	২	৩	৪	৫
৫.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ: অপ্রচলিত	১	২	৩	৪	৫
৬.	মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও মৎস্য নৌযান	১	২	৩	৪	৫
৭.	মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি	১	২	৩	৪	৫
৮.	এসডিজি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	১	২	৩	৪	৫
৯.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-১)	১	২	৩	৪	৫
১০.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ (পার্ট-২)	১	২	৩	৪	৫
১১.	এমসিএস: পদ্ধতি ও প্রয়োগ	১	২	৩	৪	৫
১২.	বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমসিএস	১	২	৩	৪	৫
১৩.	এম.সি.এস বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম	১	২	৩	৪	৫
১৪.	আইইউইউ ফিশিং নিয়ন্ত্রণ	১	২	৩	৪	৫
১৫.	জেলে এবং মৎস্য নৌযান নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং	১	২	৩	৪	৫
১৬.	সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট ও জয়েন্ট মনিটরিং	১	২	৩	৪	৫
১৭.	ক্যাচ ডকুমেন্টেশন ও উপাত্ত সংগ্রহ	১	২	৩	৪	৫
১৮.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ: ভেসেল বেজড সার্ভে	১	২	৩	৪	৫
১৯.	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ: ল্যান্ড বেজড সার্ভে	১	২	৩	৪	৫
২০.	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: শনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস	১	২	৩	৪	৫
২১.	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: গোনাডাল স্টাডি এবং প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ	১	২	৩	৪	৫
২২.	জীবতাত্ত্বিক গবেষণা: বয়স নিরূপণ	১	২	৩	৪	৫
২৩.	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ	১	২	৩	৪	৫
২৪.	উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১	২	৩	৪	৫